[আমাদের ছুটি - ২০শ সংখ্যা]

আন্দামানের সৈকতে - আলোকচিত্রী- রত্নদীপ দাশগুপ্ত

~ ৬ষ্ঠ বর্ষ ২য় সংখ্যা - শ্রাবণ ১৪২৩ ~

রামপাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে সুন্দরবনকে ধ্বংস করা চলবে না - এমন একটা জোরালো আবেদন বেশ কিছুদিন ধরেই উঠেছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ওদিকে ভারত-বাংলাদেশ উভয় পক্ষের সরকারের তরফ থেকে প্রকল্পটিকে দুই দেশের মৈত্রী সূচক হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে! বিষয়টি নিয়ে শ্রী দেবাশিস সেনগুপ্তের একটি লেখা পড়ে আর 'আমাদের ছুটি'-র নিয়মিত লেখক তুহিন ডি খোকনের অনুরোধে সম্পাদকীয়তে এই প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলি।

রামপাল জায়গাটি বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। সুন্দরবনের যে অংশটি বাংলাদেশে রয়েছে তার থেকে মাত্র ১৪ কিমি দূরে। তার মধ্যে আবার মাঝের ১০ কিমি 'বাফার জোন' মানে স্বল্প ঘনত্বের জঙ্গল। মোদ্দা কথা যা দাঁড়াচ্ছে, জঙ্গলের এলাকা থেকে মোটামুটি ৪ কিমি দূরেই তৈরি হচ্ছে ১৩২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরির ক্ষমতাসম্পন্ন বাংলাদেশের বৃহত্তম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি। প্রকল্পটি ভারত সরকারের তরফে এনটিপিসি এবং বাংলাদেশের বিদ্যুৎমন্ত্রক বিপিডিবি-র যৌথ উদ্যোগ। দুপক্ষই এতে সমপরিমাণ অর্থ লগ্নি করেছে। উপরন্তু, নির্মাণের পর আগামী দশ বছর ধরে প্ল্যান্টটির দেখভালের দায়িত্বও এনটিপিসি-র ওপরেই। কয়লাচালিত হওয়ায় নিয়মিতই বর্জ্য পদার্থ হিসেবে নির্গত হবে কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ও নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড। বিপুল পরিমাণ এই কয়লাও আসবে সুন্দরবনের জলপথেই সারা বছর ধরে বহুসংখ্যক মালবাহী জাহাজে। একনাগাড়ে উড়ে আসা কয়লার গুঁড়ো, সালফারের পুরু আস্তরণ ঢেকে দেবে জল-জঙ্গল। যদিও বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রক এবং এনটিপিসি পরিবেশ দূষণের এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে! ঘোষণা করা হয়েছে এই প্রকল্প হবেই।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেল বেশ কয়েক বছর আগে পশ্চিমবঙ্গেও সুন্দরবন অঞ্চলে একটি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার কথা শোনা গিয়েছিল। তখনই পরিবেশ সচেতন বিভিন্ন মহল থেকে জোর আপত্তি ওঠায় ব্যাপারটি ধামাচাপা পড়ে। পরবর্তীতে কাঁথির কাছে হরিপুরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বসানোর জোরালো প্রস্তাব এলেও সাধারণ মানুষের তীব্র প্রতিবাদকে মর্যাদা দিয়ে রাজ্যসরকার সম্প্রতি সেটি নাকচ করেছে।

কন্যার পরিবেশবিজ্ঞানের পাঠ্য বই-এ দুরকমের ইকোলজি চর্চার কথা পড়েছিলাম - 'শ্যালো ইকোলজি' আর 'ডিপ ইকোলজি'। খুব ছোট্ট করে বলতে গেলে পরিবেশের উপর সামগ্রিক প্রভাবের কথা খেয়াল না করে শুধু মানবসমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা করা হল 'শ্যালো ইকোলজি'চর্চা আর পরিবেশের কোনও রকম রদবদল ঘটানোর আগে তাতে জীবজগতের সুদূরপ্রসারী কী ফলাফল হতে পারে সেই ভাবনা হল 'ডিপ ইকোলজি'-র দর্শন। আর এসব লিখতে লিখতে মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়ে কেবল কানে ভাসছিল শ্রাবণী ব্যানার্জির 'সুন্দরবন দর্শন' লেখার শেষে লেখিকার বাবার কথাটি, "মনে রাখিস পৃথিবীটা শুধুমাত্র মানুষের জন্য নয়।"

- দময়ন্তী দাশগুপ্ত

**এই সংখ্যায় -**

*৯/১১, গ্রাউন্ড জিরো এবং সেই চিঠি*
*- অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়*

*পাগলের মেলায় - রফিকুল ইসলাম সাগর*

*বনঘরের গেরস্থালি - পীতম চট্টোপাধ্যায়*

*জিস দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায় - কাঞ্চন সেনগুপ্ত*

*জীবনে প্রথমবার ট্রেকিং করতে গিয়ে ঘুরেছিলেন হেমকুণ্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুণোত্রী। ফিরে এসে ডায়েরির পাতায় লিখে রেখেছিলেন ভ্রমণের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা।*

*- সুবীর কুমার রায়ের ভ্রমণ ধারাবাহিক 'হিমালয়ের ডায়েরি'-র অন্তিম পর্ব "পথের শেষে যমুনোত্রীতে"*

**~ আরশিনগর ~**

*সুন্দরবন দর্শন - শ্রাবণী ব্যানার্জি*

*শিলাবতীর পাড়ে - সুদীপ্ত মজুমদার*

আমাদের ছুটি - ২০শ সংখ্যা

**~ সব পেয়েছির দেশ ~**

*মণির খোঁজে মণিমহেশে - সুদীপ্ত দত্ত*

*বর্ষায় গোয়ায় - শ্রাবণী দাশগুপ্ত*

*আন্দামানের দিনলিপি - দেবাশিস রায়*

*হিরাপুরের যোগিনীরা - দময়ন্তী দাশগুপ্ত*

## ~ ভুবনডাঙা ~

*আকাশভরা জল - স্মৃতির নায়াগ্রা - অনিন্দিতা চক্রবর্তী*

## ~ শেষ পাতা ~

*লাভডেলের শেষ ট্রেন - সুপর্ণা রায় চৌধুরী*

*ছোট্ট ছুটিতে সম্বলপুর - ঔরব দে*

**To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.**

**For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com**

**© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu**

Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

# অন্য ভ্রমণ

ভ্রমণ তো বানিয়ে তোলা গল্পকথা নয়, মানুষের সত্যিকারের জীবনকাহিনি। আর তাই ভ্রমণ কাহিনি মনে শুধু আনন্দই এনে দেয় না, চোখের জল অথবা প্রতিবাদের ভাষাও জাগিয়ে দিতে পারে। ট্যুরিজম ইন্ড্রাস্ট্রির সহায়ক বিজ্ঞাপনী প্রচারমাধ্যম ছাড়াও ভ্রমণ কাহিনির বড় পরিচয় বিশ্ব সাহিত্যের একটি অন্যতম ধারা রূপেও। তেমনই কিছু 'অন্য ভ্রমণ' কথা।

## ৯/১১, গ্রাউন্ড জিরো এবং সেই চিঠি

### অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও সন্ধে বেলায় টাইমস অফ ইন্ডিয়ার নিউজ চ্যানেল খুলে বসেছি। এই সময়টা এভাবেই কাটে আমাদের। বাংলা নিউজ চ্যানেলের তুলনায় ইংরেজি চ্যানেলে দেশ বিদেশের অনেক বেশি খবর থাকে, এটাই আমাদের পছন্দের। নীচু চেয়ারে বসে চ্যানেলটা খুলেছি সবে। একটি খবর দেখেই চমকে উঠলাম। খবরটি বার বার দেখানো হচ্ছে। নিউ ইয়র্কের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের দুটি ১১০ তলা বাড়িতে দুটি উড়ো জাহাজ এসে ধাক্কা মারার ফলে আগুন ধরে যায়। পৌনে দু ঘণ্টা বাদে বাড়ি দুটি তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে উড়ো জাহাজ আছড়ে পড়ার একটি ভিডিও এবং বাড়ি দুটি ভেঙে পড়ার অপর একটি ভিডিও বার বার দেখানো হচ্ছিল সব কটি চ্যানেলে। সেই সময় বি বি সি এবং সি এন এন চ্যানেল খুলেছিলাম যদি বাড়তি কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। বাড়ি দুটি ভেঙে পড়ার সাথে সাথেই ওই অঞ্চলটি ধোঁয়া এবং ধুলোয় ভরে ওঠে। রাস্তায় সব মানুষেরা ভীত হয়ে ছোটাছুটি করছিলেন। সংবাদটি দেখতে দেখতে মনটা আশঙ্কিত হয়ে পড়ে। আমাদের পরিবারের দুজন ওয়াশিংটন ডি সি-র কাছেই থাকে। এই কথাটা মনে হতেই চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম। ওদের খোঁজ নেওয়া দরকার। আজ থেকে দেড় দশক আগে সেল ফোনের এত রমরমা ছিল না। বাড়ির কাছের টেলিফোন বুথে ছুটে গেছিলাম কথা বলার জন্য। জানলাম ভাল আছে ওরা। মনটা শান্ত হতে ফিরে এসেছিলাম। গভীর রাত পর্যন্ত টেলিভিশনের সামনে বসেছিলাম। পরদিন সকালে খবরের কাগজ পড়ে যতটা সম্ভব জানার চেষ্টা করেছিলাম ঘটনাটি কী ঘটেছে।

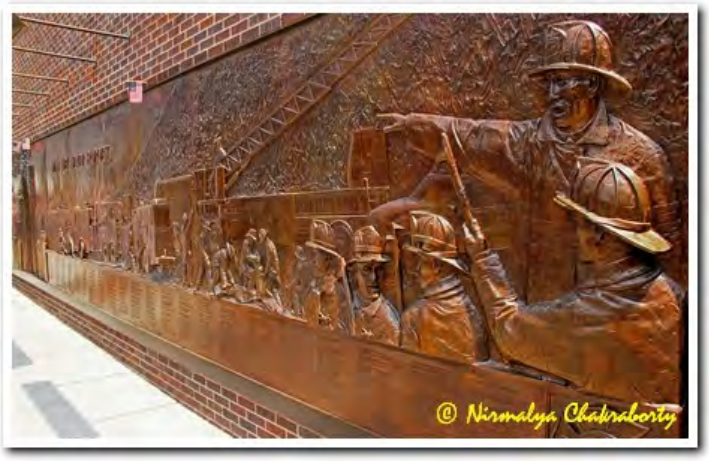


এই ঘটনার কয়েক বছর পর গবেষণার কাজের জন্য কিছুকাল থাকতে হয়েছিল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডি সি সংলগ্ন রকভিলে। আমাদের অ্যাপার্টমেন্টের পাশেই বাস রাস্তা। সকালে যে বাস ধরে বিশ্ববিদ্যালয় যেতাম সেটি আসত একেবারে সঠিক সময়ে, ঘড়ির সময় মেলানো যেত। শুধু এই বাস নয়, সব বাসগুলিই একেবারে ঠিক সময়ে চলে আসত। অসুবিধা হত যখন দেখতাম বাস এক-আধ মিনিট আগে চলে এসেছে। নাকের সামনে দিয়ে বাস চলে যেত। তখন অপেক্ষা করতে হত পরের বাসের জন্য। বাসের সুবিধা থাকার জন্য বাসে চেপেই দোকান, বাজার, লাইব্রেরি সব জায়গায় যেতাম। তবে উইক এন্ডের বেড়াতে যাওয়ার সময় বন্ধুবান্ধবেরা গাড়ি করে আমাদের নিয়ে যেতেন।

নিউ ইয়র্কের কাছে নিউ জার্সিতে আমাদের গ্রামের এক জন কৃতী ছাত্র থাকত। কিছুকাল খড়গপুর আই আই টিতে পড়ানোর পর আমেরিকা চলে আসে শ্রীমান সুবীর [দাস]। কোনও কাজের জন্য ওকে ওয়াশিংটন ডি সি আসতে হয়েছিল। আমাদের কাছে দুদিন ছিল সে সময়। কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল নিউ জার্সি যাবার জন্য। বলেছিল একদিন নিউ ইয়র্ক শহর দেখাবে।

ওয়াশিংটন ডি সি থেকে নিউ ইয়র্ক শহর খুব বেশি দূর নয়। বাসেই যাওয়া যায়। তাই নিউ ইয়র্ক শহরের এত কাছে থাকা সত্ত্বেও নিউ ইয়র্ক দেখা হবে না, সেটা ভাবতে কষ্ট হচ্ছিল। তাছাড়া গবেষণা কাজের মেয়াদ শেষ হলে দেশে ফিরে যেতে হবে। দেশে ফিরে এলে শুধু বেড়াবার জন্য নিউ ইয়র্ক যাওয়া আমাদের মত সাধারণ মধ্যবিত্তের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সুযোগ খুঁজছিলাম। সেই সুযোগটা মিলেও গেল।

পসপ্তাহ অন্তে শনি-রবিবার ছুটি থাকে। ভাবলাম শনি-রবিবারের সঙ্গে আরও দুটো দিন ছুটি পেলে সহজেই নিউ ইয়র্ক ঘুরে আসা যায়। তাই গবেষণার কাজটি সেই ভাবে সংগঠিত করে যে অধ্যাপকের ল্যাবরেটরিতে কাজ করছিলাম তাঁকে বিষয়টি জানালাম। তিনি সানন্দে সায় দিলেন। এটা তাঁর বদান্যতা তাই শ্রীমান সুবীরের কাছে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। যাত্রা শুরু করেছিলাম এক বৃহস্পতিবার সকালেই।

ওয়াশিংটন ডি সি থেকে চিনা মালিকানাধীন কোম্পানির বাস যাতায়াত করে নিউ ইয়র্ক। গ্রে হাউন্ড বা অন্য কোম্পানির বাসের ভাড়া চিনা কোম্পানির তুলনায় অনেক বেশি। তাই চিনা কোম্পানির বাসের টিকিট কেটেছিলাম। ওয়াশিংটন ডি সি থেকে নিউ ইয়র্ক দুশো মাইলের সামান্য বেশি। এই পথটুকু যেতে ঘণ্টা তিনেক লাগবে বলে বাস কোম্পানি জানিয়েছিল কিন্তু আমাদের যেতে চার ঘণ্টা লেগেছিল। নিউ ইয়র্ক ঢুকতে গেলে হাডসন নদী পার হতে হয়। হাডসন নদীর তলা দিয়ে টানেল করা হয়েছে। আমরা লিঙ্কন টানেল দিয়েই ঢুকে পড়লাম নিউ ইয়র্ক শহরে। এটা একটা অভিজ্ঞতা বটে !

পেন ষ্টেশনের কাছে বাস থেকে নামলাম। পেন ষ্টেশন থেকে আমাদের ট্রেন ধরতে হবে। সুবীর আমাদের জানিয়েছিল NJ Transit -এর Northeast Corridor Line -এর ট্রেনে চেপে নিউ জার্সি পৌঁছতে হবে। ষ্টেশনের নামও বলে দিয়েছিল সুবীর। ষ্টেশনের কাছেই গাড়ি নিয়ে হাজির ছিল সে। সুবীরের বাসা কেনডাল পার্কে। এই কেনডাল পার্কেই রয়েছে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের উত্তর আমেরিকা শাখার অফিস এবং মন্দির। সুবীরের বাড়ির একেবারেই পাশে। তাই সুযোগ হয়েছিল মন্দির দর্শন করার।

স্ত্রী এবং দুই ফুটফুটে শিশু কন্যা নিয়ে সুবীরের সংসার। এদের সঙ্গে বড়ই আনন্দে কেটেছিল কয়েকটা দিন। সুবীর জানিয়েছিল পরদিন সকালেই আমাদের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে যাবে আর শনিবার যাব নিউ ইয়র্ক। ওর কাছে ছিল গাইড বই। কী ভাবে নিউ ইয়র্ক ঘুরে দেখব, এক দিনে কতটাই বা দেখতে পারব, কী কী দেখব এই সবই ও-ই ঠিক করে রেখেছিল। সুবীর সঙ্গে করে না নিয়ে গেলে নিউ ইয়র্ক দেখাই হত না।

শনিবার সকালে বাসে চেপে নিউ ইয়র্ক পৌঁছেছিলাম। আমাদের নিউ ইয়র্ক দেখা শুরু হয়েছিল স্ট্যাচু অফ লিবার্টি দিয়ে। স্ট্যাটেন আইল্যান্ড যাবার লঞ্চ স্ট্যাচু অফ লিবার্টির পাশ দিয়ে যায়। লঞ্চ থেকেই এই বিখ্যাত স্ট্যাচুটি দেখলাম। স্ট্যাটেন আইল্যান্ড থেকে ফিরে লঞ্চ ঘাট থেকে রাস্তা ধরলাম ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার যাওয়ার জন্য। রাস্তায় লোকজনের ভিড় কম। নিউ ইয়র্ক শহর দেখবার জন্য মাথা খোলা দোতলা (ডবল ডেকার) বাস চলেছে রাস্তায়। রাস্তার পাশে উঁচু উঁচু বাড়ি। আমাদের মত সব দেশের লোক এই শহর দেখতে রাস্তায় নেমেছেন। কারও চোখে কালো চশমা, কারও মাথায় টুপি, কেউ হাফ প্যান্ট পরে জগিং করতে করতে রাস্তায় চলেছেন। তবে আমার স্ত্রীর মত সীমন্তে সিঁদুর আর শাড়ি পরিহিতা আর কাউকে দেখলাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছলাম প্রাচীরঘেরা সেই জায়গায় যেখানে একদা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বড় বড় বাড়িগুলি ছিল। এই স্থানটির একদিকে ওয়েস্ট স্ট্রীট এবং আর একদিকে লিবার্টি স্ট্রীট। জায়গাটি পরিস্কার করা হয়েছে। ভেঙে পড়া বাড়িগুলির চিহ্ন আর নেই। দমকল বিভাগের কর্মী আর ভেঙে পড়া বাড়িগুলির আবর্জনা যারা পরিস্কার করেছিলেন তারা এই স্থানটিকে "গ্রাউন্ড জিরো" নামেই ডাকেন। রাস্তার ধারে বড় বড় বোর্ডে আটকানো রয়েছে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ভেঙে পড়ার ছবি। আর যাঁরা মারা গেছেন তাঁদের নামগুলি। পর্যটকেরা এখানে ভীড় জমাচ্ছেন। এগুলি দেখে আবার মনে পড়ল ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা। আমেরিকান এয়ার লাইনস ফ্লাইট ইলেভেনের একটি প্লেন এবং ইউনাইটেড এয়ার লাইনস ফ্লাইট ওয়ান সেভেন ফাইভের একটি প্লেন যথাক্রমে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নর্থ টাওয়ার এবং সাউথ টাওয়ারে আছড়ে পড়ে। এক ঘণ্টা বিয়াল্লিস মিনিট পর একশো দশ তলা বাড়ি দুটিই ভেঙে পড়ে। সেই সঙ্গে পাশাপাশি বাড়িগুলিতেও আগুন লাগে। ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেগুলি।

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। তৃতীয় একটি প্লেন, আমেরিকান এয়ার লাইনস ফ্লাইট সেভেন্টি সেভেন পেন্টাগনের (আরলিংটন কাউন্টি, ভার্জিনিয়া) পশ্চিম দিকে আছড়ে পড়ে। পেন্টাগনের ওই অংশটি ভস্মীভূত হয়। ইউনাইটেড এয়ার লাইন্স ফ্লাইট নাইন্টি থ্রি-র একটি বিমান ওয়াশিংটন ডি সি-র দিকে যেতে গিয়ে ভেঙে পড়ে শ্যাঙ্কসভিল, পেনসিলভানিয়ায়। উনিশ জন হাইজ্যাকার সমেত তিন হাজার জনের মৃত্যু ঘটে এই ঘটনাগুলিতে। মনে করা হয় এগুলি আলকায়দা নামক আতঙ্কবাদী সংগঠন দ্বারা সংঘটিত হয়েছে। সারা বিশ্বের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন ঘটে এই ঘটনায়।

গ্রাউন্ড জিরো অঞ্চলটি দেখে সুবীর আমাদের এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং নিয়ে যাবে বলল। গ্রাউন্ড জিরো ছেড়ে সবে বের হয়েছি, চোখে পড়ল একটি অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা। রাস্তার দুই পাশে বড় বড় বাড়ি তাই সূর্যের আলো সরাসরি রাস্তায় এসে পড়তে পায় না। ছায়াছন্ন অঞ্চল। একটি বড় বাড়ি, রাস্তার দিকে বড় গাড়ি বারান্দা। মনে পড়ল প্রায় চার দশক আগের উত্তর কলকাতা। আর্মহার্স্ট স্ট্রিটের দুই পাশের বাড়িগুলিতে এই ধরণের গাড়ি বারান্দা থাকত। আজ সেগুলি আর নেই, বেশিরভাগই ভাঙা পড়েছে। এই ধরণের একটি বাড়ির গাড়ি বারান্দার এক কোণে মোড়ার উপর বসে এক মনে বই পড়ছেন এক মহিলা। পাশে বসে রয়েছে একটি বড় কুকুর। পাহারা দিচ্ছে মালকিনকে। একটু নজর করে দেখতেই বুঝলাম মহিলাটির বর্তমান আশ্রয় এই রাস্তা। মহিলাকে সেলাম ঠুকতেই হল। আশ্রয়হীন মহিলা বসে বই পরছেন !! কী অসাধারণ মনের জোর। আজও ভুলতে পারিনি এই ঘটনাটি।

চমকের আরও ছিল বাকি, তখন বুঝিনি। আরও কয়েক কদম এগিয়েছি। রাস্তার পাশে একটি বাড়ির দেওয়ালের দিকে চোখ পড়তেই মনে হল কিছু যেন লেখা রয়েছে। দাঁড়িয়ে পড়লাম, দেওয়ালের কাছে গিয়ে। লেখাটি পড়তেই আবার চমকে উঠতে হল। ভাবলাম এমনটাও হয় ! নিউ ইয়র্ক শহরপ্রেমী একজন চিঠি লিখেছেন তার প্রিয় শহরকে উদ্দেশ্য করে। এই চিঠি লেখা হয়েছে ৯/১১ ঘটনা ঘটে যাওয়ার বেশ কিছু কাল পরে। আমার কাছে এটি একটি কবিতা - পত্রকবিতা নাকি পত্রকাব্য? কী বলব? কয়েকটা লাইনেই তিনি তাঁর মনের ভাব ফুটিয়েছেন। বেশি শব্দের ব্যবহার করতে হয়নি। কিন্তু যা বলার তাই বলেছেন।

Yo New York
I hope you are feeling better
I see that nasty scar is starting
to heal… a… little.
I will always prayer for your losses
Stay Strong, You are still the
greatest city in the world.

I Love You

এই চিঠি যতবার পড়ি অবাক হয়ে ভাবি এমন মানুষও রয়েছে যে নিজের শহরকে এত ভালবাসে! তাঁর কাছে শহরের যেন প্রাণ রয়েছে, সে যেন কষ্ট পাচ্ছে। কষ্ট লাঘবের জন্য সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা করতেও কার্পণ্য করবে না সে। আমার জানা নেই এমন চিঠি আর লেখা হয়েছে কিনা। অনন্য এই চিঠি যত বার পড়ি মাথা নত হয়ে আসে অজানা পত্রলেখকের উদ্দেশ্যে। কষ্ট হয় এদেশের কথা ভেবে। আজ সারা দেশটা ভরে গেছে দেশদ্রোহীতে। বিভেদকামী শক্তি মাথা চারা দিচ্ছে। বাক স্বাধীনতার নামে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। এসব করা হচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে এবং একটি বড় গোষ্ঠী এর সঙ্গে যুক্ত। জানি না কবে আমাদের রাহুমুক্তি হবে। কবে এমন মানুষ জন্মাবে এদেশে?

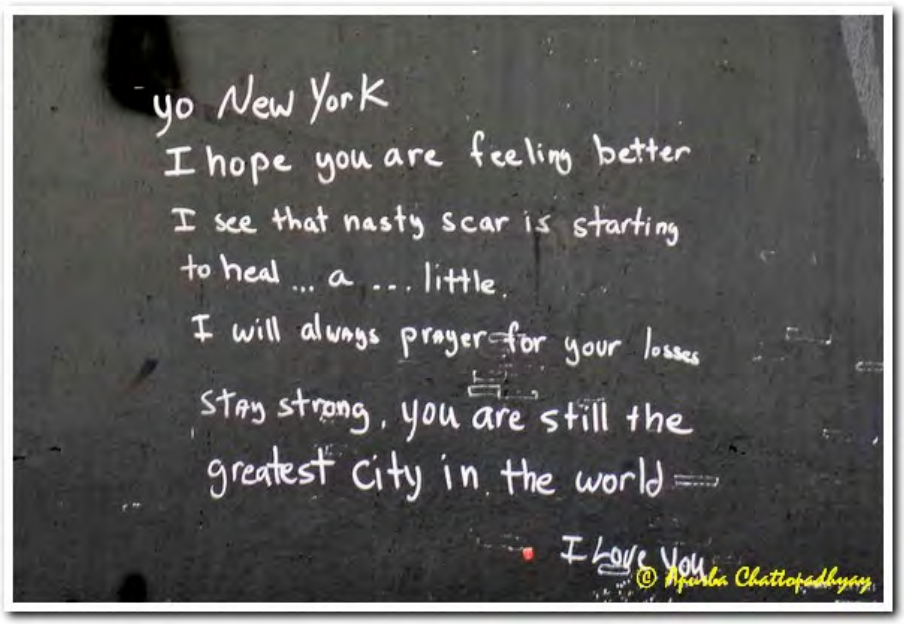


---

প্রাণীবিদ্যার অধ্যাপক অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়ের নেশা বেড়ানো আর ছবি তোলা। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা চোখের আড়ালে চলে যাওয়া টেরাকোটার মন্দিরশিল্পকে ক্যামেরার দৃষ্টিতে পুনরুদ্ধার করাই তাঁর ভালোলাগা। পাশাপাশি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ভ্রমণ ও অন্যান্য বিষয়ে লেখা।

---

tell a Friend

অন্য ভ্রমণ

ভ্রমণ তো বানিয়ে তোলা গল্পকথা নয়, মানুষের সত্যিকারের জীবনকাহিনি। আর তাই ভ্রমণ কাহিনি মনে শুধু আনন্দই এনে দেয় না, চোখের জল অথবা প্রতিবাদের ভাষাও জাগিয়ে দিতে পারে। ট্যুরিজম ইন্ড্রাস্ট্রির সহায়ক বিজ্ঞাপনী প্রচারমাধ্যম ছাড়াও ভ্রমণ কাহিনির বড় পরিচয় বিশ্ব সাহিত্যের একটি অন্যতম ধারা রূপেও। তেমনই কিছু 'অন্য ভ্রমণ' কথা।

# পাগলের মেলায়

রফিকুল ইসলাম সাগর

কখনও কখনও কোনও রকমের পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই বেরিয়ে পড়ি,শহর ছাড়িয়ে অচিন কোনও গাঁয়ের পথে। এইতো কিছুদিন আগের কথা,ঘড়ির কাঁটায় তখন রাত এগারটা ছুঁইছুঁই। ঘরে ফিরব ফিরব করছিলাম। তখনই বন্ধু শাকিল জানাল,প্রাইভেট কার নিয়ে ভোরবেলা মতলব যাবে। সঙ্গে যাবে জাহাঙ্গীর ভাই। আমাকেও যাওয়ার জন্য খুব জোর করল। যাব না বললাম প্রথমে। কিন্তু তারপরই মন দেখি যাই যাই করছে। যাব কি যাব না পুরোপুরি সিদ্ধান্ত নিতে পারলাম না। বললাম,বাসায় গিয়ে ঠিক করি,তারপর জানাচ্ছি। ঘরে ফিরেই ঠিক করলাম ঘুরেই আসি। বন্ধুকে যাচ্ছি বলে জানিয়ে দেওয়ায় খুব খুশিও হল। খুব ভোর বেলা মোবাইলটা বেজে উঠল। ডাক পড়ল। বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম।

ঘড়ির কাঁটায় তখন ভোর পাঁচটা প্রায়। ঘন্টাখানেক পর ভাড়া করা গাড়িতে শাকিল আর জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সঙ্গে রওনা দিলাম। রাস্তা পুরোপুরি ফাঁকা। শহরের ঘুম ভাঙার আগেই আমরা পেরিয়ে গেলাম। মহাখালী থেকে রওনা হওয়ার সময়ই জাহাঙ্গীর ভাই নাস্তা খাওয়ার কথা বলেছিল। পরে গাড়িতে বসে কথায় কথায় কাচপুর ব্রিজ চলে এলাম। ড্রাইভারকে জাহাঙ্গীর ভাই বললেন, সামনে কোনও ভালো রেস্টুরেন্টে থামাতে,খুব খুদা লাগছে। খুদা অবশ্য লাগারই কথা তিনজন ননস্টপ কথা বলেই যাচ্ছিলাম। একজনের মুখ থেকে আরেকজনের কেড়ে নিয়ে যেন চলছিল কথার প্রতিযোগিতা। অবশেষে সেই সামনেটা হলো মেঘনা ব্রিজ পেরিয়ে। একটি রেস্টুরেন্টের ভেতরে ঢুকলাম। নান রুটির সাথে ডাল অর্ডার করে অপেক্ষা করছিলাম। ওয়েটার বলল,নান রুটি হবেনা। পরোটা হবে। জাহাঙ্গীর ভাই কিছুটা উত্তেজিত গলায় বললেন,যা আছে তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো। কয়েক মিনিট পর পরোটার প্লেট আর ডালের বাটি সামনে রেখে গেল ওয়েটার। খাবার দেখতে ছিল আকর্ষণীয়। খেয়েও আমরা সবাই সন্তুষ্ট। সব শেষে চা-পান করে উঠে পড়লাম।

দাউদকান্দি ব্রিজ পেরিয়ে ডান দিকে শ্রীরায়ের চর রাস্তায় ঢুকলাম। সামনে বিশাল বড় এক ট্রাক। গোটা রাস্তা দখল করেছে। ট্রাকটিকে ওভারটেক করে সামনে যাওয়ার মতো ফাঁক নেই রাস্তায়। ট্রাক একটু যায়,একটু থামে। পিছন পিছন আমাদের গাড়ি। এভাবে যেতে যেতে ট্রাকটি সামনে গিয়ে ডানদিকের আরেকটি রাস্তায় ঢুকল। আমরা সোজা চললাম। ট্রাকের পিছনে আটকা পরে দু মিনিটের পথ যেতে আমাদের সময় লাগল প্রায় পনের মিনিট। এবার একটাই পথ তবে আঁকাবাঁকা। যে জন্য কম গতিতে গাড়ি চালাতে হচ্ছিল। প্রায় পাঁচ কি.মি. পথ পেরিয়ে গাড়ির চালক মুখ খুললেন। এক এক করে বলতে শুরু করলেন,এই পথে পূর্বে কবে কবে এসেছিলেন। তার সঙ্গে পথে কিছু কিছু জায়গা দেখিয়ে বলছিলেন, তিনি এখানে এসেছেন,সেখানে এসেছেন। এরপর আমরাও তাকে নানারকম প্রশ্ন করছিলাম। যাচ্ছিলাম লেংটার মেলা নামে খ্যাত হযরত সোলেমান শাহ (র:)-এর মাজারে। গাড়ি চালকের কাছে সোলেমান শাহ (র:) সম্পর্কে জানতে চাইলাম। বললেন, 'সোলেমান শাহ উপমহাদেশের একজন খ্যাতিমান আউলিয়ার দাবিদার। তিনি পোশাক পরিধান করতেন না আর তাই লেংটা বাবা নামেও পরিচিত। তার জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন মতলবের বিভিন্ন অঞ্চলে। বিয়ে করেছিলেন নারায়ণগঞ্জে। সারাদেশ ঘুরে বেড়ালেও মতলবের বেলতলীতে বেশিরভাগ সময় থাকতেন। ওরসের সময় এই বেলতলীতে লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। আশে-পাশের কয়েক গ্রামজুড়ে ভক্তেরা থাকেন। কয়েক বর্গকিলোমিটার জুড়ে বসে ভান্ডারী, মারফতী ও বাউল গানের আসর। এছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবারও গানের আসর জমে। অনেকে এ আসরকে লেংটার মেলা, পাগলের আসর, পাগলের মেলাও বলে।'

লেংটার মেলা সম্পর্কে আগেও অনেকের কাছে শুনেছিলাম। পত্র-পত্রিকাতেও অনেক লেখা পড়েছি। তবে এবারই প্রথম যাওয়া। শ্রীরায়ের চর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটারের বেশি পথ ভিতরে এসে খাড়া একটি ব্রিজ পড়ল। সম্ভবত এটি বাগারবাড়ী ব্রিজ। ব্রিজ থেকে দুদিকে দুটি পথ দেখতে পেলাম। আমরা বাঁ দিকের রাস্তায় এগোলাম। সব মিলিয়ে দাউদকান্দি ব্রিজ থেকে প্রায় পঁচিশ কি.মি. পথ পেরিয়ে একটু দূর থেকে চোখে পড়ল, দু'তিনটি মিনার। বুঝতে পারলাম চলে এসেছি বেলতলী। গাড়ি নিয়েই সরাসরি ঢুকে গেলাম মাজার গেটের সামনে। লাল ইট বিছানো পিচ ঢালাই বিহীন পথ। দু'পাশে গামছার দোকান। মাজার গেটের কাছাকাছি আগরবাতি, মোমবাতি, ফিতে, সন্দেশ ও তবারকের দোকান। দেখতে পেলাম মাজারের মূল ভবনের সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজ চলছে। ভক্তদের আনাগোনা একেবারেই চোখে পড়ল না। হাতে গোনা কয়েকজনকে দেখলাম মাজার জিয়ারত করছেন। দু'একজনকে দেখলাম মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে দুহাত পেতেছেন। তবে বেলা গড়ালে মানুষের আনাগোনা বাড়বে বলে মনে হল। ভাগ্যবসত সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। আর তাই ঠিক করলাম রাত পর্যন্ত থেকে গানের আসর দেখে যাব।




এবার সেখান থেকে বেরিয়ে চলে গেলাম সাদুল্যাপুর। শাকিলের এক আত্মীয়র বাড়িতে। বেলতলী থেকে পাঁচ মিনিটের পথ। দুপুরে পেট শান্ত করে আবার বের হলাম। এবারের গন্তব্য ষাটনল লঞ্চঘাট। সাদুল্যাপুর থেকে ঘন্টাখানেক সময় লাগল। পিচঢালা পথ থেকে নেমে কাঠের সাঁকোতে হেঁটে লঞ্চঘাটে প্রবেশ করতে হয়। হেঁটে যাওয়ার সময় সাঁকোর নীচ থেকে একজন মহিলা ডাকল। তাকিয়ে দেখি দুজন মহিলা নৌকায় মাছ ধরেছে। আমাদের মাছ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল,কিনব নাকি? কথায় কথায় যখন তারা জানল আমরা ঢাকা থেকে এসেছি, মাছের দাম চাইল, ১৮০০ টাকা। যার দাম কিনা খুব বেশি হলে ৪০০ টাকা হবে। আমরা কথা না বাড়িয়ে এড়িয়ে চলে গেলাম। লঞ্চঘাটে দীর্ঘ সময় কাটল। প্রতি আধঘন্টা পর পর ঘাটে লঞ্চ ভিড়তে দেখলাম। লঞ্চগুলো একেবারেই ছোট ছোট। নারায়ণগঞ্জ থেকে চাদপুর। আবার চাদপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ যাওয়ার পথে ছোট এ লঞ্চগুলো এখানে ভেড়ে। বড় এবং বরিশালগামী দূর পাল্লার লঞ্চগুলো এখানে দাঁড়ায় না।

সন্ধ্যার হওয়ার পর ষাটনল থেকে সাদুল্যাপুর পৌঁছে বেলতলীর দিকে যাওয়ার পথে গান বাজনার আওয়াজ কানে আসছিল। সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলাম পুরোপুরি জমজমাট অবস্থা। নানান কিসিমের মনোরোগী চোখে পড়ল। শুধু পুরুষই নয় মহিলার সংখ্যাও অনেক। মূল মাজার দালান ব্যতীত পাশের একটি করে বড় কক্ষ বিশিষ্ট আলাদা আলাদা দালানের ভেতরে বসেছে গানের আসর। একেকটা দালানের ভেতর আলাদা আলাদা গানের দল। ভিন্ন ভিন্ন গান গাইছে। বাজছে তবলা, ঢোল, বাঁশি, হারমোনিয়াম। গানের তালে তালে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে মাথা নাড়ছে, কেউ বসে চোখ বন্ধ করে তালে তালে মাথা নাড়ছে। আবার কেউ দাঁড়িয়ে গানের তালে তালে শরীর নাড়াচাড়া করছে। কেউ কেউ শুধু হাততালি দিচ্ছে। ভেতরে ফ্যান বন্ধ। জ্বলছে আগর বাতি, মোমবাতি। সব দালানের ভেতরেই একই চিত্র দেখতে পেলাম। সব আসরেই পুরুষের সঙ্গে প্রায় সমান সংখ্যক নারীদেরও তালে তালে নাচতে দেখলাম। ঘুরে ঘুরে দেখার সময় লক্ষ্য করলাম, একটি দালানের ভেতর গানের আসরের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে লাল শার্ট পরনে একজন পাগল। মাথায় চুল নেই। প্রথমে দেখি বাদ্যযন্ত্রের তালে তালে চোখ বন্ধ করে মাথা নাড়াচাড়া করছে। এভাবে কয়েক মিনিট পর পর সে দু'হাত উঠিয়ে সোজাসুজি ছড়িয়ে দিয়ে চিৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে নাচতেও লাগল। তারপর আবার আগের মতো দাঁড়িয়ে মাথা নাড়াচাড়া করতে থাকল।

মাজার এলাকায় দোকানগুলোতে যেকোনও পণ্য কিনতে প্যাকেটে লেখা মূল্যের চেয়ে দুই থেকে পাঁচ টাকা বেশি দিতে হল। একটু পর গান বাজনার আওয়াজ একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। দেখলাম সবগুলো আসরের ভেতরেই সবাই খাওয়া-দাওয়ায় ব্যস্ত। এরপর আবার গান বাজনা হবে কিনা তা দেখার জন্য আর অপেক্ষা করলাম না। বাড়ি ফেরার জন্য গাড়িতে উঠে পড়লাম।

পেশায় সাংবাদিক রফিকুলের বাড়ি বাংলাদেশে। জাতীয় দৈনিক পত্রিকার ফান ম্যাগাজিনে রম্য লেখার মধ্য দিয়ে লেখালেখির শুরু। বর্তমানে অনলাইন ভিত্তিক কার্টুন ম্যাগাজিন 'টুনস ম্যাগ বাংলা' সম্পাদনা সহ বেশ কিছু জাতীয় পত্রিকায় নিয়মিত কলম ধরেন। পাশাপাশি যুক্ত রয়েছেন নানান সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠনের সাথে। ভ্রমণ, আড্ডা ও ছবি তোলা তাঁর পছন্দের বিষয়।



tell a Friend

অন্য ভ্রমণ

ভ্রমণ তো বানিয়ে তোলা গল্পকথা নয়, মানুষের সত্যিকারের জীবনকাহিনি। আর তাই ভ্রমণ কাহিনি মনে শুধু আনন্দই এনে দেয় না, চোখের জল অথবা প্রতিবাদের ভাষাও জাগিয়ে দিতে পারে। ট্যুরিজম ইন্ড্রাস্ট্রির সহায়ক বিজ্ঞাপনী প্রচারমাধ্যম ছাড়াও ভ্রমণ কাহিনির বড় পরিচয় বিশ্ব সাহিত্যের একটি অন্যতম ধারা রূপেও। তেমনই কিছু 'অন্য ভ্রমণ' কথা।

# বনঘরের গেরস্থালি

পীতম চট্টোপাধ্যায়

বন আস্তানার শরীরে চান্দ্রমাসের অভিঘাত থাকে। যে টুকু ছুড়ুক পুড়ুক বন মেখেছি - স্মৃতির সেসব অভয়ারণ্যের আবহে এই আস্তানাগুলোর আদর ছিল অগাধ। চাঁদনী রাতে এমন কোনও ঠাঁই জোটালে বোনাস হিসেবে অনাবিল রবীন্দ্রনাথ এসে যান - হোক বেসুরো - পর্দা বদল - মিলিয়ে দিলাম গলা। আবার যখন জোছনাবিরহী অমাবস্যা - বাংলোর রাস্তা চেনায় জোনাকি মিছিল তখন তার অন্য রূপ। প্যাঁচার ডানায় জমা গাঢ় আঁধারে টের পাই এখানে জীবনানন্দ আছেন - আমি আসার ঢের আগে থেকেই।
অফিসের অফসিজনে ম্যানেজ করা ছুটি - তখন যখন ছুটি - সেসব সময় এমন হিসেব মেলেনা। তবে বন বাংলোর সঙ্গে একসাথে স্নান মেখেছি বিস্তর। মেঘের পাড়ায় - ভালুকপং-এ জিয়াভরলির পাড়ে। সেটা বেশ রাজকীয় ব্যাপার স্যাপার - কিন্তু রাজকন্যে বলে কি তার মনকেমন নেই? সন্ধ্যা হওয়ার আগে আগে উড়ে যাওয়া একলা বুনোহাঁস দোতলার বারান্দার সামনে মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল - রঞ্জনা আমি আর আসব না - শীতকাল কোথায় তখন। এই খবরটা পেয়েই জারদৌসী অভিমানে ফুলে ওঠা অকালবৈশাখী - বন আস্তানার মনখারাপ এত সুন্দর হতে পারে?

সারান্ডা গেস্ট হাউস প্রধান বাংলো, সারান্ডা

কিছু জঙ্গল স্কুল পালানো মোহনবাগান মাঠ - দল বেঁধে না গেলে মজা নেই - ছোট্ট সময়ে অপার ক্লোরফিলের টাকিলা। সারান্ডায় শালবনের মধ্যে দিয়ে যখন জীপ চলেছে হুডটি খুলে - তখন কি জানি এমন ঘোর দুর্গের মধ্যে পেয়ে যাবো অলীক অ্যাফ্রোদিতি! কাঠের বাংলোর ঠিক পিছন দিয়ে ঘের দিচ্ছে মাঝ বর্ষার উথাল পাথাল কোয়েল নদী। যার পেটে পাশের আরেকটা কটেজের বারান্দা আর শোয়ার ঘরও। কিছু বুনো ফুল শহুরে ফ্লাওয়ার ভাসেও মাপ মত হাসতে জানে। এ বাংলোর সামনের টেনিস কোর্টে অবহেলার ঘাসের সাইড - বেস - ট্রাম লাইন। তারও পরে ঢেউ খেলানো বুনোফুলের চত্তরটা - নাইন হোল গল্ফ গ্রাউণ্ড। এমন বাংলোয় বৃষ্টি আড়াল করে আনা বিরিয়ানিতে অবিকল পার্কসার্কাসের আভিজাত্য। সন্ধের আড্ডার আবহে চিতাবাঘের গল্প - অল্প শহুরে সন্দেহ - আর অনেকটা মিঠে বনবিলাসী ভয়! সিগারেট খেতে বেরোলেও সঙ্গে কেউ থাকলেই ভালো! মাঝ রাতে বন্ধুর ডাকে ভয়ে ভয়ে বারান্দায় -কি যেন একটা হেঁটে গেল - আরে ধুর্ - চেয়ে দেখ - এমন চাঁদের আলো!

চাপড়ামারির নতুন বনবাংলো

কখনও বিকল্পও পরিশ্রমী হয়ে ওঠে বোধ হয় - আর সফল হয় প্রধানকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রকল্প। পানিঝোরার নতুন বাংলোয় যেতে হয় মূল ভিআইপি ঠেক বাংলোর পাশ দিয়ে - ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ৪ কিমি বেপথে গাড়ি চালিয়ে। সামনে একটু নীচে মূর্তি নদীর রুপোর হাঁসুলি আর দিগন্তে ডুয়ার্সের অমোঘ ল্যাণ্ডস্কেপ, পাশ থেকে কাকু বলে উঠল - "দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী তমালতালীবনরাজিনীলা"। সারাদিন যে জঙ্গলে বীরপুঙ্গব হাঁটাহাঁটির পর কিস্যু পেলাম না - আফশোস - সুর্য পাটে বসলে সেখানেই হেঁসোরাম হুঁশিয়ারি খতম। তখন রাত ভর্তি অন্যরকম ভয় আর অচেনা শব্দ - না দেখা লেপার্ড - না শুনতে পাওয়া হাতির নিঃশব্দ হেঁটে আসার থেকে কি সহজে আগলে রাখে - এই বননীড়। দিনের বেলা সেখানে হরেক পরিযায়ী মানুষজনের ভিড় - রাত হলেই তার হাতায় চেয়ারগুলো শিশিরে স্নান করে নেয় একা। আধখোলা দরজায় মুখ বাড়িয়ে সাবধানে প্রাণিত হয় ফেরারি জীবন।
রাতের খাবার খেতে বেরোয় কেউ হাতে আর কেউ কেউ চোখে টর্চ লাইট নিয়ে - সাবধানে। ঘাসের ওপর খসখসে হঠাৎ কিছু সরে যাওয়ার আওয়াজ জন্ম দেয় কত যে সর্পিল কল্পনার!

বনঘরের গেরস্থালি - সবুজ অক্ষর - ভেজা স্বপ্নের রান্নাঘরে গল্প ফেঁদে বসলে চরিত্রের অভাব হয়না। কিন্তু সেই চরিত্র গুলোকে একসাথে গেঁথে রাখে যে আলোর আলপিন তাদের গায়ে সময়ের জং লেগে যায়। তার পর কোনও একটা জানলা - বা একলা অপেক্ষার বারান্দা দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ে - আমায় মুড়ে দেয় শ্রেষ্ঠ স্মৃতির আদুরে চাদরে!

শব্দে আশ্রয় নিই আর ফিরে যাওয়ার প্রতিশ্রুতিগুলোকে ফের রোদ খাওয়াই - রাত হলে ঘোলাটে জ্যোৎস্নাও।

ফিসফিস করে বলি - ফিরে আসব।

ভালুকপং বনবাংলো

---

পীতম চট্টোপাধ্যায় কর্মসূত্রে আইডিবিআই ফেডেরাল লাইফ ইনসিওরেন্স-এর ট্রেনিং ম্যানেজার। ভালোবাসেন বেড়াতে, পাখি দেখতে আর তাদের ছবি তুলতে। জঙ্গল সব চাইতে প্রিয়। লেখালিখি করতেও ভালো লাগে। চরম আড্ডাবাজ। স্বপ্ন দেখেন ভূ-পর্যটনের।।

---

অন্য ভ্রমণ

ভ্রমণ তো বানিয়ে তোলা গল্পকথা নয়, মানুষের সত্যিকারের জীবনকাহিনি। আর তাই ভ্রমণ কাহিনি মনে শুধু আনন্দই এনে দেয় না, চোখের জল অথবা প্রতিবাদের ভাষাও জাগিয়ে দিতে পারে। ট্যুরিজম ইন্ড্রাস্ট্রির সহায়ক বিজ্ঞাপনী প্রচারমাধ্যম ছাড়াও ভ্রমণ কাহিনির বড় পরিচয় বিশ্ব সাহিত্যের একটি অন্যতম ধারা রূপেও। তেমনই কিছু 'অন্য ভ্রমণ' কথা।

# জিস্ দেশ মে গঙ্গা বহতি হ্যায়

কাঞ্চন সেনগুপ্ত

কলকাতা, ডায়মন্ডহারবার, রানাঘাট... তিব্বত।
এ আর এমন মুশকিল কি!

আপনি যদি 'কোথায় যাচ্ছি'র থেকেও বেশি ইন্টারেস্টেড থাকেন 'কিভাবে যাচ্ছি', 'কোথা কোথা দিয়ে যাচ্ছি' আর 'কাদের সঙ্গেই বা যাচ্ছি' এসমস্ত খুঁটিনাটিতে, তবে জানিয়ে রাখি ওই তিব্বত যাওয়ার কাছাকাছি রোমাঞ্চকর জার্নির সন্ধান এখন আমার ঝুলিতে। আপনি চাইলেই বের করতে পারি ঝুলি থেকে বেড়াল।

আচ্ছা বেশ! অতই যখন ঝোলা-ঝুলি করছেন, তাহলে এই নিন... ওমা বেড়াল হয়ে গেছে চশমা! বেশ, চোখে এঁটে বসুন তবে, আমি টিকিটটা কেটে ফেলি তাড়াতাড়ি।

আরে মশাইরা করেন কি... ভুলেও ওই যন্ত্রটায় চাপতে যাবেন না, ওটা টাইম মেশিন। ওটায় করে এখন আমায় চার মাস পাস্টে যেতে হবে, তবেই-না সেই রোমাঞ্চকর তিব্বত যাত্রার টিকিট পাব।

এইটুকুতেই চোখ কপালে তুললে কি'করে চলে... আজকাল এছাড়া আর উপায় কি বলুন! এই ধরনের হুট-বলতে-পুট তো আর টিকিট পাওয়া যায় না। মাধ্যমিকের প্রিপারেশন আর হলিডেতে ট্রেনের টিকিট পাওয়া একই রকম চাপের। তার ওপর আবার টিকিট ক্যান্সেলেশন চার্জ এখন এমন যে মনে হবে কেটে রাখা টিকিটটারও একটা বিমা করিয়ে রাখি, যদি কোনো কারণে শেষ মুহূর্তে যেতে না-পারি!

তবে চিন্তা করবেন না একদম, পুরনো হাওড়া স্টেশনের একপাশে পড়ে থাকা ১৪ নং প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দাঁড়ান, আমি হুট করে যাব ঠিক চার মাস আগে, আর পুট করে ফিরব কনফার্মড টিকিট নিয়ে।

আমি কিন্তু জানতাম ঠিক এই কথাটাই উঠবে। আরে মশাইগণ, টাইম মেশিনে শুধু টাইমের এপার-ওপার করা যায়, জায়গার এপার-ওপার করতে ইন্ডিয়ান রেলই ভরসা। আরও ভরসার কথা এই যে সরকার থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে গিয়েছে এর মধ্যেই, এমন ব্যবস্থা(!) নেওয়া হতে চলেছে টিকিট বুকিং, ক্যান্সেলেশন ইত্যাদিতে, যে-কেউ রেল ভ্রমণ মনস্থ ক'রে যেন বিফল মনোরথ না হয়। (যদিও এইসব...এবং আরও আরও এইসব ভীষণ রকম কার্যকরী পদক্ষেপের সুফল সম্পর্কে বেশির ভাগ অশিক্ষিত আহাম্মক ভারতবাসীকে সোজা সরল ক'রে বোঝাতে গিয়ে ভারত সরকারের বেশ ভালোই ব্যয় হয়ে যাচ্ছে প্রচারে, বিজ্ঞাপনে।) আপাতত বিজ্ঞাপনের বুক্‌নিতে বুক বেঁধে পাড়ি দিলাম টাইম মেসিনে, ঠিক চার মাস আগে...
#
#
#
এতো করেও পারলাম না, বুইলেন। ডিসেম্বর ২৫ টিকিট নেই
২৬ টিকিট নেই
২৭ টিকিট নেই
অগত্যা এগোতে লাগলাম
২৪ টিকিট নেই
২৩ টিকিট নেই
২২-এ গিয়ে সকালের ফলকনামায় টিকিট পেলাম।
এখন, ২২ তারিখ যাওয়া মানে দিনটা পুরো ট্রেনেই। গোপালপুরে হোটেলে ঢুকব যখন তখন ডিনারের অর্ডার নিতে আসবে। আর সেখানে মাত্র ২৩ তারিখটা থেকে ২৪-এর রাতেই ফেরার ট্রেন (২৫শে ডিসেম্বর ছুটি। ওই দিনই ফিরতে চাইছি। নানান ঝামেলায় যদি ট্রেন লেট করে, অফিস কামাই যাওয়ার ভয় নেই। তাছাড়া নাছোড় রুটিনে জুতে যেতে খানিক মানসিক প্রস্তুতির জন্য ২৫ তারিখটা হাতে রাখা)।
আর সেইজন্যেই খুব-করে চাইছিলাম ২১ রাতে যদি রওনা দেওয়া যেত, আর ২২ সকাল সকাল চেক ইন্... তাহলে খানিক হলেও ২২,

২৩, ২৪ ছুটিটা মালুম হোত অ্যাট্‌লিস্ট।
কোনও ট্রেনে কোনও টিকিট নেই!
একবার ভাবলাম টাইম মেসিনটাই কি টাইম ফেল্ করল নাকি? ২১শে ডিসেম্বর রাত্রিবেলার যেকোনো ব্রহ্মপুরগামী ট্রেনে, স্লিপারে (এসি আজকাল আগে ফুরিয়ে যায়) মাত্র চারটে টিকিট পেলাম না!
ও হ্যাঁ, নামটা ব্রহ্মপুর, বেহ্‌রামপুর নয়; ওখানে পৌঁছে রেল স্টেশনে দেখেছি, ইংরাজি ও হিন্দিতে ব্রহ্মপুরই লেখা ছিল। ওড়িয়াতেও লেখা ছিল, তবে তা আমাদের কাছে অর্থহীন। যাই হোক ক্ষ্যাপা কুত্তার মতো হেদিয়ে মরছি যখন টিকিটের জন্য তখন আমাদের তিল মাত্র হলেও আশার বাতি দেখাল যে ট্রেনটি সেটিই একদা কলকাতা থেকে ডায়মন্ড হারবার হয়ে রানাঘাট হয়ে তিব্বত নিয়ে যেত মাত্র সোয়া ঘন্টায়!

আর এখন সপ্তাহে একদিন মাত্র (হাওড়া থেকে সোমবার) সুদূর মজফ্‌ফরপুর থেকে ছেড়ে হাওড়া হয়ে ভাইজ্যাগ হয়ে চেন্নাই হয়ে... ... ...
ট্রেন নং. ওয়ান ফাইভ টু টু এইট, মজফ্‌ফরপুর - ইয়স্‌য়ন্থপুর এক্সপ্রেস।
না, কন্‌ফার্মড টিকিট হল না তবু, আর.এ.সি. ১১,১২,১৩,১৪। তো ভি অচ্ছা! চার মাস সময় আছে, একটু একটু করে এগোলেও চলবে।

তবু জানি না কেন, আমাদের চারজনের মধ্যে একজন 'মজফ্‌ফরপুর' শুনে নাক সিঁটকাল! বাকিরা সবাই খুব এক্সাইটেড। অফিসে দরখাস্ত, হোটেল বুক সব সাত তাড়াতাড়ি সারা। এমন কী বেড়াতে বেরনোর দু'দিন আগেই যখন পোটলা ভারি করায় ব্যস্ত (হোটেলে ফোন করে একবার আলগোছে জেনেও নিলাম যে শীত নেই গোপালপুর-অন-সীতে) ঠিক তখনই মোবাইলে এস.এম.এস ঢুকে গেল ইন্ডিয়ান রেলের তরফ থেকে, কনফার্মড্ টিকিট উইথ বার্থ ও কোচ নাম্বার। বুকিং স্ট্যাটাস বলছে একজন দলছুট S9-এ। বাকিরা S4। নিজেদের মধ্যে এও আলোচনা করে নিলাম, ট্রেনে উঠে S4-এর কাউকে বলে অ্যাডজাস্ট করে নেওয়া যাবেখন S9-এ যাওয়ার জন্য, আর একান্তই যদি রাজি না-হয়, তাহলেও চিন্তার কিছু নেই, একরাতের তো কিস্‌সা। আমাদের তখন ডগমগ আহ্লাদ। ব্রহ্মপুরে রাইট টাইম সকাল সাড়ে নটা (৯-৩৫)। সেখান থেকে অটো ধরে গোপালপুর-অন-সী'তে হোটেল সীসাইড ব্রীz কতক্ষণ আর... বেলা এগারোটার মধ্যে স-মু-দ্র-ও-ও-ও-ও...।
#
আমাদের এসব ছোট ছোট আদুরে চাওয়াগুলি লক্ষ্য করে অলক্ষ্যে যিনি মিচকি মিচকি হাসেন, তাঁর সাথে একবার লেফ্‌ট অ্যান্ড রাইট ডুয়েলে যাওয়ার ইচ্ছা রইল।

ট্রেন নং. ওয়ান ফাইভ টু টু এইট, মজফ্‌ফরপুর - ইয়স্‌য়ন্থপুর এক্সপ্রেস ঘড়ি ধরে কাঁটায় কাঁটায় বাইশটা পঞ্চান্নতে ১৪ নং প্ল্যাটফর্ম ঘেষে দাঁড়াল। তার আসা... এসে দাঁড়ানো দেখে ভালো ঠেকল না। মনে মনে খানিক দমে গেলেও বুঝতে দিলাম না। যে নাক-সিঁটকেছিল, সে আরও খানিক সিঁটিয়ে গেল, তাকে সান্ত্বনা দিলাম, 'হাওড়ায় তো খালি হবে, তাছাড়া আমাদের তো কনফার্মড রিজার্ভেশন, চিন্তা কী!' সান্ত্বনা দিলাম বটে তবে গলায় তেমন জোর নেই। ট্রেন থামতে এস ফোর লক্ষ্য করে এগোতে লাগলাম। জেনারেল কম্পার্টমেন্টগুলো পেরোনোর কালে জানলা দিয়ে ভেতরটা যে-রূপ ঠাহর হল, যেন দেওয়ালির আগে ওস্তাদ কারিগর দোতলা তুবড়ি বানিয়েছে মশল্লা ঠেসে। শুধু মুখের কাছে তারাবাতির আগুনটা ধরা বাকি। তখনও মনে মনে প্রবোধ দিচ্ছি, রিজার্ভ কম্পার্টমেন্টে এরকম ভিড় হবে না নির্ঘাত। পা যেন সরছে না, কিন্তু টেনে নিয়ে চলেছি... উপায় নেই, কষ্ট না করিলে কেমনে আসিবে 'অচ্ছে দিন'?

এস-ফোর
দরজার মুখটায় এসে দাঁড়িয়েছি। পেছন থেকে কোনও ঠেলাঠেলি নেই, কারণ লোকই তো নেই প্ল্যাটফর্মে। শুধু কামরার দরজাটা ভেজানো। আমি এগিয়ে গিয়ে ঠ্যালা দিলাম। লোহার দরজা অর্ধেক হাঁ হয়ে আটকে গেল কিসে যেন লেগে! আধফালি যা দৃষ্টিগোচর হল, মোটা বেডকভারে এপার-ওপার বাঁধা একটি হ্যামক! (সমুদ্রের এখনো ঢের দেরি, হাওড়াতেই সমুদ্রপাড়ের একছিটে আভাস পেলাম)।

দরজা দিয়ে উঠেই ডান হাতে যে একটি বসার সিট থাকে তার ওপরের কোনো জায়গা থেকে টেনে আড়াআড়ি বাথরুমের দরজার সামনের কোনো একটা আংটায় বাঁধা এক অত্যাশ্চর্য মোহন-ঝোলা। আমি থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম দরজার বাইরেই, এ জিনিস নতুন দেখছি... আর আমাদের মধ্যে থেকে সেই-একজন ফেটে পড়ল, "আমি বলেছিলাম...আমি বলেছিলাম...।" আমরা বাকি যারা তাকে খুব করে আস্বস্ত করেছিলাম, তাকে আর বেশি বলতে না-দিয়ে এবং একবার মাত্রও তার দিকে দৃকপাত না-করে, কামরার ভেতরে নিজেদেরকে মালপত্র সমেত জাস্ট গুঁজে দেওয়ার চেষ্টা দেখতে লাগলাম।

প্রথমতঃ নিজেদের মোড অফ মাইন্ড চেঞ্জ হয়ে গেল দ্রুত। মুখ খুললেই হিন্দি বেরোচ্ছে, সে যেমনই হোক। সেই ঝোলাকে কোনও একটি ঘুমন্ত লাশ সমেত গুঁতিয়ে খানিক জায়গা করে এগিয়ে গেলাম গুনে গুনে দুই পায়ের পাতা। সিট নাম্বার ঊনসত্তর-সত্তর ইত্যকার। অর্থাৎ বেশি ভেতরে ঢুকতে হবে না, একেবারে সামনেই...পাওয়া গেছে দুটো আপার আর একটা মিড্‌ল। এস-নাইনে যেটা সেটাও মিড্‌ল। কিন্তু

যেখানে পা-দিয়ে টুক করে বডিটা প্লেস করব বার্থে, চলাফেরা করার সেই সরু প্যাসেজটায়, মেঝেতে পাশাপাশি সেঁটে শুয়ে আছে দু'জন! এবং তাদের ধাক্কা দিয়েও জাগানো যাচ্ছে না। এই পর্যন্ত এসেই আমাদের মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া থমকে গেল। দাঁড়িয়ে পড়লাম। এভাবে হবে না। আমাদের সামনে-পেছনে-উপরে-নীচে...সর্বত্র লোক আর লোক আর লোক। "লোক-না-পোক"... সেই রাতের কথা লিখতে লিখতেই মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে এল কথাটা। মশাইরা আপনারা সব 'রাগ ঘৃণাকে আটকান', অপরাধ নেবেন না প্লিজ, ঠাসাঠাসি নয়, থিক্‌থিকে নয়, গিজগিজ নয়... সে যেন একেবারে বিজ্‌বিজ্‌ করছে মানুষ(!) সত্যি বলতে কী, এতটা ভাবিনি। যেদিকে মাথা ঘোরাচ্ছি, অপেক্ষা করে আছে ঘিন্‌ঘিনে রকমের বিস্ময়কর দৃশ্যপট --- আপনাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই বর্ণনার বিস্তারে আমি যাচ্ছি (মনে রাখবেন বিস্তারে যাচ্ছি মাত্র, বাগাড়ম্বরে নয়।)

কামরার ভেতর পায়ে চলার পুরো প্যাসেজটায় যেভাবে শুয়ে অকাতরে ঘুমাচ্ছে (বা ভান করছে), মনে হচ্ছে বদ্ধভূমি গুয়েন্তেনামো থেকে শিপিং কন্টেনার ভর্তি গুলিবিদ্ধ লাশ নিয়ে পাচার হচ্ছে! আশেপাশের যে কটি বার্থে চোখ গেল, অল্প আলোয় ওই ছায়া ছায়া আবছায়াতে দেখলাম যেন দলা পাকানো পাকানো গাঢ় চাপ চাপ অন্ধকার ঘাপটি মেরে আছে মালে-মানুষে। কোথাও সিটের ধার ঘেঁষে বিপজ্জনকভাবে ঝুলে আছে ঘুমন্ত একজোড়া পায়ের পাতা ও একটি মাথা। এক ঝলকে আঁৎকে উঠি - সামলাই নিজেকে, ওটা আসলে একজনের দুটি পা ও আরেকজনের মাথা - সেটা বুঝেও শিউরে উঠি। কোথাও একটা স্বস্তিকর ফাঁকা একফালি জায়গা খুঁজতে থাকি কামরাময়, যেখানে অ্যাটলিস্ট, আমার চোখ দুটোকে রাখতে পারি খানিকক্ষণ। সেই আশায় একেবারে সিলিং-এ তাকালাম। সিলিং জোড়া, অ্যাজইউসুয়াল, কালো ঝুপ্পুস রেলের ফ্যান (ঠিক এমনটি আর কোথাও দেখিনি রেল ছাড়া)। অ্যাজইউসুয়াল বন্ধ, ঘুরছে না, কিন্তু আমার মাথাটা ঘুরে গেল বোঁ করে, ফ্যানের ওপরে ওগুলো কী... চপ্পল?! ভালো করে ঠাহর করলাম, প্রত্যেকটার ওপর, একই অবস্থা!
#
বাবা একবার খুব উদাসীন ভাবেই প্রশ্নর মতো করে বলেছিলেন, "আচ্ছা যে মানুষটাকে সহ্যের শেষ সীমা পেরিয়ে গিয়ে অত্যাচার করা হয়েছে, এমনকি হাতে-পায় পেরেক পুঁতে ক্রুশে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রায় অনুভূতি শূন্য প্রাণটুকু যে বেঁচে আছে তাও শরীর ছেড়ে দেওয়ার অপেক্ষায়, এমতাবস্থায় সেই মানুষটি নীচে ক্রন্দনরত কিছু নাবালক নাবালিকাকে দেখে হাসবেন না তো আর কী-ই বা করবেন? তাঁর সেই হাসির মধ্যে আর অন্য কোনো মহান দর্শন খোঁজার কোনো মানে হয়?" এসব বিতর্কিত কথা এবং আমি তর্ক তুলেওছিলাম সে সময়, তবে বরাবরের মতো বাবা ওইটুকু বলেই চুপ; তর্কে পাওয়া যেত না তাকে। বিশ্বাসে পাওয়া যেত হয়তো।
#
সেই রাতে সেই ট্রেন কম্পার্টমেন্টে দাঁড়িয়ে আমার হাসি পেয়ে গিয়েছিল। আমার হাসির সঙ্গে যিশুর হাসি বা আমার অবস্থার সঙ্গে যিশুর অবস্থার মিল খুঁজতে যাবেন এমন বোকা আপনারা নন, তবে ওই আরকি, কোথা থেকে কিভাবে যে বাবাকে মনে পড়ে যায় বুঝে উঠতে পারিনা আজও! আমি সত্যিই হেসে ফেলেছিলাম। মাথার ওই ওপরে জুতোর অবস্থান দেখে যতটা চমৎকার লেগেছিল, কামরার মধ্যে আস্ত একটা হ্যামক দেখেও তা হয়নি!

ওই হাসিটাই জড়তা কাটিয়ে দিল। চোস্ত হিন্দিতে বলতে শুরু করলাম, ভাই রিজার্ভেশন হ্যায়, উঠিয়ে, উতর যাইয়ে, চলিয়ে জলদি কিজিয়ে, জলদি কিজিয়ে, সাথ্‌মে লেডিস হ্যায়, এ বাবু, উঠ্‌ঠো না, কায় নাহি শুনে হো, চলো চলো উতর যাও, সিট খালি করো... সিট খালি করো...
কোথায় খালি করবে তা কিন্তু বুঝতে পারছি না নিজেরাই! কোথাও তো কোনো জায়গা বাকি নেই। প্রথম খালি হোল মিড্‌ল বার্থটা। একটি বোরখা ও দুটি ছানা মুহূর্তের মধ্যে টুপ টুপ করে খসে পড়ে দুটি লোয়ার বার্থ ও তারও লোয়ার মেঝেতে যে কোথায় মিলিয়ে গেল, ওই আধো আলোয় ঠাহর করা গেল না। মনে হল কালো পাপড়ির একটা বিশাল ফুল, অসময় ফুটে উঠে হতচকিত আবার পাপড়ি মুড়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ওই রাতে ওই সময় ওইখানে একটা ফ্ল্যাশ হল আমার ব্রেনে এবং আমি যথার্থ অনুভব করলাম 'তার কাটা' কারে কয়, কয় প্রকার ও কী কী! নিজেকে বললাম, "ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সার্ভাইভ ইন দিস্ সিচুয়েশন, বি আ তার-কাটা"...হ্যাঁ ইংরাজিতেই বলেছিলাম, মনে মনে। চোখ দিয়ে, কান দিয়ে এবং হ্যাঁ অবশ্যই নাক দিয়েও যেসব সেনসেশন ঢুকছে ভেতরে, তারা সবাই যদি ব্রেনে নালিশ জানাতে থাকে আমায়, তবে এক্ষুনি প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়াতে হবে আর হাত নেড়ে বিদায় জানাতে হবে আমাদের সাধের হলিডে ট্রিপকে। তাই ব্রেনের 'আম-দরবারে' তালা ঝোলালুম।

আর বেশিক্ষণ নেই ট্রেন ছাড়ার, আমাদের দুজন কমরেড আপার বার্থ দুটোয় উঠে গেছে, আরেকজন চলে গেছে এস-নাইনের উদ্দেশে। তাকে প্ল্যাটফর্মে নেমে ছুটতে হয়েছে। বুঝতেই পারছেন কামরার ভেতর দিয়ে যেতে হলে, ও যখন পৌঁছবে, ট্রেনও তখন ব্রহ্মপুর পৌঁছবে। এই সময় ফোনে জানতে পারলাম, ওপারে যে গেছে সে জলের বোতল নেয়নি সঙ্গে। আমি একটা জলের বোতল নিয়ে ছুটলাম। বোতলটা দিয়েই ছুটে ছুটে ফিরে এসে, চটি পরেই উঠে গেলাম আমার জন্য ফাঁকা করে রাখা মিড্‌ল বার্থটায়। কোনো রকমে জাস্ট সেঁধিয়ে গেলাম। ট্রেন ছেড়ে দিল। আমার মনে ঠিক দুটো কথা এলো, (এক) আমরা প্ল্যান করেছিলাম, ট্রেনে উঠে সিট অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করব যাতে সবাই এক জায়গায় থাকতে পারি। এটা খুব পরিচিত অ্যাডজাস্টমেন্ট, ট্রেন সফর করা প্রায় প্রত্যেকেই এ-ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। সেই পরিচিত ব্যাপারটাই এখন অবাস্তব রকমের হাস্যকর লাগছে (...সরি আই মিন্ হাস্যকর রকমের অবাস্তব লাগছে)। তৎক্ষণাৎ মাথায় এলো, আচ্ছা প্রথম থেকেই তিনটে না-বলে যদি চারটে সিট রিজার্ভ আছে বলে চড়াও হতাম! এদের কারও রিজার্ভেশন আছে বলে তো মনে হয় না। আরামসে এখানেই চারজনের জায়গা হয়ে যেত। (তখন তখন বুদ্ধিটা মাথায় আসাতে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। এখন ফিরে ভাবছি যখন, কেমন একটা লাগছে। এখনকার সুসংহত আমি, তখনকার 'তার-কাটা' আমিকে ভেবে লজ্জিত হলাম।)
আর (দুই) যে কথাটা মনে এলো তাকে 'পজিটিভ থিঙ্কিং' বলা যেতে পারে। রাতের ট্রেনে মাঝ রাস্তা থেকে লুটেরা উঠে ডাকাতি-ছিনতাই কিছু করার চেষ্টা করতে পারে, এরকম একেবারেই মনে হল না। ভেবে খুব শান্তি পেলাম, ট্রেন স্পিড নিলেই কামরার ভেতরটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হবে, নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে রাত কাটিয়ে দেব। এই ভাবনা আমায় এতটাই উদ্বুদ্ধ করল যে আমি ওই মিড্‌ল বার্থে ঘাড় গুঁজে বসে গায়ের মোটা গেঞ্জি খুলে, ব্যাগ থেকে হাতড়ে হাতড়ে নরম গেঞ্জি বের করে (অপেক্ষাকৃত) আরাম করে শুলাম।

ট্রেন তখন গতি নিয়েছে ভালোই। চিত হয়ে শুয়ে দেখছি সামনের সাইড আপারে, এক মধ্য বয়স্ক ও এক যুবা সঙ্গে কোলবালিশের মতো

ব্যাগেজ। মাঝবয়সি যেভাবে দেয়ালে দু'পা তুলে চিৎপটাং হয়ে বার্থের বেশির ভাগটা দখল করে আছে, তাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সঙ্গের ছেলেটিকেও মনে হয় আরেকটা বাড়তি লাগেজ ভাবছে। সাইড লোয়ারে একই অবস্থা, তবে এদের মধ্যে মনে হল খানিক হলেও সদ্ভাব আছে। এদিকে আমরা তিনজন যে নির্মম ভাবে তিনটি বার্থে লম্বা দিয়েছি, স্ব স্ব 'ব্রেনের তার' সময় মতো কেটে না রাখলে তা সম্ভবপর ছিল না। আমাদের নীচের বার্থ দুটো ও সংলগ্ন মেঝে ও তৎসংলগ্ন প্যাসেজে যা স্লিপিং অ্যারেঞ্জমেন্ট (ছেলে বুড়ো শিশু মহিলা নির্বিশেষে) ছিল, আমার ধারনায়, মানুষ প্রায় অনুভুতি শূন্য না-হলে মনে হয় না ওভাবে যাত্রা করতে পারে! তাও দু-এক ঘন্টার সফর নয়; ম্যাক্সিমাম প্যাসেঞ্জারই চলেছে চেন্নাই, নয়তো ব্যাঙ্গালোর। মাইগ্রেটেড লেবার। পেটের দায়।
#
এইখানটাই যথোপযুক্ত সময় আবার একবার ট্রেন নং. ওয়ান ফাইভ টু টু এইট, মজফ্ফরপুর - ইয়স্যন্থপুর এক্সপ্রেস-এর যাত্রাপথটা দেখে নেওয়ার...
সুদূর মজফ্ফরপুর থেকে ছেড়ে হাওড়া হয়ে ভাইজ্যাগ হয়ে চেন্নাই হয়ে... ... ...
ঝাড়া ৪৮ ঘন্টা-কি-তারও বেশি এই অবস্থায়!
#
কোনও একজনের মোবাইলে কোনো ভোজপুরি সিনেমা চলছে (হেডফোন কানে দিয়ে সিনেমা দেখবে এমন স্বার্থপর কেউ ছিল না ট্রেনে)। আপ্রাণ ঘুমানোর চেষ্টা করেও ঝামেলা এড়াতে পারলাম না। বড়লোক ও বলাই বাহুল্য কোরাপ্ট নেতার মেয়ে, এক অটোচালক (কিন্তু সিনেমার হিরো)-র প্রেমে পড়েই যত ঝামেলা বাঁধিয়েছে। ঝামেলা পেকেছে বেশ উচ্চরবে। সুতরাং পাশ ফিরে থাকি কিকরে! একটাই ভরসা, ঘটনাক্রম (শুনে যতদূর আন্দাজ হচ্ছে) অকল্পনীয় দ্রুতগতি সম্পন্ন! সে গতির ভগ্নাংশমাত্র পেলে পৌনে এক ঘন্টায় কলকাতা থেকে তিব্বতে পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায়।
হেইইই! শ'খানেক অটোরিক্সার গর্জানিতে নায়ক চড়াও হল বোধহয় নেতার উঠোনে, তো এই শুনতে পেলুম সেই গর্জানির ওপরই কাঁপা কাঁপা আবেগমথিত ফুলশয্যার লিরিক্যাল ডায়লগ (যেন সুজির রসগোল্লা)। যেই ভাবলুম দিলওয়ালে দুল্হানিয়া নিয়ে বাড়ি গেল বোধহয়, ওমা! অপরিণামদর্শী নায়িকার মাথাগরম ভাই গর্জাতে আরম্ভ করল, 'মুদ্দু চাই মুদ্দু চাই'...
ধীরে ধীরে খানিক আলগা ছাড়িয়ে নিলাম নিজেকে ওই শব্দের জঞ্জাল থেকেও, অ্যাটলিস্ট আমার মনে হল যে আমি নিজেকে সরিয়ে নিতে পারলাম। তন্দ্রা ঘনিয়ে এল এসবের মধ্যেও। ভনিতা করে লাভ নেই, সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুমটা ভাঙ্গল সামান্য চেঁচামেচিতে। ঘুমভাঙা মানে ধড়ফড় করে ওঠা নয়, আস্তে চোখ দুটো খুলল মাত্র। কামরায় আলো আরও কিছু কমে যাওয়া ছাড়া নতুন কিছু দেখলাম না, শুধু কানে এল, "হটাও ইস্কো, শালা ঝুলা ঝুলাকে রখ্খা হ্যায়! টিকিট দিখাও, টিকিট... হেই তুম দিখাও, তুম দিখাও..." এরূপ শুনতে শুনতেই কালো কোটধারীরা দৃষ্টি গোচর হলেন। মাইরি বলছি, এতোটা আমি ভাবতে পারি নি। এর মধ্যে TTE আসবে, সত্যিই দেশটার কিছু হবে একদিন-না-একদিন। প্যান্টের পকেট থেকে মোবাইলটা এমন ভঙ্গিমায় বের করে আনলাম, সোনার কেল্লায় যেমন ট্রেনের মেঝেতে শুয়ে ফেলু মিত্তির তার বালিশের তলা থেকে কোল্ট .৩২ টা বের করেছিল। সেই কায়দায় রেল কোম্পানির পাঠানো এস এম এস টা বের করে রাখলাম। কিন্তু চেকারদের তো দৃষ্টিই নেই আমার দিকে। থাকবার কথাও নয়।
আবারও অভিনব এক মস্তাজ খোলা চোখের সামনে। অনেকটা এইরকম, আমি চেষ্টা করছি,
নিচের ঝুপ কালো চাপ চাপ মানুষের কুণ্ডলীগুলো সচকিত হয়ে উঠল। একই সীমিত অঙ্গনে কেমন সঞ্চরিত হতে লাগল, আর তার মাঝে ঠিক জায়গা করে আখাম্বা এসে দাঁড়ালেন দুই মূর্তিমান। তাদের দৃষ্টি, মনোযোগ সবই নিম্নগামী... "টিকিট টিকিট...টিকিট দিখাও...হেই সোতা কাহে...উঠ্ঠো টিকিট দিখাও..."

চেকারের পায়ের কাছে কিলবিল করছে আধা-ঘুমন্ত দেহগুলি। তার মধ্যে থেকে জোড়া তিনেক হাঁটু ভর করে জেগে উঠল গোটা তিনেক মাথা মাত্র। আমি দেখলাম বিস্রস্ত কাঁপা কাঁপা হাতগুলো কয়েকটা টিকিটের মতো কিছু তুলে ধরল, প্ল্যাটফর্ম কাউন্টার থেকে যে টিকিট পাওয়া যায়। মিড্ল বার্থে শুয়ে ঘুম ঘুম চোখে ওই আবছায়ায় বোঝা সম্ভব নয় ওতে কয়জনের টিকিট আছে, কোনো রিজার্ভেশন আছে কিনা আদৌ। আমার দেখার কথাও নয়। যাদের দেখার কথা তারা টিকিটগুলো হাতেও নিল না। যেহাতে পেন ধরা ছিল, ঐ পেনের পেছন দিকটা দিয়ে টিকিটগুলোকে দু'একবার খুঁচিয়ে কী বুঝল কে জানে (তিব্বত যাওয়ার বুকিং বোধ হয় টিকিট খুঁচিয়েই বুঝে যাওয়া যায়), তবে মনে হল ওই দলা পাকানো কাগজের টুকরোগুলোকে ছুঁতেও যেন ঘেন্না পাচ্ছে। দূর থেকেই সরু রিডিং চশমার ওপর দিয়ে তেরছা তাকিয়ে একবার চকিতে চোখ বুলিয়ে নিল স্তূপাকৃত দেহগুলোর ওপর...মাইরি বলছি, কি-বুঝল খোদাই জানে, দুজনেই এগিয়ে গেল কামরার আরও ভেতরে! শিল্পী জয়নাল আবেদিনের মন্বন্তরের ছবিগুলোর 'ফ্যান দাও ফ্যান দাও' ভঙ্গিমার রেপ্লিকার মতো টিকিট হাতে জেগে ওঠা মাথাকটা, নিমেষে আবার তলিয়ে গেল কেমন, যেমন উঠেছিল। আমি মোবাইল পকেটে পুরে পাশ ফিরে শুলাম।

আবার ঘুমের আশ্রয়ে ঢুকে পড়ার আগের মূহুর্তে মনে হল, কেমন হত যদি চেকারদ্বয়ের খানিক সময় নিতাম, ভুরু দুটো কুঁচকে জিজ্ঞাসা করতাম, 'হোয়াট ইস্ দিস্? দিস্ ইস্ নট ডান্! এটা একটা রিজার্ভড কম্পার্টমেন্টের অবস্থা? কেন অ্যালাও করছেন এসব? এভাবে কেন যাব আমরা যারা আগে থেকে নিয়ম মোতাবেক ন্যায্য মূল্য দিয়ে সিট রিজার্ভ করেছি? মেয়েরা তো বাথরুমে পর্যন্ত যেতে পারছে না! কিছু একটা করুন!' কি হতে পারত বলুন তো! বেশ খানিক ভাবলাম। তারপর মনে হল সমস্যা সমাধানে চেকারদ্বয় পরের স্টেশনে আমাদের তিনজনকেই হয়তো নামিয়ে দিত ট্রেন থেকে। ভেবে বেশ পুলকিত হলাম, আবার হাসলাম মনে মনে, আর ঘুমিয়ে পড়লাম।

ট্রেন ব্রহ্মপুরে রাইট টাইম সকাল সাড়ে নটা (৯-৩৫)। সকাল হওয়ার আগেই বিভিন্ন কারণে বহুবার-আরও ঘুম ভেঙেছিল। শেষ মেস আর ঘুমাবো না ঠিক করলাম এবং দিনের আলোতে আরও পরিষ্কার, আরও দগদগে হয়ে ওঠা কামরার মধ্যে থেকেও নেহাতই স্বাভাবিক আছি দেখাতে ব্যাগ থেকে ব্রাশ-পেস্ট বের করে গটগট করে বাথরুমের দিকে (যতটা গট্গট্ করা সম্ভবপর ছিল। হ্যামকটা দেখলাম খোলা হয়েছে)। বাথরুমের দোর গোড়াতেই আটকে গেলাম, ভেতরে লোক তো আছেই বাইরেও আমার আগে দু'জন। এদিকে অতোটা গট্গট্ করা মনে হয় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। শরীরের বায়োলজিক্যাল ক্লকটা এমন সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে যে নিজের বোকামিতে নিজেরই রাগ হচ্ছে। ঘুমিয়ে থাকলেই হত। ভেস্টিবিউল পেরিয়ে ওদিকের দরজা দুটোর সামনেও লাইন। এখন কতদূর এসেছি কে জানে, গাড়ি খানিক স্লো যাচ্ছে। এর মধ্যে অ্যালমুনিয়ামের বালতিতে দু'বোতল জল নিয়ে 'পানি পানি' করতে করতে ভেস্টিবিউল পেরিয়ে ঠেলা-ঠেলি করতে করতে ঠিক সামনেটায় এসে হাজির হল একজন। তক্ষুনি মাথায় খেলে গেল; একটা বোতল কিনে নিলাম (এর আগে কোনোদিন কিনিনি রেলের এই জলের বোতল)। পর পর দুটো টয়লেটই খালি হল কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ল আগের লোক। লাইনে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আরও একজন। লজ্জার মাথা খেয়ে বলেই ফেললাম, "দাদা, আমি যাব আপনার আগে?" (হিন্দি বোল-চাল মাতায় উটেচে)। ভাষা কোনো সমস্যা হয় না যদি তা মর্মোৎসারিত হয়। লোকটি আমায় আশ্বস্ত করল, "আরে হম্ তো কাল রাত সে ইহই পে বয়ঠে হুয়ে হ্যায়, হম্হে সভাস নহি যানা, আপলোগ যা রহে হো, ইসিকে খাতির খ্ড়া হু ইঁহা।" নিরুপায় হয়ে দুটির একটি দরজায় থাবড়া মেরে বসলাম। লোকটি আমায় বুদ্ধি দিল, "বাবুজি ইয়ে-য়ালা নহি, উধর-য়ালা আগে খুলেগা, ইয়ে-য়ালে মে লেডিস্ লোগ গয়া হুয়া হ্যায়।" ঠিকই তো আমিও তো দেখেছি। ভাবতে ভাবতেই দরজা খুলল। উফ্ফ্ফ্! যাত্রাপথে এতটা রোমাঞ্চও চাই নি।
#
গাড়ি স্লো যাচ্ছে। কিন্তু শেষ যখন সিডিউল মিলিয়েছিলাম তখনও পর্যন্ত পারফেক্ট অন-টাইম যাচ্ছিল। এখন সকাল পৌনে আট। আমার পেছনে লাইন আরও বেড়েছে। টয়লেটের সামনের এক চিলতে জায়গাটায় এখন কাল রাতের থেকেও বেশি চাপাচাপি। তবু ফুরফুরে লাগছে আমার। আর তখনই ধা করে চোখের সামনে আবার, "...কাল রাত সে ইহই পে বয়ঠে হুয়ে হ্যায়, হম্হে সভাস নহি যানা,

আপলোগ যা রহে হো, ইসিকে খাতির খ্‌ড়া হু ইঁহা।"
কেন?
এ কেমন সফর?
কেন সপ্তাহে শুধুমাত্র একটিদিন (সোমবার) চালানো হবে এই ট্রেনটিকে?
এবং আমরা (মানে আমরা সবাই), যাদের আর কোনো বিকল্প থাকবে না তারা, স্ত্রী-সন্তান নিয়ে মালগাড়ির থেকেও জঘন্য অবস্থায় 'জাস্ট লোড্' হয়ে যাত্রা করতে বাধ্য হব কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছানোর তাগিদে? দিনের পর দিন!
রাতের অন্ধকারে যে 'তার'গুলো কেটে রাখা সম্ভবপর হয়েছিল, সেগুলো দিনের আলোয় খামোখা জুড়ে যেতে চাইছে নাকি? মহা মুশকিল্!

এতো লম্বা জার্নি, পুরো ট্রেনে রিজার্ভেশন বলে কিছু নেই, শুধু টিকিট হয়ে রয়ে গেছে। হ্যাঁ, এসি বগি গুলোতেও একই অবস্থা। এ-লাইনে পোড়-খাওয়া দু'এক জনের সঙ্গে হাল্কা আলাপচারিতায় যা বুঝলাম, তিব্বত যাওয়ার এই থ্রিল-প্যাক্‌ড ট্রিপে ফি-হপ্তায় এই একই কিস্‌সা। চেন্নাইতে বন্যা পরিস্থিতি বলে নাকি ট্রেনে অন্যবারের তুলনায় ভিড় খানিক কম!
আসলে আমি যাকে সমস্যা ভাবছি, সেটাই আদপে সমাধান! আর কোনো উপায় নেই! আমি শুয়ে পড়লাম আমার নির্ধারিত বার্থে (যেন বার্থ রাইট রক্ষা করছি)। সকাল সাড়ে আটটা। ট্রেন দাঁড়িয়েছে অনামা একটা নেড়া স্টেশনে। আপার বার্থের সাথীরা চোখ টিপে পড়ে আছে। আমার পায়ের কাছে একটা সতেরো/আঠেরো বছরের ছেলে কোনো রকমে ডিঙি মেরে বসে আছে। দেখে খারাপ লাগছে, মনে হচ্ছে বলি, আয়, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়, কিন্তু বলতে পারছিনা। বরং এমন-মনে-হচ্ছে-কেন তাই ভেবে অবাক লাগছে!

এরা কেউ আমায় মিড্‌ল বার্থ নামিয়ে দিতে বলছে না। কারণটা সিম্পল, লোয়ার বার্থে আমাকে বসতে দেওয়ার মতো জায়গা নেই। আমি লোয়ারে তাকালাম (সরাসরি চাক্ষুষ করতে সংকোচ হচ্ছে। পর্দানসীন জেনানারা রয়েছে। ঠারে ঠোরে দেখছি।) প্রমাণ সাইজের থেকে সামান্য বড় একটি ফ্যামিলি। কম-বেশি সদস্য সংখ্যা পনেরো হবে। পুরুষ গোটা ছয়েক, কিশোর থেকে মাঝবয়সি, না না গোটা আটেক। চার/পাঁচ জন মহিলা, তরুণী বলা চলে। সবার বয়স কাছাকাছি মনে হল। এঁদের মধ্যে সকলেই হিজাবাবৃত নন, মাত্র দু'জন কালো বোরখা পড়ে আছেন তবে মুখে আবরণ রাখেন নি। আর গোটাতিনেক শিশু তাদের খিল খিল, হুটোপাটি ও চ্যাঁ-ভ্যাঁ সমেত। প্রাতরাশ চলছে নীচে। বেশ কিছু প্লাস্টিক বেরিয়েছে। তার মধ্যে থেকে বেরোল গোল চাক্‌তির মতো স্টিলের টিফিন বক্স। মোটা মোটা রুটি ও পরোটার মাঝামাঝি কিছু রাখা হল এক পাঁজা। হাতে হাতে বিলোনো হল তাসের মতো। সঙ্গে পেঁয়াজ-লঙ্কা। এক ঢাকনায় রাখা আছে আচার। কিসের আচার বুঝতে পারছি না। আর গোল টিফিন বক্স খুললে বেরোল চানাচুর।

লক্ষ্য করবেন শুধুমাত্র পরিবারের পুরুষেরা কাছাকাছি এসে বসে টিফিন করছে, আর আলোচনা করছে সিরিয়ায় আইসিস্‌রা আসলে ইহুদি, শুধু শুধু মুসলিমদের দোষ দেওয়া হচ্ছে (কোন্ একটা টিভি চ্যানেলে এটা বলেছে)।
মেয়েরা বাচ্চাদের বায়না আর দস্যিপনা সামলাচ্ছে কখনো আদরে – কখনো শাসনে আর নিজেদের মধ্যে কী-খানিক রসের কথা বলেই এ-ওর গায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে। প্রায় আধা ঘন্টা দাঁড়ানোর পর ট্রেন ছেড়েছে। ঠিক সময় মতো আর পৌঁছানো হল না ব্রহ্মপুর। সিডিউল দেখে লাভ নেই, কারণ কতদূর এসে গেছি কেউ বলতে পারছে না।

পুরুষদের খাওয়া শেষ। বাকি যা পড়ে রইল, আবার ঢুকে গেল সেই সেই প্লাস্টিক মোড়কে, তারপর দলপতি মতো দেখতে দাড়িওয়ালা লোকটা উঠে দাঁড়াল (বরাবর সাইড লোয়ারের লোভনীয় জায়গাটা দখল করে রেখেছে)। এমনকি ওই সাইড লোয়ার লাগোয়া প্লাগ পয়েন্টটাই শুধু ঠিক আছে, এই কামরার বাকি পয়েন্টগুলো সব অকেজো) লুঙ্গি থেকে চানাচুরের গুঁড়ো ঝাড়ল, আর তারপর খাবারের প্যাকেট গুলো আমিনা-না-রেহানা কার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "অব তুম লোগ খালো মিল-বাঁটকে।"
আসলে সমস্যা কিছু নেই, সমস্যা ভাবলেই সমস্যা। এসবই নানাবিধ কঠিন সমস্যার সুবিধাজনক সমাধান সূত্র।
#
ধরুন না, একশ শতাংশ যাত্রীর ত্রিশ শতাংশও যদি টিকিট কাটে ও বাকি সত্তর শতাংশ-র সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করে এভাবে চালিয়ে নেয়, তাহলে ভারতীয় রেলের কাছে এটাই সুন্দর সমাধান। যখনই ট্রেনে কোথাও যাই, রেল লাইনের দু'পাশে অনেকখানি জায়গা ছেড়ে, সাদা সাদা সিমেন্টের খুটি পোঁতা দেখি। রেলের জমি। ছোট বেলা থেকে দেখে আসছি। এখনও কলকাতা থেকে দুর্গাপুর মাত্র ১৭৫ কিমি রাস্তা সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস যায় প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টায়। টিকিটের দাম প্রায় নব্বই টাকা। রিজারভেশন ও সুপারফাস্ট ট্রেনের আলাদা চার্জ ধরে টিকিট ভাড়া একশ ছাড়িয়ে যায়। সামনে লাইন ক্লিয়ার না থাকলে কিন্তু আপনার ট্রেন লোকাল হয়ে যেতে পারে! আপনি কিন্তু সুপারফাস্টের জন্য দেওয়া ভাড়া ফেরৎ পাবেন না (সিনেমা হলে এসি খারাপ থাকলে যা হয় আরকি)। তবু ইংরেজ আমল থেকে লাইন সেই পাঁচটি। আর যদি ভাবেন সস্তায় যাবেন লোকালে। সারা দিন হাতে রাখুন।
#
বাবু মশায়রা, ধৈর্য হারাবেন না প্লিজ, এগুলো কোনোটাই সমস্যা নয়, সমস্যার সমাধান। আমাদের তো বুলেট ট্রেন থেকে ডিজিটাল ইন্ডিয়া থেকে ইন্‌ক্রেডিব্‌ল ভারতের পথে এগিয়ে যেতে হবে। তাই গোড়ার গলদগুলোর যেসব সুবিধাজনক সল্যুশন রাখা গেছে এতদিনে সেই লাইনেই গাড়ি চলুক আপাতত...
#
আপাতত আমরা আবার দাঁড়িয়ে পড়েছি আরো একটি আউট-অফ-সিলেবাস্ স্টেশনে। ধুত্তেরি! ঝাড়া-খাড়া দিয়ে উঠতে গিয়ে আপার বার্থে মাথাটা ঠুকে গেল। কপালটায় হাত বুলোতে বুলোতে আপার বার্থের নিচের দিকে পাটাটায় চোখ গেল। আমার চোখের ঠিক সামনেই ডটপেন দিয়ে হিন্দীতে একটা হালফিলের বিতর্কিত বাংলা সিনেমার নাম লেখা, 'গাঁন্ডু'! এবার খেয়াল করে বার্থ থেকে নেমে পড়লাম। উঠতে নামতে শত চেষ্টা করলেও এর-ওর গায় পা লেগে যাচ্ছে। লজ্জিত হয়ে পড়ছি, সরি বলছি, জাস্ট ভ্রূক্ষেপ করছে না কেউ। গায়ই মাখছে না, বুঝতেই পারছে না 'সরি' কেন বলছি। কামরার সরু দরজার গোড়ায় বসে আছে একজন, যাকে উঠতে হবে যেহেতু আমি প্ল্যাটফর্মে নামব। মোবাইলে কথা বলতে বলতে একদিকের পাছাটা তুলে এতটুকু জায়গা দিল যে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, আমি প্রয়োজন মতো জায়গা নিয়ে নামলাম। বসে থাকা ব্যক্তির মেঝেতে লোটাতে থাকা জামার প্রান্তভাগ আমার চটির তলায় মলিন হল, হাঁটুতে গুঁতো খেল, তবু আমি 'সরি' বলিনি এবার, বরং লোকটি কী-বলে সেটা দেখার জন্য তার দিকে ঘুরে তাকালাম। আমার দিকে তাকালোই না।

ফোনেই কথা বলে চলেছে আর গুট্‌খা চিবিয়ে চলেছে। আমার মুখের সামনেই 'ফচাৎ' শব্দে এক মুখ থুতু ফেলে নিজের মনেই কথা বলতে থাকল। সরি বলিনি তাকে, এক্সপেক্টই বা করি কীকরে! মুখ ঘুরিয়ে নিলাম।

যত লোক ভেতরে কামরায়, তত লোকই প্রায় প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে, জটলা করে বা একান্তে মোবাইলে। স্টেশনের নাম লেখা কোনও বোর্ড নেই ধারে কাছে। ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে আধা ঘন্টার ওপর। কী-ব্যাপার? ভাবছি এস-ফোরের দিকে যাব কিনা। এর মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিলে যেকোনও কামরায় উঠে তো আর নিজের জায়গায় ফিরতে পারব না। আর প্ল্যাটফর্মের ওপর দিয়ে যে যাব, পুরো ভিড়টাই ক্রমাগত থুতু ফেলে চলেছে। আমারও ঘেন্না-ফেন্না হাওয়া হয়ে গেছে। অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করতে থাকলাম, এমন একটা মুহূর্ত গেল না, যখন আমি কাউকে-না-কাউকে 'থুক্‌তে' দেখলাম না। হতদরিদ্র একটা মুলুক সারা দিনে কয়েক কোটি টাকার শুধু থুতু ফেলে। ট্রেনের টিকিট কাটে না, কিন্তু স্যামসুং-এর মোবাইল রাখে। বেকায়দায় ভেজা বেড়াল হয়ে থাকতে পারে, কায়দামতো পেলেই 'মোগাম্বো'।
#
সে যাক, তবে এই ঘিন ঘিনে কার্যকলাপটা আমায় আগেও ভাবিয়েছে। এত কেন থুতু ফেলা? এত থুতু আসেই বা কোত্থেকে? নিজের ক্ষেত্রে বলতে পারি, ঘুম থেকে ওঠার পর যদি কোনো কারণে দৈবাৎ দাঁত মাজতে-মুখ ধুতে দেরি হয় তবে অনবরত থুতু ফেলতে ইচ্ছা করে। মুখের ভেতরটা থেকে সমস্ত ভেতরটাই অস্বস্তিকর রকমের #ফিলিং নোংরা (এখানে একটা লাগসই ইমোজি দিতে হত)। আমার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি, বাইরে, রাস্তা-ঘাটে পড়ে থাকা আবর্জনা, দুর্গন্ধ, জঞ্জাল দেখলেও থুতু ফেলার তাগিদ জাগে না, অনেকেরই যেমন হয়, তবে নিজের মধ্যে জঞ্জাল থাকলেই ওরকমটা হয়। তাই আমার মতো করেই যদি ভাবি, এই যে গাদা গাদা পৌনপুণিকের মতো পৃথক চেহারাহীন মানুষগুলো, এরাও কি নিজেদের ভেতরের ময়লাই বিরামহীন উগরিয়ে চলেছে নিজেদেরই চারপাশে --- যন্ত্রের অভ্যাসে!

সত্যি বলছি, হাত অবশ হয়ে আসছে, এ-লেখা তো তারা কেউ পড়বে না! কোনও লেখাই তারা আদৌ পড়েছে কিনা কে-জানে! ছোটবেলার সাধারণ জ্ঞানের বইতেও তো লেখা ছিল, 'মলিন পোশাক বোঝায় তোমার অভাব, কিন্তু অপরিষ্কার পোশাক বোঝায় তোমার স্বভাব'। মলিন পোশাক যে কারোর গায়েই ছিল না এমনটা নয়, তবে চটকদার পোশাকের প্রদর্শনও ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু সর্বস্ব নোংরা, আদতেই নোংরা!
#
দুই কামরার ফাঁকে, বেশরমের মতো লুঙ্গি উঠিয়ে এক ষাটোর্ধ প্রৌঢ় বসে পড়ল উবু হয়ে, প্ল্যাটফর্মেই...আমি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে কামরার সিঁড়িতে পা ও হাতলে হাত রেখে নিজেকে ভেতরে নিয়ে ফেললাম কামরার। কানে এলো বিশ্রী ভাবে গয়ের তোলার শব্দ, আমি ব্রেনের তার কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। ফোন করলাম এস।ফোরে। মোবাইলের ব্যাটারির যা অবস্থা এই মুহূর্তে চার্জ না-দিলেই নয়। কিন্তু ওই একটাই পয়েন্ট, খালি পাওয়া যাচ্ছে না। মেনে নিতে হবে, কিচ্ছু করার নেই, এটাই আমার দেশ। আমি কাল রাতে ওদের আমার থেকে একরত্তি ছেড়ে দিই নি, আজ পেতে চাইব কোন্ মুখে?
#
জানা গেল, শ্রীকাকুলামে মালগাড়ি উল্টেছে কাল রাতে। একদিকের লাইন বন্ধ। আরেকদিকের লাইন ধরে একটা একটা করে গাড়ি ছাড়া হচ্ছে। ট্রেন এখন লোকাল ট্রেন। প্রতিটি স্টেশনে দাঁড়াবে অবশ্যই...আর তা কতক্ষণের জন্য দাঁড়াবে ড্রাইভারও জানে না। এখন ঘড়িতে সাড়ে নটা বেজে গেছে। হিসেব মতো আমাদের ব্রহ্মপুর পৌঁছে যাওয়ার কথা। হোটেল থেকে গাড়িও পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই ড্রাইভারের কাছ থেকে খোঁজ পাচ্ছি ব্রহ্মপুরেও মেল ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ। কথা প্রসঙ্গে ড্রাইভার জানতে চাইল আমরা কতদূর। ট্রেন আবার চলতে শুরু করেছে। প্ল্যাটফর্ম ছাড়ার পরেই ড্রাইভারকে কল্ করেছিলাম। পড়লাম ভারি ফ্যাসাদে। কেউই জানে না ব্রহ্মপুর আর কতদূর (কারও উৎসাহও নেই এ ব্যাপারে)। কোনোমতে একজনের থেকে (রেলের প্যান্ট্রিতে কাজ করে সম্ভবতঃ) জানতে পারলাম বালুগাঁও পেরোইনি এখনো। শিডিউল অনুযায়ী বালুগাঁও ব্রহ্মপুরের আগের স্টপ যেখানে ট্রেন পৌঁছানোর কথা ৮:২৩-এ। গতিক ভালো নয়। মোবাইল নিভু নিভু, তবু চার্জ দেওয়ার জায়গা পাচ্ছি না। দুটো পয়েন্ট সব সময় এন্‌গেজ। তাড়াতাড়ি ড্রাইভারের আর হোটেলের নাম্বার দুটো আরেকজনের ফোনেও সেভ্ করিয়ে নিলাম। মুখে মুখে আসন্ন ভোগান্তির খবর ছড়াল। দেখলাম আমাদের মতো যাদের আর ঘন্টা খানেকের জার্নি বাকি ছিল, তাদেরই ছটফটানি বেশি। ছোট বড় খানিক সবুজ খানিক পাথুরে টিলা, কোথাও দিঘি, কোথাও মাঠ, কোথাও ক্ষেত, কোথাও গ্রাম সহযোগে বাইরের প্রকৃতি মন-ভোলানো। তবু আর ভোলানো যাচ্ছে-না মন কিছুতেই। যারা প্রতিজ্ঞা করেছিল টং ছেড়ে নামবে না, তারাও অবস্থা বেগতিক দেখে, একে একে নেমে এসে টয়লেটে গেল। আমিও ভাবছি একবার এস-ফোরে ফোন করব...ঠিক তখনই স্লো হয়ে এলো গাড়ি, আরো একটা নেড়া স্টেশন, আবার অপেক্ষা শুরু। প্রতিবারই আগের বারের তুলনায় প্রতীক্ষার সময় বাড়ছে।
নেমে পড়লাম আবার।
নেমে পড়লাম সেই অন্য এক ভারতবর্ষের মাঝখানে। আমি যতই নিজেকে মনে মনে এই ভিড়ের মধ্যে স্থাপন করছি, ততই ভিড় আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমাকে বাধ্য করছে তাকে দূর থেকে দেখতে। হয়তো অন্যত্র আমিও এমনই কোনো ভিড়ের অংশমাত্র। আমিও সেখানে বাধ্য-বাধকতার জাতাকলে নির্নিমেষ পিষে এলাম ইঁহাতক! কিন্তু আপাতত স্থৈর্য হারিয়েছি। ফলতঃ তিল মাত্র বিচ্যুতিও তাল হয়ে মাথায় ভাঙ্গছে। অথচ ঘটমান বর্তমান কিন্তু অকল্পনীয় কিছু নয়। আর আমিও কোনো অবুঝ শিশু নই। ভিড়ের দিকে তাকাই, দিব্যি আছে সবাই। এমনকি সত্যিকারের শিশুরাও কি অবিচল!
#
(আমিই খামোখা মনে মনে আউড়ে যাই মাথা-মুন্ডু কি-সব!)
মনে হতে থাকে এই মানুষগুলোর রোজকার জীবন-চর্যা কতখানি নরকগ্রস্ত যে এরূপ ভোগান্তিময় কালক্ষেপণেও কত সাবলীল। এই ভারতবর্ষটা গাদাগাদি করে ভারতীয় রেলের সেকেন্ড ক্লাস স্লিপারের মেঝেতে, সিঁড়িতে, টয়লেটের সামনে বসে সফর করার মতো করে জিন্দেগি গুজরান করে চলেছে আবহমান পরম্পরায়!
#
কী অহেতুক রেগে যাই। ভিড় তোয়াক্কা না করে এস-ফোরের দিকে হাঁটতে থাকি। জটলা ছায়ার মতো সরে সরে রাস্তা দিতে থাকে। আমার আরও মনে হয়, এরা কেউ বেঁচে নেই। এদের মধ্যে দিয়ে কিছু ক্রাইসিস বেঁচে আছে শুধু। সেগুলো রাখা হয়েছে বাঁচিয়ে, যুগ যুগ ধরে খুব যত্ন করে।
দুইবেলা পেট ভরে দু'মুঠো সংসারের পেটে --- শুধু এইটুকু আয়োজনে দিন-রাত নাস্তানাবুদ বিশাল এক ভারতবর্ষের। আর কিচ্ছু ভাববে না। কিচ্ছু না।
না ক্রোধ, না জ্ঞান, না সাহস, না চিৎকার, আর না চেতনা। ভেন্টিলেশন পয়েন্টগুলো হল যৌনতা, কলহ, ভোট, মেগা-সিরিয়াল আর থুতু ফেলা --- নিছক শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়া সকল, এক অমোঘ অভ্যাস।
#
এস-ফোরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি অবসন্ন, খানিক চিন্তিত দুজনেই। কথা খুব একটা হচ্ছে না। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। প্ল্যাটফর্মের চাতাল থেকে ডানহাতে নামলেই জমি কিছুটা ঝোপ-ঝাড় ঘাড়ে করে সামান্যই খাঁড়াই হয়ে আবার চ্যাটালো। ঐ চ্যাটালো অংশেই পাতা আছে পিচ বাঁধানো মসৃণ হাইওয়ে। প্ল্যাটফর্ম থেকে ১০০/১৫০ মিটার হবে। শুনশান বলা চলে। রাস্তাটা পার হয়েই জমির এমন খামখেয়াল, সটান উঠে গেছে ওপর দিকে ওপাশের সীমানা আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়েছে! আমরা সচকিত হয়ে তাই দেখছি... ভারি মিষ্টি নরম সবুজ ঢাকা এক পাহাড়, কোলের কাছে পিচ-বাঁধানো রাস্তা নিয়ে বসে আছে। পাহাড়ের ছাতায় বিছানো আকাশের নীল যেন দ্রব হয়ে আছে, দিগন্তে পৌঁছনো গেলেই আজলা আজলা মিলতে পারে, তারপর খাও, গায় মাখো তোমার মর্জি, কিন্তু দিগন্তে পৌঁছাও আগে... দেখি!

চোখের সামনে দিয়ে দেশলাইয়ের বাক্সের মতো ধবধবে মারুতি চলে যায়, আমরা এ-ওর মুখ চাওয়া-চায়ি করি, 'তবে কি মালপত্র নিয়ে রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াব, যদি কোনও ব্যবস্থা করা যায়!' চিত্রার্পিত সিনারি এখন বক্ওয়াস্! ট্রেনের বিকট গম্ভীর হর্ন বেজে উঠল। মনে হল এর থেকে শ্রুতিমধুর আর কোনো নাদ ধ্বনিত হয়নি আজও ত্রিলোকে। এস-নাইনের দিকে ছুট লাগালাম। ছায়া-ভিড় চুম্বকের টানে আলপিনের মতো সেধিয়ে যাচ্ছে কামরায় কামরায়, আর যেতে যেতে আরো আরো স্পষ্ট করে দেগে দিয়ে যাচ্ছে স্টেশন চত্তর, 'মনে রেখো... আবার আসব... বিদায়... থুঃ থুঃ থুঃ...'

#

এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিট। বার কয়েক ফোনে কথা হয়ে গেছে ড্রাইভারের সঙ্গে। তিনি এখনও অপেক্ষায়, ব্রহ্মপুরে। এখন যে একফালি নিতান্ত স্টেশনমতো জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে আমাদের ওয়ান ফাইভ টু টু এইট, মজফ্ফরপুর - ইয়স্য়ন্থপুর এক্সপ্রেস, তার বাঁপাশের লাইন জুড়ে এক ধুম্সো মালগাড়ি এপাশটা আরো দমবন্ধ করে তুলেছে। ট্রেন থামা মাত্রই আমি নেমে এস।ফোরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। জানি হুট করে ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার কোনো চান্স নেই।

স্টেশনটির নাম ছত্রপুর। বন্ধুটির স্মার্ট ফোনে গুগ্ল ম্যাপ দেখিয়ে দিল এখান থেকে ব্রহ্মপুর দু'কিলোমিটার। এটা খুব একটা ভরসাযোগ্য তথ্য নয় তবে এটুকু ঠিক যে আর অল্পই দূরত্ব বাকি। বন্ধু আমার বুদ্ধি দিল, "ড্রাইভারকে বলে দেখি না..." তৎক্ষণাৎ ফোন এবং ড্রাইভার আশ্বাস দিলেন, "আপ লোগ স্টেশনকে বাহার টিকিট কাউন্টারকে সাম্নে ওয়েট কিজিয়ে, ম্যায় গাড়ি লেকে আতা হু।" মনে হল নাচি, এই ট্রেনটার ছাদে উঠে নাচি।

দুদ্দাড় বেগে কামরার ভেতর প্রবেশ করলাম। সেই সাইড লোয়ারের বেনাম বাদশাহ্ তাড়াতাড়ি আমায় চার্জার প্লাগপয়েন্ট খালি করে দিল। এখন আর প্রয়োজন নেই তার। তাকে হৃদয় থেকে শুক্রিয়া জানিয়ে, হুড়মুড় হুড়মুড় করে নেমে পড়লাম আমরা তিনজন প্ল্যাটফর্মে। ঘাড় ঘুরিয়ে না দেখেও দিব্যি বুঝতে পারলাম আরো দ্রুত গতিতে শূন্যস্থান পূরণ হয়ে গেল।

আমাদের তখন পায় কে! যেন 'এলো সময় রাজার মতো...'। চারমূর্তিতে প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষারত নিরুদ্দিষ্ট ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পথ করে চলেছি স্থির লক্ষ্যে, আর ভিড়ের প্রতিজোড়া চোখ তাকিয়ে আমাদের দিকে। আমরা যেন নিছক হোঁচট খেতে খেতে চলা একটা সফরকে পিছনে ফেলে রেখে বেরিয়ে আসছিলাম না শুধু, আমরা বেরিয়ে আসছিলাম ঘুষঘুষে এক অচলায়তন সিস্টেম ছিঁড়ে। সবচেয়ে আনন্দের হয়ে উঠেছিল এই অনুভূতি যে শুধু অসহায় সমর্পণ নয়, মুখের মতো জবাব আছে দেওয়ার মত। সবটা মেনে নিলুম না। সবটা মানিয়ে নিতে পারলাম না।

জানি, নেহাত বালখিল্য মনে হতে পারে, তবু... ... আসলে নিয়ত, সর্বথা আষ্টে-পৃষ্ঠে জর্জরিত থাকতে থাকতে, আর সিস্টেমের সামনে অসহায় থাকতে থাকতে, ওই নগন্যটুকু 'কুছ-পরোয়া-নেহি'ও আমাদের অনেক আলাদা করে দিল ভিড়ের থেকে। দৃশ্যতই আমাদের চারজনের মুখগুলো ঝলমল করছিল। হেঁটে চলেছিলাম, যেন পরাজিত সন্ত্রস্ত সেনাদের মধ্যে দিয়ে চলেছে চার গ্ল্যাডিয়েটর!

ওভার ব্রিজের ওপর থেকে ছত্রপুর স্টেশন সংলগ্ন অঞ্চল যা চোখে পড়ল, মন বলল, 'এখানেই থেকে যাও, আর কোথায় যাবে? কেনই বা যাবে?' এক নম্বর প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে সিঁড়িটা স্টেশনের বাইরের হাতায় নেমেছে। স্টেশন সংলগ্ন অনেক কিছু আছে। অটো স্ট্যান্ড, বজরংবলীর মন্দির, মাঝারি এক অশ্বত্থ গাছের তলায় বাঁধানো বেদীতে কোনো এক দেবা বা দেবীর থান, সরু নদীর মতো নাজুক বাঁক নেওয়া পিচের রাস্তা দিগন্তে মিলিয়ে যায়, তার পাশ ধরে গোটা কয়েক চা-পান-বিড়ি-এটা-ওটার দোকান এবং তার পরেও ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে এসব শুনে যদি ভেবে বসেন যে আমরা সেই তো আবার আরেক ঘিঞ্জির মধ্যে এসে পড়লাম, তাহলে এক্কেবারে বিচ্ছিরি মিস্টেক করে ফেলবেন। আমি কিছুটা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করছি। ধরে নিন ওভার ব্রিজের পর থেকে স্টেশনের বাইরেটা বেশ... বেশ ছড়ানো একটা মাঠ --- লালচে ধুলোর মাঠ। আর ওপরের ওই সমস্ত এটা-সেটা ছড়ানো ছিটানো, অনেকটা করে জায়গা নিয়ে নিয়ে, যে যার মতো ওই মাঠটির আনাচে কানাচে রয়েছে। কেউ কারও ঘাড়ের ওপর নেই। কোনও গাদাগাদি নেই, কোনও তাড়াহুড়া নেই। সার সার অটো কিন্তু কেউ এসে ঘ্যান ঘ্যান করতে থাকল না যে কোথায় যাবেন কোথায় যাবেন, কারণতো সবাই জানে, ওখান থেকে কোথাও তো আর যাওয়ার নেই।

একা বজরংবলীই দাঁড়িয়ে আছেন প্রায় দেড়তলা উঁচু। তাঁর উল্টো দিকে অশ্বত্থর শান-বাঁধানো বেদীতে পিঠের বোঝা নামিয়ে রাখলাম। দেখতে পাচ্ছি দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ির ফাঁক দিয়ে, ট্রেন তখনও ছাড়েনি। ওদিকে তাকিয়েই ক্লান্ত শরীরেও এমন টগবগানি স্ফুর্তি জাগল, মনে হল এই পাতলা ধুলোয় গড়াগড়ি খেয়েনি খানিক! জোর গলায় হাঁক পারলুম 'চা খাব'।

চা-খাওয়া হয়েছিল। আরও কিছু খেয়েছিলাম, মনে নেই। ছত্রপুর থেকে ট্রেন যখন আমাদের ফেলে আবার চলা শুরু করে 'তিব্বতের' পথে, আমরা সানন্দে টা-টা করতে থাকি। চুপচাপ জায়গাটার নিঝুম কয়েকটা মানুষ আমাদের দেখতে থাকে অপলক। অবাক হয় কিনা বোঝা যায় না। গাড়িও এসে গিয়েছিল আধাঘন্টার মধ্যে। তারপর তারিফ করার মতো চকচকে নিটোল নিগাড্ডা রাস্তা দিয়ে গাড়ি আমাদের নিয়ে চলল গোপালপুর-অন-সী।

(তারপর গোপালপুরের গল্প নতুন করে কী-আর বলব)

আমরা কিন্তু আবার গোপালপুর যাব। এবার আমাদের ট্রেন আর হয়তো ছত্রপুর নামের অজস্টেশনটায় থামবে না। আমরা কয়জন তবু বার বার খোঁজ নেব, 'ছত্রপুর কি পেরিয়ে গেল?' জানলা দিয়ে উদ্গ্রীব হয়ে দেখতে থাকব, খুঁজতে থাকব, দূর থেকে কোনো বীর হনুমান দেখা যায় কিনা, দাঁড়িয়ে আছে প্রায় দেড়তলা। কম্পার্টমেন্টের আর কেউ বুঝতেই পারবে না কেন এই কয়জন নেহাতই নিরালা এক চিলতে ভূমিখণ্ডের দিকে আঙুল তুলে পাগলের মতো চেঁচাচ্ছে, "ওই যে ছত্রপুর, ওই যে ছত্রপুর।"

আর যদি সেদিনও পাশের লাইনে আড়াল করে দাঁড়িয়ে থাকে মালগাড়ি...

#

এমন ভাবি-না-কেন, সেদিনও কোনও কারণে লাইন ক্লিয়ারের সিগনাল্ না পেয়ে আমাদের ট্রেনটা এসে ছত্রপুরে দাঁড়াল...

একশ শতাংশ ঠিক ধরেছেন, দোতলার সমান বজরংবলীর দিব্যি, আমরা আবার নেমে পড়ব হুড়মুড় হুড়মুড় করে। আবার ওই অশ্বত্থতলায় মালপত্র রেখে চায়ের অর্ডার দিতে যাব। জানিনা, চিৎকারও করতে পারি... আমাদের জীবনের যে কয়েকটা মুহূর্ত ওইখানটায় রেখে এসেছি, সেই সময়টুকুতে অনেকটা জীবন ধরা রইল। ছত্রপুর স্টেশন-চত্তর কোনো হলিডে ডেস্টিনেশন নয়। কেউ যাবেন না। আমরাও আর কোনওদিন যাব কিনা সন্দেহ। অথচ ভাবলেই ভালো লাগছে, ট্রেন থেমে রয়েছে ছত্রপুরে, আমরা নেমে পড়েছি, আর ড্রাইভারকে ফোন করে বলে দিচ্ছি, 'ছত্রপুর আ-যাইয়ে প্লিজ'!

কাঞ্চন সেনগুপ্তের ছেলেবেলা কেটেছে ইস্পাত নগরী দুর্গাপুরে। কর্মসূত্রে কলকাতায়। ২০০০ সাল থেকে বেসরকারি কনস্ট্রাকশন ফার্ম সিমপ্লেক্সের সঙ্গে যুক্ত। ভালো লাগে লেখালেখি, ছবি তোলা, বেড়ানো। আবার কখনওবা সময় কেটে যায় ছবি আঁকায় বা টুকিটাকি হাতের কাজে।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনি - হিমালয়ের ডায়েরি (নবম পর্ব)

আগের পর্ব - যমুনোত্রীর পথে - গোমুখ থেকে উত্তরকাশী

# পথের শেষে যমুনোত্রীতে

## সুবীর কুমার রায়

পূর্বপ্রকাশিতের পর -

মাধবকে জলখাবার ও সঙ্গে নেওয়ার জন্য কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে বলে, আমি ও দিলীপ, ট্রাভেলার্স লজে লাগেজ ছাড়াতে গেলাম। যাওয়ার পথে দেখা সেই অফিসার ভদ্রলোককে এখন আর দেখলাম না। যে কর্মচারীটি আমাদের মালপত্র রেখেছিল, একটু পরেই তার খোঁজ পাওয়া গেল। আমাদের দুটো হোল্ড-অল ও তিনটে স্যুটকেস আছে। যাওয়ার সময় শুনেছিলাম পার লাগেজ পার ডে একটাকা ভাড়া। সেই হিসাবে অনেক টাকাই ভাড়া নেওয়া উচিত। কিন্তু কর্মচারীটি আমাদের কাছ থেকে দশ টাকা ভাড়া চাইলো। ভাড়া মিটিয়ে বাইরে এলাম। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, যমুনোত্রী যেতে হলে হয় "ধরাসু" যেতে হবে, আর তা নাহলে "বারকোট" যেতে হবে। এই দুই জায়গা থেকেই সরাসরি সায়নাচট্টি যাবার বাস পাওয়া যাবে। এও জানা গেল যে, ওই দুটো জায়গার মধ্যে বারকোট বেশ বড় জায়গা। কাজেই আমরা বারকোট যাব স্থির করে, কাউন্টার থেকে তিনটে বারকোটের টিকিট কাটলাম। তিনটে টিকিটের ভাড়া লাগল, পঁচিশ টাকা আশি পয়সা। বাসের ছাদে মালপত্র গুছিয়ে রেখে, আসন দখল করে বসলাম। পছন্দ মতো সামনের দিকে ড্রাইভারের ঠিক পিছনে, বাঁদিকে আমরা তিনটে আসন দখল করলাম। এবার বাস থেকে নেমে, পাঁউরুটি, কলা ও ডিম সিদ্ধ খেয়ে, একটা ওয়াটার বটল্ কিনে তাতে জল ভরে, জল খেয়ে, বাসে এসে বসলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে বাস ছেড়ে দিল। মনে বেশ আনন্দ, শেষ পর্যায় প্রায় উপস্থিত। এখানে পৌঁছতে পারলে, এ পথের সমস্ত দর্শনীয় স্থান আমাদের দেখা হয়ে যাবে। আঁকাবাঁকা রাস্তা পার হয়ে, একসময় আমরা আবার সেই ধরাসু এসে পৌঁছলাম। আসলে ধরাসু হচ্ছে একটা জংশন। এখান থেকে একটু এগিয়েই রাস্তা দুভাগ হয়ে যাচ্ছে। একটা যাচ্ছে উত্তরকাশী হয়ে গঙ্গোত্রী, অপরটা যমুনোত্রী। এখন আমাদের ধরাসু যাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। বোধহয় আরও কিছু যাত্রীর আশায়, বাস ধরাসু গিয়ে অহেতুক অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল।

ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ হল। ভদ্রলোকের খুব সুন্দর ব্যবহার। দেখতে অনেকটা আমার অফিসের আর্মড-গার্ড, কল্যাণ সাহার মতো। আমরা নিজেদের মধ্যে তাঁকে নিয়ে কথা বলার সময়, তাঁকে কল্যাণদা বলে উল্লেখ করতে শুরু করলাম। এখানে একটা বড় হোটেল আছে। আমরা সেখানে সামান্য কিছু খেয়ে নিলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে, কল্যাণদা বাসটা অনেকটা পথ এগিয়ে নিয়ে গেলেন, বাসের মুখ ঘুরিয়ে আনার জন্য। অর্থাৎ যেদিক থেকে এসেছি, বাস আবার সেই দিকেই বেশ কিছুটা এগিয়ে, বাঁদিকে বারকোটের উদ্দেশ্যে বাঁক নেবে। আমরা দোকানেই বসে ছিলাম। বাস ঘুরিয়ে আনলে, বাসে উঠে বসলাম। সুন্দর রাস্তা, সুন্দর আবহাওয়া, মনটাও বেশ ভাল আছে। আমাদের ঠিক সামনে, বাসের সব থেকে সামনে, ড্রাইভারের আসনের বাঁপাশের সিঙ্গল সিটটা একজন যুবক দখল করে বসেছে। হাতে ম্যাগাজিন, চোখে রোদ চশমা। বাস যখন বেশ কিছুটা এগিয়েছে, যুবকটি ঘুমতে শুরু করল। আমরা ভাবছি ড্রাইভার হয়তো রেগে গিয়ে দুটো কটু কথা শোনাবেন। ওই সিটে বসে ঘুমনো নিষেধ। আমরা যে সিটে বসে আছি, এবং আমাদের ঠিক ডানপাশের সিটটাও, ওই একই নিয়মের অন্তর্ভুক্ত। যাত্রীটি খুব সম্ভবত এইসব অঞ্চলেরই বাসিন্দা, হয়ত উত্তরকাশীরই। ড্রাইভার ভদ্রলোক ঘন ঘন সিগারেট খান। তিনি পকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে, যুবকটিকে দিলেন। যুবকটি খুব লজ্জা পেয়ে একটু হেসে, হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা নিল।

এই রাস্তাটার দেখছি একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে রাস্তা খুব সুন্দর এবং একভাবে ওপর দিকে উঠেছে। এখনও পর্যন্ত রাস্তা কখনও নীচের দিকে নামেনি। একভাবে ওপরে উঠতে হচ্ছে বলেই বোধহয়, বাসের ইঞ্জিন থেকে একটা বিশ্রি আওয়াজ হচ্ছে। আবার সেই পুরাতন ভয়টা, মাথা চাড়া দিয়ে উঠল - বাস আবার না খারাপ হয়, আবার না বলে বসে, বাস আজ আর যাবে না। এ পথের সৌন্দর্য বেশ ভাল। রাস্তা থেকে অনেক নীচের জমিকে, খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। দুপাশে বড় বড় পাইন জাতীয় গাছ। আর এইসব গাছ থেকেই আসছে একভাবে সেই পোকার ডাক। কখনও বিরাম নেই। পরে দেখলাম এটা কোনও পোকার ডাক নয়। ধূসর রঙের বেশ বড় আকারের গঙ্গা ফড়িং জাতীয় এক রকম পোকা, নীচের দিকে মুখ করে পিছন দিকটা ওপরের দিকে উঁচু করে, একভাবে দ্রুত পাখা নেড়ে চলেছে। আর তার আওয়াজেই কানে তালা লাগিয়ে দেবার মতো অবস্থা। একসাথে প্রচুর ওই জাতীয় পোকা, বিভিন্ন গাছের ডালে বসে সব কাজ ফেলে, সারাদিন একভাবে পাখা নেড়ে চলেছে। এতে যে কী সুখ ওরা পাচ্ছে ওরাই জানে!

বাস একভাবে ওপর দিকে উঠছিল। আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই বোধহয়, এইবার শুরু হল নীচে নামার পালা। একভাবে এঁকেবেঁকে, বাস নীচে নামতে শুরু করেছে। অনেকটা পথ পার হয়ে আসার পর দেখলাম, একটা গাছ কিভাবে ভেঙে রাস্তার ডান দিক থেকে বাঁদিকে, রাস্তা বন্ধ করে শুয়ে আছে। গাছটা এত প্রকাণ্ড আকারের, যে ওটাকে ঠেলে সরিয়ে একপাশে রেখে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। কল্যাণদা ও কন্ডাক্টার বাস থেকে নেমে ব্যাপারটা উপলব্ধি করে, সবাইকে বাস থেকে নেমে আসতে বললেন। একে একে বাসের প্রায় সকল পুরুষ যাত্রী বাস থেকে নেমে হাত লাগালো। শেষে অনেক চেষ্টার পর, গাছটা একপাশে সরে গিয়ে, আমাদের যাওয়ার অনুমতি দিল। আবার এগিয়ে চললাম। দুপাশের সারিবদ্ধ গাছে রাস্তা ছায়ায় ঢাকা। রাস্তার পাশে মাইলস্টোনগুলো ক্রমশঃ বারকোটের নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ জানাচ্ছে। বারকোট পৌঁছতে যখন আর মাত্র দশ-বার কিলোমিটার পথ বাকি, বাস দেহ রাখল। এই মুহূর্তে নিজেকে বড় অসহায়, বড় দূর্বল মনে হচ্ছে। আবার সেই অশান্তি। কিন্তু দক্ষ বাস ড্রাইভার ও কন্ডাক্টারের যৌথ প্রচেষ্টায়, বাসের ইঞ্জিন প্রাণ ফিরে পেল। কন্ডাক্টার রাস্তার পাশের ঝরনার জল টিনে করে এনে, বাসের ইঞ্জিনের সামনে ছেটাতে শুরু করলো। বাস থেকে অস্বাভাবিক রকমের ধোঁয়া বার হচ্ছে। বোধহয় ইঞ্জিন কোন কারণে খুব গরম হয়ে গেছে। এবার যদিও বাস ছাড়ল, ভয় কিন্তু গেল না। একটা বিশ্রি রকমের আওয়াজ করতে করতে, খুব ধীর গতিতে বাস এগিয়ে চলেছে। বেশ কিছুক্ষণ অন্তর একটা করে মাইলস্টোন অতিক্রম করছে, আর আমরা অস্থির মন নিয়ে মনে মনে ভাগ্য বিধাতার দয়া ভিক্ষা করছি - আর কয়েকটা মাইলস্টোন এগিয়ে নিয়ে চলো। আসলে ভয়টা বেশি পাওয়ার একটাই কারণ,আমাদের সঙ্গে এখন সমস্ত লাগেজ আছে। তা নাহলে এই সামান্য কয়েক কিলোমিটার রাস্তা, তাও আবার পাকা বাস রাস্তা, আমাদের কাছে কোনও ব্যাপার নয়। অন্তত এখন তো নয়ই। ডানপাশে একটা রাস্তাকে ফেলে, আমরা বেশ কিছুটা নীচে বারকোট এসে পৌঁছলাম।

বাস থেকে মালপত্র নামিয়ে ভরদুপুরে একপাশে দাঁড়ালাম। কতদিন স্নান করিনি, অসহ্য লাগছে। খিদেও বেশ ভালোই পেয়েছে। পাশেই রাওত হোটেল। তিনতলা বাড়ি, এরই একটা অংশে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ্ ইন্ডিয়ার শাখা। হোটেলে ঢুকে বাসের খবর নিয়ে জানা গেল, সাড়ে তিনটে-চারটে নাগাদ, হৃষিকেশ থেকে বাস আসবে। হৃষিকেশ থেকে বাস ধরাসু হয়ে সায়নাচট্টির পথ ডানপাশে ফেলে বারকোট আসবে। তারপর আবার ব্যাক করে বাঁহাতে সায়নাচট্টির

ফেলে আসা পথ ধরবে। এই সায়নাচট্টি থেকেই যমুনোত্রী যাবার হাঁটা পথের শুরু। এখানে আরও একটা সুসংবাদ পাওয়া গেল ভাল চালের গরম ভাত ও মাংস পাওয়া যাবে। পাশেই একটা টেবিলে দেখলাম, একজন তুষার শুভ্র লম্বা লম্বা ভাত নিয়ে খাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এতদিনের অতৃপ্ত ক্ষুধা চাঙ্গা হয়ে পেটের ভিতর লাফ ঝাঁপ করে বিদ্রোহ শুরু করে দিল। সময় নষ্ট না করে,তিন প্লেট মাংস আর ভাত দিতে বললাম। মাংস পাঁচ টাকা প্লেট, হোটেল কাউন্টারে বসা লোকটা জিজ্ঞাসা করল, মাংস কী হাফ্-হাফ্-হাফ্? অর্থাৎ হাফ্ প্লেট করে তিনজনকে দেবে কী না? এখানে বোধহয় এত দাম দিয়ে, ফুল প্লেট করে মাংস সচরাচর কেউ খায় না,বা খাওয়ার খুব একটা চল্ নেই। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের গুলিয়ে ফেললে চলবে কেন? আমরা পাঁচ টাকা প্লেটে খাসির খাদ্যনালী খাওয়া পাবলিক। ভাল মাংস দিলে আজ দশ টাকা প্লেট হলেও, ফুল প্লেটই খাব। আধ প্লেটে মন ভরবে কেন? বললাম, 'না, ফুল্-ফুল্-ফুল্, একটু দেখে দেবেন'। এবার দোকানদারও খুশি, আমরাও খুশি। তার হাবভাব দেখে মনে হল, সে বোধহয় আমাদের টাটা-বিড়লা জাতীয় কেউকেটা বলে মনে করছে। যাহোক খাবার এল। রান্না কেমন হয়েছে এই মুহূর্তে বর্ণনা করে সময় নষ্ট করতে পারব না, তবে মনে হচ্ছে জীবনে এত সুস্বাদু খাদ্য কখনও কোথাও খাইনি।

হোটেলের বাইরে মালপত্র ও লাঠি সাজিয়ে রাখা আছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আশেপাশে ইতস্তত ঘুরে ফিরে, আর হোটেলে বসে বসে, একসময় বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে এল, এল না আমাদের বাস। এবার অস্থির হয়ে উঠলাম। হোটেল মালিক কিন্তু এখনও একই সুরে বলে যাচ্ছে, "বাস আসবে। এখান থেকে সায়না চট্টি সামান্যই পথ, তাই সন্ধ্যা হলেও বাস ওখানে যাবে"। বাস কিন্তু আসবে সেই হৃষিকেশ থেকে। হঠাৎ মনে হল, বাসটা আমাদের আগের সব বাসের মতো রাস্তায় কোন কারণে আটকে পড়েনি তো? হোটেলের পাশেই বাঁহাতে একটা গুমটি ঘর। ওখান থেকেই বাসের টিকিট বিক্রি হয়। ওখানে গিয়ে বাসের খবর জিজ্ঞাসা করাতে, ওরাও বেশ জোরের সঙ্গেই জানালো বাস আসবে। সামনে বাঁপাশের রাস্তা ক্রমশঃ এঁকেবেঁকে ওপরে উঠেছে। ওই দিক থেকেই আমরা এখানে এসেছি। ওই দিক থেকেই এখন বাস আসবার কথা, আবার সেই বাসে আমরা ওই দিকেই যাব। যতদূর লক্ষ্য করা যায়, কোনও বাস আসতে দেখা যাচ্ছে কী না নজর রাখছি। নাহ, বাস এল না, তার পরিবর্তে রাত এসে হাজির হল। সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমশঃ ঘন হতে হতে রাত্রির রূপ নিল। আশা ছেড়ে দিয়ে হোটেলে একটা ঘর নেওয়াই মনস্থ করলাম। রাওত হোটেল আমাদের তিনতলায়, ঠিক বাস রাস্তার ওপরে একটা ঘর দিল। খাটে বসে বড় জানালা দিয়ে ঠিক নীচে অসংখ্য লোকের যাতায়াত, ট্রাকের যাওয়া আসা ইত্যাদি লক্ষ্য করতে করতে সময় কেটে যাবে, এটাই সান্ত্বনা।

বিকেল প্রায় চারটে নাগাদ, একটা লোক সাইকেল নিয়ে বিড়ি বিক্রি করতে, আমাদের হোটেলের ঠিক নীচে, বাস রাস্তার ওপর এসেছিল। লোকটার একটা হাত কাটা। সাইকেলের কেরিয়ারে একটা বেশ বড় টিনের বাক্স লাগানো। ওই বাক্সে অসংখ্য বিড়ি। সামনে অদ্ভুত ভাবে একটা রেকর্ড প্লেয়ার লাগানো। সাইকেল দাঁড় করিয়ে, লোকটা তার ছোট্ট মাউথপিসটার মাধ্যমে, সামনের ছোট মাইকটায়, বিড়ির গুণগান গেয়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিল, আর মাঝেমাঝে বিজ্ঞাপন বন্ধ করে, "নাগিন"-এর একটা লং প্লেয়িং রেকর্ড বাজাচ্ছিল। এই অবস্থাতেও এত দূরের হোটেলের ঘরে বসে, আমাদের ঘরের হেমন্ত মুখার্জীর কণ্ঠস্বরে, এই মুহূর্তে নিজের শহরের স্বাদ, গন্ধ অনুভব করছি। রাত আরও বাড়তে, লোকটা তার সাইকেলে, সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। এতক্ষণ লোকটাকে ঘিরে রাখা লোকের ভিড় পাতলা হয়ে গেল। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, এত লোকের ভিড়েও, তার বিড়ি বিক্রির পরিমাণ কিন্তু অতি সামান্য। নাঃ, বাস আজ আর এল না। সেপ্টেম্বরের দুই তারিখ কেটে গেল। এতদিনে খুব ভাল করে সাবান শ্যাম্পু মেখে, তিনজনে পর পর অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম।

হাতে অনেক সময় পেয়ে, নতুন করে মালপত্র গোছাবার জন্য স্যুটকেস খুললাম। আমার স্যুটকেসে জামাকাপড় ছাড়া, হেমকুণ্ড থেকে পলিথিন ব্যাগে বয়ে নিয়ে আসা একগাদা ব্রহ্মকমল ছিল। ফুলগুলো গাছ থেকে তুলে পলিথিন ব্যাগে পুরে স্যুটকেসে নেবার পর থেকে, পনের দিন পরে এই প্রথম স্যুটকেস খোলা হল। এগুলো নিয়ে আসার সময় এক ভদ্রলোকের হাতে ব্লটিং পেপার দেখে, এবং তার কাছে, ব্লটিং পেপার দিয়ে মুড়ে ফুল নিলে অনেক দিন ভাল ও টাটকা থাকে শুনে, সবজান্তা বিজ্ঞের মতো তাকে বলেছিলাম, "মৌয়া গাছের মিষ্টি ছায়া 'ব্লটিং' দিয়ে শুষে, ধুয়ে মুছে সাবধানেতে রাখছি ঘরে পুষে" গোছের ব্যাপার বলছেন? এখন বুঝতে পারছি, অত সহজে এই মূল্যবান ফুল নিয়ে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়। স্যুটকেসটা খুলতেই, একটা তীব্র পচা গন্ধে ঘর ভরে গেল। স্যুটকেসের নীচের দিকটা কালো জলে ভিজে গেছে। পলিথিন ব্যাগটা বেশ খানিকটা ফেটে গেছে। ফেটে না বলে, গলে গেছে বলাই বোধহয় ঠিক হবে। বোধহয় পচে অ্যাসিড ফর্ম করেই এটা হয়েছে। ছেঁড়া পলিথিন ব্যাগের ভিতর ফুলগুলো, পচে গলে কালো জলীয় পদার্থে পরিণত হয়েছে। আর স্যুটকেসের তলার অংশটা পুরো ভিজে এবং কালো রঙের দেখতে হয়ে গেছে। সমস্ত পচা ফুলসমেত পলিথিন ব্যাগটা ফেলে দিতে হল। স্যুটকেসটাও ফেলে দিতে পারলেই বোধহয় ভাল হয়, কিন্তু এখন মাঝপথে তা সম্ভব নয়। ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে অনেকবার ভাল করে মুছেও, স্যুটকেসটা পরিষ্কার করা গেল না। পচা গন্ধটা সামান্য কমলো বলে মনে হয়। শেষে নীচে গিয়ে একটা দামী ভাল পাউডার কিনে এনে, নিজের গায়ে না মেখে, পরম স্নেহে আদরের স্যুটকেসকে অর্ধেক মাখিয়ে, কাগজ পেতে ওটাকে মোটামুটি ব্যবহারযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হলাম। ফুলগুলো নিয়ে যেতে পারলাম না বলে খারাপও লাগছিল। অফিসের একজন আমাকে বার বার করে একটা ব্রহ্মকমল, তার জন্য কষ্ট করে নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছিল। ইচ্ছা থাকলেও, তাকে আর তার আকাঙ্খিত জিনিস এনে দিতে পারলাম না।

একটু রাত করেই একতলায় হোটেলে খেতে নামলাম। আমার আজ রাতেও আবার সেই সকালের খাবার খাওয়ার খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বন্ধুরা একই দিনে দুবার মাংস খেতে ভয় পেল। আমি জানি না রোজ রোজ পচা আলুর তরকারি, কাঁচা রুটি আর ঝুড়িভাজা খেলে যদি কোন ক্ষতি না হয়, তবে একদিনে দুবার মাংস ভাত খেলে, কতটা ক্ষতি বৃদ্ধি হতে পারে। তবু তাদের ইচ্ছায়, ডিমের ঝোল ভাত খেতে রাজি হতে হল। তবে হোটেল মালিক বোধহয় সব খদ্দেরের মন জুগিয়ে ব্যালান্সড্ করে চলেন। ডিমের ঝোলটা ভালই খেতে হয়েছে। তবে ডিমের ঝোলের ভিতর থেকে ছোট সাইজ হলেও, এক টুকরো মাংস উদ্ধার হওয়ায়, রাতের খাবারটাও আমার ভালই জমল। বেশ বুঝতে পারছি, এটা ওবেলার মাংসের ঝোলে ডিম সিদ্ধ করে মিশিয়ে দিয়ে, ডিমের ঝোল হয়েছে। তা হোক, ভদ্রলোককে বেশ সৎই বলতে হবে। ডিমের ঝোলে মাংসের টুকরো দিয়েছেন, মাংসের ঝোলে ডিমের টুকরো দেননি, এবং খেতেও বেশ উপাদেয় হয়েছে। যাহোক্, কিছুক্ষণ বাস রাস্তায় পায়চারি করে, তিন তলায় নিজেদের ঘরে ফিরে এলাম। ওপরে উঠবার সময় হোটেল মালিক আশ্বাস দিলেন আগামীকাল বাস পাওয়া যাবেই। মনে মনে, তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বলে, ওপরে উঠে এলাম। গল্পগুজব করে অনেকক্ষণ কাটলো। আবার আমার সঙ্গীদের মধ্যে ফিরে যাবার পুরনো ঝোঁকটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। মাধবের বক্তব্য, এখানে খরচের পরিমাণ অনেক বেশি। তাই আগামীকাল আমাদের ফিরে যাওয়াই উচিৎ। আমি বললাম, কাল নিশ্চয়ই বাস পাওয়া যাবে। আর বাস না পাওয়া গেলেও, জীপ বা অন্য কিছুর একটা ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা যাবে। তাছাড়া খরচ তো আমাদের হাতে। ডাল ভাত খেলেই খরচ কমে যাবে। অবশ্য ঘর ভাড়া প্রতিদিন পনের টাকা করে লাগবেই। ওদের অবস্থা দেখে ভয় হল, কাল বাস না এলে, যমুনোত্রী যাওয়ার আশা শেষ। ঘরের বাঁপাশের জানালা দিয়ে দূরে, অনেক দূরে, মিটমিট্ করে অনেক আলো জ্বলছে। আমাদের ধারণা, ওখানেই হয়তো যমুনোত্রী। ঘরটায় মাত্র দুটো খাট। একটায় দিলীপ, অপরটায় আমি আর মাধব শুয়ে পড়লাম। মশার উপদ্রব উপেক্ষা করে, একসময় ঘুমিয়েও পড়লাম।

আজ সেপ্টেম্বর মাসের তিন তারিখ। বেশ ভোরে ঘুম থেকে উঠে, মুখ ধুয়ে বেরোনোর জন্য তৈরি হয়ে নীচে নেমে এলাম। হোটেল মালিক বললেন, গতকাল নিশ্চয়ই রাস্তায় কোথাও ধ্বসে বাস আটকে গিয়েছিল। চিন্তা করবেন না, আজ অবশ্যই বাস এসে যাবে। জিজ্ঞাসা করলাম, বাসের কোনও খবর পাওয়া গেছে কিনা। ওদের কথাবার্তায় মনে হল, এখানে বাসের খবর ওভাবে রাখা হয় না, হয়তো রাখাও যায় না। আশ্চর্য, এই বিপজ্জনক রাস্তায়, অতগুলো প্যাসেঞ্জার নিয়ে, বাসটা কেন এল না, রাস্তায় খাদে তলিয়ে গেল কিনা, জানার ইচ্ছা বা দায়িত্ব কারোর নেই। জানার উপায়ও বোধহয় নেই। অনেকক্ষণ রাস্তায় অপেক্ষা করে, আবার হোটেলে ফিরে এলাম। আমার দুজন সঙ্গী যেন বুঝে ফেলেছে যে, আজও আমাদের নিতে কোন বাস আসবে না। এবার খুব নার্ভাস ফিল করতে লাগলাম। বাঁদিকের জানলা দিয়ে কোন গাড়ির আওয়াজ আসলেই, বাসের আশায় সেদিকে তাকাই। কিন্তু হয় ট্রাক, নাহয় জীপ আসে। বাসও কয়েকটা পরপর এল বটে, তবে সেগুলো সায়নাচট্টি যাবে না। রাওত হোটেলকে ডানপাশে রেখে, সোজা এগিয়ে যাবে। শুয়ে বসে আর সময় কাটে না। বাসও আসে না। বোর্ণভিটা আর আমসত্ত্ব ধ্বংস হতে লাগল। এগুলো আর সংরক্ষণ করার প্রয়োজন নেই। একসময় স্নান সেরে একতলায় খেতে গেলাম। মানসিক কষ্ট, সময় সময় শারীরিক কষ্টের থেকেও কষ্টকর হয়, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। কিছু না খেয়ে, সারাদিন পরিশ্রম করে, পিসু ভর্তি নোংরা বিছানায় শুয়ে, আমরা যে কষ্ট ভোগ করেছিলাম, এখন ভাল হোটেলে থেকে, ভাল খাবার খেয়ে, ভাল বিছানায় শুয়ে, তার থেকে অনেক বেশি যন্ত্রণা ভোগ করছি, সামান্য একটা বাসের অনুপস্থিতির জন্য। খাওয়া দাওয়া সেরে, আবার নিজেদের ঘরে বসে, ফিরে যাওয়া না যাওয়া, ইত্যাদি আলোচনায় বারটা, একটা, দুটো, ক্রমে বিকেল তিনটে বাজল, বাস কিন্তু এল না। মাধব বেশ অধৈর্য হয়ে পড়ছে। শেষে বাস আসার আশা ছেড়ে, গতকালের সেই বিড়িওয়ালার আসার অপেক্ষায় রইলাম। অন্তত তার সেই রেকর্ডের গান শুনে অনেকটা সময় কাটবে। গতকাল শুনেছিলাম, বিকেল সাড়ে তিনটে-চারটে নাগাদ বাস আসে। আমি ভাবছি আর ঘন্টা খানেকের মধ্যে যদি বাস না আসে, তবে এদের সঙ্গে ফিরে যাবার যুদ্ধে, আর হয়তো নিজেকে জিতিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। বিড়িওয়ালা তার গানের ডালি, বিড়ির ঝুলি নিয়ে, সময় মতো এসে হাজির হল। গানের না বিড়ির আকর্ষণে জানিনা, লোকের ভিড়ও বাড়ল। আমরা নীচে নেমে এলাম।

হোটেলের বাঁপাশে বাসের টিকিট কাউন্টার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চা খেয়ে মাধব ওপরে চলে গেল। একটু দুরে রাস্তায় একটা জীপ দাঁড়িয়ে আছে। অনেকেই ওতে করে সায়নাচট্টি যাবার চেষ্টা করছে। মাথাপিছু দশ টাকা ভাড়া। আমি ও দিলীপ ঠিক করলাম, হোটেলে থাকতেও তো অনেক খরচ হচ্ছে,

কাজেই জীপেই চলে যাব। জীপের কাছে যখন পৌঁছলাম, তখন অনেক পুরুষ ও মহিলা আসন দখল করে নিয়েছে। ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বললাম। সে রাজিও হল, কিন্তু আমাদের অত মালপত্র, জীপে নিয়ে যেতে রাজি হল না। রাজি হল না, কারণ খদ্দেরের অভাব নেই। রাস্তার একপাশে কাল যে বাসটায় আমরা এসেছিলাম, দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের জীপ ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে, ও কী করব ঠিক করতে করতেই, জীপটা লোক ভর্তি করে নাকের ডগা দিয়ে চলে যেতে, যমুনোত্রী যাবার শেষ আলোও নিভে গেল। আগের দিনের বাস ড্রাইভার, কল্যাণদার সঙ্গে বাস কর্তৃপক্ষের বেশ উত্তেজক আলোচনা হচ্ছে শুনলাম। কল্যাণদার বক্তব্য, দুদিন ধরে এত লোক আটকা পড়ে আছে, তার বাস তো আজ আর কোথাও যাবে না, কাজেই সে বাস নিয়ে সমস্ত প্যাসেঞ্জারকে সায়নাচট্টি পৌঁছে দিতে চায়। কর্তৃপক্ষের তাতে ভীষণ আপত্তি। আমরা মনে মনে কল্যাণদার জয়লাভ কামনা করলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কল্যাণদা পরাজয় বরণ করে অসহায় ভাবে ফিরে এল। আমরা আবার বাসের অপেক্ষায় রাস্তায় বসে রইলাম।

আরও বেশ কিছুক্ষণ পরে আমি ও দিলীপ ওপরে নিজেদের ঘরে ফিরে আসতে যাব, হঠাৎ দেখি পাল পাল লোক ছুটে গিয়ে কল্যাণদার বাসে উঠছে। বাস কোথায় যাবে, আদৌ যাবে কী না, খোঁজ নেবার সময় নেই। দিলীপকে প্রায় ঠেলে বাসে উঠে জায়গা দখল করতে পাঠিয়ে, আমি ওপরে নিজেদের ঘরে ছুটলাম মালপত্র নামাতে। তখনও কিন্তু জানিনা বাস আদৌ যাবে কী না, বা গেলেও কোথায় যাবে। তবে কল্যাণদা যেহেতু সায়নাচট্টি যাবার আগ্রহ দেখিয়ে ছিলেন, তাই ধরে নেওয়া যায়, বাস সায়নাচট্টি যাচ্ছে। তবে সে চিন্তা পরে করলেও চলবে।

ওপরে এসে মাধবকে বললাম, তাড়াতাড়ি মালপত্র নামাতে। আকাশে আবার এখন বেশ মেঘ করে এসেছে। মাধব বললো, মালপত্র এখানেই রেখে যেতে। আমার তাতে একবারেই মত নেই। বললাম কোন কারণে ফিরতে দেরি হলে, প্রতিদিন পনের টাকা করে অহেতুক ভাড়া গুনতে হবে। মাধব কিন্তু সেই খরচ করেও, মালপত্র এখানেই রেখে যাওয়া ঠিক বলে মনে করল, কারণ সায়নাচট্টিতে হয়তো মাল রাখার ভাল জায়গা নাও পাওয়া যেতে পারে। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, তবু এখানে মালপত্র রেখে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ও আমার যুক্তি মেনে না নিলেও, বেজার মুখে আমাকেই মেনে নিল। শুধু বলল, রাস্তায় বৃষ্টি নামলে বিপদে পড়তে হবে। হাতে হাতে মাল নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি আমরা নীচে নেমে এসে, হোটেলের বিল মেটালাম। হোটেল মালিক আমাদের শুভ যাত্রা কামনা করলেন। আমি বাসের ছাদে মাল সাজিয়ে রেখে, নীচে নেমে এসে দিলীপের নাম ধরে চিৎকার করেও কোন সাড়া পেলাম না। বাসে এত ভিড়, যে ওকে উঠে খোঁজারও কোনও উপায় নেই। এই বাসে এখন অফিস টাইমের হাওড়া-কলকাতার মতো মানুষ ঝুলছে। দরজার দিকে এসে দেখলাম, দিলীপ একেবারে পিছনের সিটে জানলার ধারে জায়গা দখল করে বসে আছে। ও আমাদের দেখতে পেয়ে, তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে উঠে পড়তে বলল। ও আমাদের জন্য জানলার ধারে একটু জায়গা রেখে বসেছে। ও আমাদের দুজনের জন্যই দুটো বসার জায়গা রেখে, তারপরে নিজে বসেছিল। কিন্তু ওর ডানপাশে অনেকেই ওকে ঠেলে বাঁপাশে সরিয়ে, বসার জায়গা করে নিতে চাইছে। স্বাভাবিক, কারণ তারা দেখতে পাচ্ছে এত ভিড় বাসে দিলীপের বাঁপাশে জানালার ধারে দুজন বসার মতো জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে। রোগা পটকা দিলীপ যতই 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সুচাগ্র মেদিনী' পণ করে বসে থাকুক, তারা শুনবে কেন? ক্রমাগত চাপে তখন ওর বাঁপাশে কোন মতে একজন বসার মতো জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে। এদিকে বাসে এত ভিড়, যে দরজা দিয়ে উঠে ভিতরে যাবার কোন উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত জানালা দিয়ে বাসে ঢুকে, কোনক্রমে জানলার ধারে বসে পড়লাম। এবার মাধবও জানালা গলে উঠে এসে আমার বাঁপাশে, জানালার ধারে জোর করে চেপে বসে পড়ল। পাঁচ-ছজন বসার জায়গায়, এগিয়ে পিছিয়ে আটজন বসেছি। জানালার ধারে মাধব, তারপরে আমি, আমার পরে দিলীপ। দিলীপের ডানপাশে একবারে নোংরা কতগুলো নারীপুরুষ। ওর পাশেই একটা স্ত্রীলোকের কোলে একটা বছর বার-তের বয়সের মেয়ে। এপথের একটা সুন্দর ব্যবস্থা, বাসে যতই ভিড় হোক না কেন, বাস ছাড়ার আগে বাসের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবেই। আমাদের এই বাসটায় একটাই মাত্র দরজা, এবং সেটা একদম সামনের দিকে। পিছন দিকে কোন দরজা না থাকায়, আমার ও মাধবের ঠিক সামনে, দরজার পরিবর্তে একটা দুজন বসার চেয়ার সিট করা হয়েছে। এই সিটটায় দুজন লোক বসেও আছে। একটু পরেই দেখি অন্য একজন লোক কিভাবে ম্যানেজ করে, ওই সিটটার জানালার ধারে দিব্বি নিজের বসার ব্যবস্থা করে নিল। বাসে কোথাও একটু দাঁড়াবার জায়গা পর্যন্ত নেই। পিলপিল করে লোক বাসের ছাদে উঠছে। কল্যাণদা একবার আমাদের সিটের পাশে জানলার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'সিট মিলেছে তো?' আমরা অবাক হয়ে গেলাম। ওর সঙ্গে আমাদের কতটুকুই বা পরিচয়। বললাম, হ্যাঁ মিলেছে। কল্যাণদা বললেন, 'বাস ছেড়ে দিই?' আমরা বাস ছেড়ে দিতে বললাম। বুঝলাম না বাসে এত লোক থাকতে, উনি হঠাৎ আমাদেরই বা কেন জিজ্ঞাসা করলেন! কন্ডাক্টার কিন্তু এত ভিড়েও ঠিক কায়দা করে বাসের দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। বাসের ছাদে এত লোক উঠছে যে ভয় হচ্ছে, আমাদের স্যুটকেস বা হোল্ড্-অল্ গুলো, লোকে বসে বা পায়ের চাপে নষ্ট না করে দেয়। যাহোক, এবার বাস ছেড়ে দিল। কোথাও একটু বাস দাঁড়ালেই, একগাদা করে লোক বাসের ছাদে উঠছে। এত লোক কোথায় ছিল জানিনা। মাধব আর আমি মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে শরীরের অনেকটা অংশ বার করে বাসের ছাদে লাগেজ ঠিক আছে কিনা লক্ষ্য করছি। একবার দেখলাম দুটো স্যুটকেস ছাদের একপাশে দাঁড় করানো আছে। অর্থাৎ কেউ ওগুলো ওখানে সরিয়ে রেখেছে। আকাশে প্রচণ্ড মেঘ করেছে, সঙ্গে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। একটাই ভয় হচ্ছে, হোল্ড্-অল্ গুলো পলিথিনে মোড়া, কিন্তু বৃষ্টি হলে স্যুটকেসগুলো ভিজবে, আর মাধবের কাছে গালাগালি খেতে হবে। তা খেতে হলেও এখন আর আমার কোন দুঃখ নেই, কারণ এখন এটা নিশ্চিত যে আমরা এবারের শেষ গন্তব্যস্থল, যমুনোত্রী যাচ্ছিই।

হঠাৎ দিলীপের পাশের মহিলার কোলে বসা সেই মেয়েটা, উল্টি, অর্থাৎ বমি করবে বলে জানালো। আমি দিলীপকে বললাম, খুব গম্ভীর হয়ে চোখ পাকিয়ে ওদের দিকে তাকাতে, তা নাহলে মেয়েটা আমাদের গায়েই উল্টি করবে। মহিলাটিকে বললাম, মেয়েটাকে ডানপাশে জানলার ধারে দাঁড় করিয়ে দিতে। মেয়েটা কাঁদতে এবং ঘামতে শুরু করলেও, নিজের জায়গা ছেড়ে নড়লো না এবং একটু পরেই মহিলাটির কোলে বমি করল। আমাদের সামনের চেয়ার সিটের একজন, নিজের সিটটা ছেড়ে দিয়ে তাকে বসতে বলল। কিন্তু মেয়েটার বোধহয় ইচ্ছা, কোথাও না গিয়ে আমাদের গায়েই বমি করা। বাধ্য হয়ে মহিলাটিকে খুব গরম দেখিয়ে, সামনের সিটে জানালার ধারে পাঠাতে বললাম। কিন্তু ওরা নীরব। এদিকে মেয়েটা একভাবে কেঁদে যাচ্ছে ও মাঝে মাঝে বমি করার মতো ওয়াক্ ওয়াক্ করে আওয়াজ করে যাচ্ছে। সামনের সিটের সেই ম্যানেজ করে জানালার ধারে বসা লোকটা আমাদের বলল, আমাদের জায়গা ছেড়ে দিয়ে ওকে জানালার ধারে বসতে দেওয়া উচিৎ। দিলীপ তাকে ধমকে চুপ করিয়ে দিয়ে বললো, "তোমার যদি এত দয়া, তবে তুমি তোমার সিটটা ছেড়ে দিয়ে ওকে বসতে দাও না"। লোকটা বিপদের আঁচ পেয়ে চুপ করে গেল। মনে হল দিলীপের হিন্দি বলার ক্ষমতাই, এক্ষেত্রে লোকটাকে চুপ করাতে সাহায্য করেছে। ইতিমধ্যে কন্ডাক্টার এসে টিকিট দিয়ে ভাড়া নিয়ে গেল। তিনজনের মোট ন'টাকা ভাড়া লাগল। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ পার হয়ে গেছে। বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছে, এই বোধহয় বৃষ্টি শুরু হল। একসময় একটা ঝরনার তলা দিয়ে বাসটা গেল। পাহাড়ের একটা অংশ রাস্তার ওপর ছাদের মতো ঝুলে আছে, আর সেইখান থেকেই খুব জোরে রাস্তায় জল পড়ছে। কিন্তু সেটা খুব সামান্য জায়গা জুড়ে হওয়ায়, বাসের ছাদে জল পড়ে জানলা ভিজিয়ে দিলেও, মালপত্রের খুব একটা ক্ষতি হবে বলে মনে হয় না। এইভাবে এক সময় বেশ অন্ধকারে বাস এসে সায়নাচট্টি উপস্থিত হল।

চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বাস থেকে নেমেই দুজন বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। এই বাসে আমরা তিনজনই একমাত্র ট্যুরিষ্ট। আর সকলেই স্থানীয় বা আশেপাশের বাসিন্দা, কেউ কেউ হয়তো কাজেও এসে থাকতে পারে। ভদ্রলোক দুজন একটা কুলি ডেকে, আমাদের ট্রাভেলার্স লজে নিয়ে গেলেন। এখানকার ট্রাভেলার্স লজে দেখলাম অনেকগুলো ঘর আছে। ব্যবস্থাও, এখন পর্যন্ত যতগুলো টুরিষ্ট লজ বা ট্রাভেলার্স লজে উঠেছি, তার মধ্যে সবথেকে ভাল। আমরা একটা তিন শয্যা বিশিষ্ট ঘর নিলাম। এই ভদ্রলোকরাও দেখলাম সংখ্যায় তিনজন। আমাদের ঘরের দুএকটা ঘর পরেই, ওদের ঘর। একটু পরে ওঁদের ঘরে গেলাম খোঁজখবর নিতে। একজন ডায়েরি লিখছেন বলে মনে হল। আলাপ করে জানলাম, ওঁরা জিওলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কর্মচারী। অফিসের কাজেই এদিকে এসেছেন, এবং এই ফাঁকে যমুনোত্রী দেখে, গঙ্গোত্রী যাবার ইচ্ছা আছে। গত দুদিন কোন বাস না আসায়, ওঁদেরও আমাদের মতোই অবস্থা। আজ বাস আসতে তাঁরা আনন্দে ছুটে গিয়েছিলেন। যমুনোত্রী ওঁদের ভাল লাগেনি। আমাদের কাছে হেমকুণ্ড ও নন্দন কাননের কথা শুনে, ওই দুটো জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমরা ঘরে ফিরে এসে মালপত্র গুছিয়ে রাখলাম। বাসে আসবার সময় ছাদে অত লোক উঠতে দেখে, কী ভয়টাই না পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম স্যুটকেসগুলো বোধহয় আর বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না। কিন্তু আশ্চর্য, একটা পায়ের দাগ পর্যন্ত কোন লাগেজে পড়ে নি। ওরা মালপত্র সাবধানে সরিয়ে রেখে ছাদে বসছিল। বলতে লজ্জা করলেও, সত্যি কথা বললে বলতেই হবে, আমি হলে হয়তো স্যুটকেসের ওপরেই আরাম করে বসতাম। বিশেষ করে যেখানে কেউ দেখার বা বলার লোক নেই। আকাশে মেঘ থাকলেও, বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। আমরা তিনজনে ঘুটঘুটে অন্ধকারে, খানিকটা মাঠের মতো ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে, ডান হাতে একটা চায়ের দোকানে চা খেয়ে, রাতের খাবারের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। একজন যুবক দোকানটা চালায়। সে বলল, আমাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়ে আসবে। বললাম, আমরা নিজেরাই আসব। ঘরে ফিরে এসে, যে যার খাটে আরামে শুয়ে থাকলাম। লোহার খাটে, স্পঞ্জের গদি। অনেকদিন বাদে নিশ্চিন্তে ঘুমনো যাবে। দিলীপের খাটটার একটা ঠ্যাং আবার নড়বড়ে, সত্যি কোথাও শান্তি নেই। রাত প্রায় ন'টা নাগাদ তিনজনে দোকানে গিয়ে ডাল, তরকারি ও রুটি খেয়ে, ঘরে ফিরে এলাম। আগামীকালের প্রয়োজনীয় টুকিটাকি জিনিস কাঁধের ঝোলা ব্যাগে গুছিয়ে নিয়ে, যাবার প্রস্তুতি শেষ করলাম। এরপর পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লাম।

আজ সেপ্টেম্বর মাসের চার তারিখ। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে সমস্ত মালপত্র ট্রাভেলার্স লজের ক্লোক রুমে রেখে দিলাম। যমুনোত্রী যাব। আজ আর ফিরব না। কাজেই শুধু শুধু ঘরভাড়া গোনার কোন মানে হয় না। গতরাতের জন্য আঠারো টাকা ভাড়া মিটিয়ে, মালপত্র একজন অল্প বয়সী কেয়ারটেকারের কাছে জমা দিয়ে, আমরা গতরাতের চায়ের দোকানে এলাম, চা খেতে।

দোকানের সামনে দেখলাম বিভিন্ন জায়গার দূরত্ব লেখা একটা বড় বোর্ড লাগানো আছে - তাতে যা বুঝলাম তা হল এখান থেকে যমুনোত্রীর দূরত্ব ২১ কিমি। আগে আরও আট কিমি এগিয়ে হনুমান চটি পর্যন্ত জীপ ও বাস যেত। এখন যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ এখানেও আমাদের যাতায়াতে ৮+৮=১৬ কিলোমিটার পথ, অতিরিক্ত হাঁটতে হবে। আমরা শেষ পর্যন্ত হাঁটা পথেই, আস্তে আস্তে হাঁটতে শুরু করলাম। রাস্তা মোটেই খাড়া নয়। ভোরের সূর্যালোকে প্রফুল্ল মনে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। বন্ধুদের কথা বলতে পারব না, তবে আমার মনে এখন এক অদ্ভুত প্রশান্তি। এবারও আমারই জয় হল। যমুনোত্রী যাওয়ার জন্য হাঁটা যখন শুরু করেছি, তখন আর শুধু পৌঁছনোর অপেক্ষা। একসময় হাঁটা পথ এসে বড় পাকা রাস্তায় মিশে গেল। আর কিছুটা এগিয়েই হনুমান চটি। গঙ্গোত্রী যাবার পথে লঙ্কায় এক দোকানদার, আমাদের হাতে একটা চিঠি দিয়ে, হনুমান চটির এক দোকানদারকে চিঠিটা দিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেছিল। এখন সেই দোকানদারের

খোঁজ করে,তার হাতে চিঠিটা দিলাম। দোকানে চা ও ঝুড়িভাজা খেয়ে রওনা হবার আগে, মাধব ও দিলীপ ওই দোকানে ফেরার পথে রাত্রে থাকার ব্যবস্থাও পাকা করে ফেললো। দোকানদার খুব খুশি হয়ে রাজি হয়ে গেল। রাতে আমাদের জন্য সে চাপাটি ও তরকারি বানাবে বললো। আমিও এই উত্তম প্রস্তাবে সায় দিলাম বটে, তবে মনে একটা আশা, ঠিকমতো হাঁটতে পারলে,আজ রাতে সায়নাচট্টির ট্রাভেলার্স লজের নরম গদিতে শান্তির ঘুম কে আটকায়? আগে পথেও শুনেছি, এখানেও আবার সেই সাবধান বাণী শুনলাম যে, যমুনোত্রীতে একজন বাঙালি সাধুবাবা থাকেন। সবাই তাঁকে মাধব বাবা বলে। তিনি পথিকদের খিচুড়ি খাওয়ান। তবে সে খিচুড়ি না খাওয়াই ভাল, কারণ ওই খিচুড়ি খেলেই নাকি হজমের গণ্ডগোল হয়। অত কষ্টকর জায়গায় কষ্ট করে থেকে, নিজের গ্যাঁটের কড়ি খরচা করে, কেন তিনি যাত্রীদের অসুস্থ করার ব্রত নিয়ে ওখানে পড়ে আছেন জানিনা! জানিনা এই গল্পটা এত প্রচারই বা পেল কী ভাবে! তবে সাবধানের মার নেই। আমরাও ঠিক করলাম, মাধব বাবার কাছে কিছু খাব না। আস্তে আস্তে একসময় "ফুল চটি" এসে পৌঁছলাম। রাস্তা হনুমান চটি থেকে পাঁচ কিলোমিটার। রাস্তা আস্তে আস্তে ওপরে উঠে আবার নীচে নেমে এসেছে। অর্থাৎ আমরা একুশ কিলোমিটার পথের, তের কিলোমিটার পথ শুধু হেঁটেই এলাম, উচ্চতায় কিন্তু অতি সামান্যই উঠেছি। বুঝতে পারছি এ রাস্তার শেষে বেশ ভোগান্তি আছে। শেষ পাঁচ কিলোমিটার পথ হেঁটে, আমরা মাত্র ৩২৯ মিটার উচ্চতায় উঠেছি। অথচ রাস্তা কিন্তু কোথাও সমতল ছিল না। তাড়াহুড়ো করার প্রয়োজন নেই, কারণ আমরা বেশ ভাল গতিতেই এগোচ্ছি। আঁকাবাঁকা, চওড়া রাস্তা দিয়ে আমরা লক্ষ্যস্থলের দিকে এগিয়ে চলেছি। ডানহাতে অনেক নীচে যমুনা। চলার পথটা শক্ত পাথরের ওপর দিয়ে গেছে বলেই বোধহয়, এর জল এত পরিষ্কার নীল। গঙ্গা গেছে নরম কাদামাটির পথ দিয়ে। গঙ্গার জলও তাই বেশ অপরিষ্কার।

দেখতে দেখতে আমরা "জানকী চটি" এসে পৌঁছলাম। এখানে একটা টুরিষ্ট লজ থাকায়, রাতে থাকার বেশ ভাল ব্যবস্থা আছে। রাস্তার ডানপাশে একটা দোকান। এক বৃদ্ধ এই দোকানের মালিক। এখানে আমরা চা খেলাম এবং ফেরার পথে খাবার জন্য চাপাটি বানাতে বললাম। বৃদ্ধ একবার চাউলের কথা বললেও, আমরা তাঁকে চাপাটিই বানাতে বলে, রাস্তায় নামলাম। এখন পর্যন্ত রাস্তা বেশ আরামদায়ক বললে ভুল বলা হবে না। কারণ রাস্তা কিছুটা ওপরে উঠে, আবার নীচের দিকে নামায়, খুব একটা কষ্টকর নয়। বৃদ্ধ দোকানদার জানালেন, আর মাত্র পাঁচ কিলোমিটার পথ বাকী আছে। আঁকাবাঁকা রাস্তায় হেঁটে চলেছি। পথের সৌন্দর্য বলে কিছু নেই। সেই একঘেয়ে বন, লতাপাতা,পাথর,আর ডানদিকে বহু নীচে, নীল যমুনা। আমরা এতদিন বিভিন্ন জায়গায় যে সৌন্দর্য দুচোখ ভরে দেখে এসেছি, তারপর এই জায়গা ভাল লাগার কথাও নয়। আরও পাঁচ কিলোমিটার পথ হাঁটতে হবে। এবার কিন্তু হঠাৎ রাস্তা ওপর দিকে উঠতে শুরু করল। আমরা যখন প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি, তখন আকাশে রোদ ও ছায়ার খেলা শুরু হয়ে গেছে। মাধব ও দিলীপ বেশ হাঁপিয়ে পড়েছে। আমার অবস্থাও খুব শোচনীয়। তবু ওদের ফেলে আমি প্রায় ছুটেই বলা যায়, এগিয়ে গেলাম। কারণ আকাশে বেশ মেঘ করে আসছে। সমস্ত জায়গার অনেক ছবি তুলেছি। এখন এই শেষ জায়গার ছবি, মেঘ করলে আমাদের এই অতি সাধারণ ভারতীয় ক্যামেরায় তোলা যাবে বলে মনে হয় না। উঠলেও, সে ছবি ভাল হবে বলে মনে হয় না। অনেকক্ষণ একা একা এগোচ্ছি। হঠাৎ রাস্তার ওপর ছোট একটা সাপকে দেখলাম, রাস্তার একপাশ থেকে অপর পাশে যাচ্ছে। আমার হাতের লাঠি দিয়ে ওটার পথরোধ করতেই, সে তার ছোট্ট ফণা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেহ কিন্তু মাটি থেকে একটুও উঠছে না, শুধু মাথাটা সামান্য তুলছে। মনে হয় একবারে বাচ্চা। হঠাৎ ভয় হল, এটার মা যদি প্রতিবাদ করতে আসে। লাঠির নালে ওটাকে আটকে নিয়ে, ছুঁড়ে অনেক নীচের যমুনায় ফেলে দিলাম। জানি অন্যায় করলাম, কিন্তু এই পাণ্ডব বর্জিত জায়গায় এটা কাউকে ছোবল মারলে, তাকেই যমুনার পারে শেষকৃত্য করতে নিয়ে যেতে হবে।

আবার নিজের পথ ধরলাম। এবার দেখছি রাস্তা, বোধহয় সত্তর ডিগ্রি অ্যাংগেলে, সিঁড়ির মতো উঠতে শুরু করেছে। এই রাস্তাতেও আমি সাধ্য মতো যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, ওপরে উঠতে শুরু করলাম। বাড়ির সিঁড়ি যেমন প্রথম একদফা উঠে, বাঁক নিয়ে নতুন করে আর একদফা উঠতে হয়, আবার বেঁকে নতুন আর এক দফা, এই রাস্তাও ঠিক সেই ভাবে ওপরে উঠেছে। বেশ কয়েক পাক ওঠার পর, দূরে মন্দির দেখতে পেলাম। মন্দিরের মাথায় লাল পতাকা উড়ছে। মনটা আনন্দে নেচে উঠল। চিৎকার করে সঙ্গীদের ডাকতে শুরু করলাম। ওরা কতটা পিছনে আছে জানিনা, কোন উত্তর এল না। মন্দিরে গেলাম। একজন বসে আছেন, বোধহয় পুরোহিত হবেন। তবে তাঁর কাছে প্রথম যেটা জানতে পারলাম, তাতে আমার হার্ট অ্যাটাক হবার উপক্রম। আমি তখন প্রায় জিভ বার করে কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছি, সেই অবস্থায় শুনলাম, এটা যমুনোত্রী মন্দির নয়। যমুনোত্রী মন্দির এখান থেকে আরও প্রায় দুই কিলোমিটার দুরে। কথাটা শুনে প্রথম অবস্থায় ভেঙ্গে পড়লেও, এখানে আর বৃথা সময় নষ্ট না করে, নতুন উদ্যমে এগোতে শুরু করলাম।

রাস্তা ঠিক একই ভাবে ওপরে উঠে যাচ্ছে। এত কষ্ট অন্য কোথাও বোধ হয়নি। রাস্তা আর শেষ হয় না। একভাবে চড়াই ভাঙতে নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে। শেষে অনেক দূরে, ছোট্ট যমুনোত্রী মন্দির চোখ পড়ল। ডান হাতে একটা ব্রিজ যমুনার ওপর দিয়ে গেছে। ব্রিজটা কিন্তু ভেঙে গেছে। ব্রিজের দুপাশেই গাছের ডালপালা দিয়ে, রাস্তা বন্ধের নির্দেশ। একটু বাঁপাশে অনেক নীচে, যমুনার ওপর দিয়ে একটা সাময়িক ব্রিজ তৈরি করা হয়েছে গাছের ডাল দিয়ে। ব্রিজটার ওপর দিয়ে হাঁটার সময় দেখি বেশ লাফাচ্ছে। পড়ে গেলে আর কিছু না হোক, হাত-পা ভাঙার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। গাছের দুটো মোটা ডালের ওপর, সরু সরু ডালপালা ফেলে, ওগুলো যাতে সরে না যায় তাই, মধ্যে মধ্যে পাথর ফেলে রাখা হয়েছে। পরে মনে হল, এটা বোধহয় যমুনা নয়, কোনও শাখা নদী। জানিনা এটার কী নাম। যাহোক, ব্রিজ পার হয়ে আরও বেশ খানিকটা পথ এগিয়ে, মন্দিরের বেশ কাছে এসে দেখলাম, আরও একটা ব্রিজ। এই ব্রিজটা বোধহয় যমুনার ওপর দিয়েই গেছে। আমি যখন ব্রিজটার প্রায় এক চতুর্থাংশ পার হয়ে গেছি, তখন বাঁদিক থেকে চিৎকার শুনে তাকালাম। দেখি বাঁপাশে বেশ খানিকটা নীচে মন্দির, এবং একজন হাত নেড়ে আমায় রাস্তা দেখাচ্ছে। আসলে মন্দিরে যেতে হলে, ব্রিজটা পার হতে হবে না। ঠিক ব্রিজটার আগে থেকে বাঁপাশে নেমে আসতে হবে। ফিরে এসে নীচে নেমে, মন্দির চত্বরে এসে হাজির হলাম। পাশ দিয়ে নদী বয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ পরে সঙ্গী দুজন চলে এল। ওদের কাছে শুনলাম, ওরাও আমার মতোই আগের মন্দিরটাকে, যমুনোত্রী মন্দির ভেবেছিল। ইতিমধ্যে আমার কয়েকটা ছবি তোলা হয়ে গেছে। সব জায়গার ছবি বেশ ভালভাবে তুলতে পেরেছি বলে, বেশ ভাল লাগছে। এই ছবিগুলোই সারা জীবন স্মৃতি হয়ে থাকবে।

যমুনোত্রী মন্দির বলতে ছোট্ট একটা ঘর, সাদা দেওয়াল, ভিতরে যমুনার মূর্তি। যমুনোত্রীকে নিয়ে যতই হৈ-চৈ করা হোক, যতই যাত্রী সেখানে যাক না কেন, মানুষ ও প্রকৃতি, উভয়ই তাকে উপেক্ষা করেছে, বঞ্চনা করেছে। মাধব বাবার সঙ্গে পরিচয় হল। তিনি আমাদের স্নান করে নিতে বললেন। একবারে মন্দিরের কাছে ছোট্ট একটা কুণ্ড থেকে গরম জল বার হচ্ছে। এখানকার কুণ্ডের জল কিন্তু গঙ্গোত্রীর মতো হালকা গরম নয়। এই কুণ্ডের জল এত গরম, যে ন্যাকড়া করে চাল ডাল বেঁধে জলে ফেলে দিয়ে ভাত, ডাল সিদ্ধ করা হয়। অনেকটা "মণিকরণ"-এর মতো। জল ফুটলে যেমন টগবগ করে আওয়াজ হয়, এই কুণ্ডের জল থেকে সেরকম একটা আওয়াজ হচ্ছে। তপ্ত কুণ্ডের জল গড়িয়ে এসে একটু নীচে একটা চৌবাচ্চায় পড়ছে। এই চৌবাচ্চার জল অত গরম না হলেও, স্নান করা যায় না। এই দ্বিতীয় চৌবাচ্চা থেকে আরও নীচে, আর একটা চৌবাচ্চায়, জল গড়িয়ে পড়ছে। এই তৃতীয় চৌবাচ্চার জল খুব আরামদায়ক গরম। আমরা জামা প্যান্ট ছেড়ে, জলে নেমে পড়লাম। মাধব বাবা বললেন, খিচুড়ি তৈরি করছেন, আমরা যেন স্নান সেরে খাওয়াদাওয়া করে, যমুনোত্রী ত্যাগ করি। সবিনয়ে জানালাম যে রাস্তায় খেয়ে এসেছি, কাজেই এখন আর কিছুই খাব না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন যে আমরা কোথায় খেয়েছি। একটু ইতস্তত করে বললাম, জানকী চটিতে। তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, "তোমরা ওখানে কী খেয়ে এসেছ?" বললাম রুটি তরকারি খেয়েছি। বললেন, "তবে দুটো খিচুড়ি খেয়েই যাও।" এতো মহা মুশকিল, এক মাধবকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অনেক কষ্টে রাজি করিয়ে, সব জায়গা ঘুরে এসে এখানে এলাম, তো আর এক মাধবের খপ্পরে পড়লাম। জয় মাধবায় নম। যাহোক্, শেষ পর্যন্ত তাঁকে রাজি করানো গেল। তিনি বললেন "তবে চা করি।" আমরা বারণ করলাম। তিনি বোধহয় এবার একটু দুঃখই পেলেন। বললেন, "এত দূরে এসে কিছু খাবে না?" সবিনয়ে বললাম, এর জন্য তাঁকে ব্যস্ত হতে হবে না। যে জায়গাটায় স্নান করলাম, তার পিছন দিকটায় মাধব বাবার মন্দির-কাম-আশ্রম। মাধব বাবার সঙ্গে আমরা তাঁর আশ্রমে গেলাম। অনেক কথা হল। উনি দেখলাম হাওড়া শিবপুরের প্রায় সমস্ত রাস্তা ঘাট চেনেন। এমন কী হাওড়া বাকসাড়া-ব্যাতরের কয়েকজনের নাম করে করে খোঁজখবর নিলেন। তারাও আগে যমুনোত্রী দেখতে এসেছিল। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম যে, তিনি প্রায় নয়-দশ বছর যমুনোত্রীতে আছেন। ভদ্রলোক বাঙালি। হয়তো সন্ন্যাসী হয়ে বাড়ি থেকে চলে এসেছিলেন।

এবার ওপরে যমুনোত্রী মন্দিরে গেলাম। পুজো হয়ে গেছে, মন্দিরের দরজা বন্ধ। একজন এসে দরজা খুলে দিল। মাধব ও দিলীপ ঠাকুর দর্শন করে, প্রসাদ নিল। আমি আরও কয়েকটা ছবি নিলাম। এরপর আমরা তিনজন মনের আনন্দে অনেকটা করে আমসত্ত্ব খেলাম। এবার ওঠার পালা। একটা হৃষ্টপুষ্ট ছেলে এসে আমায় বলল, তার একটা ছবি তুলে দিতে। মন্দিরের অনেক ছবি তোলা হয়েছে বলে, তাকে আশ্রমের কাছে দাঁড়াতে বললাম। সে কিন্তু মন্দিরের কাছে দাঁড়িয়েই, ছবি তোলার ইচ্ছা প্রকাশ করল। কথা বলে জানা গেল, সে মন্দিরের কেয়ারটেকার মতো। নাম, "রাই সিং"। আমাকে একটু অপেক্ষা করতে বলে, পোষাক বদলে এল। গায়ের কোটটা অনেক জায়গায় তালি দেওয়া। এবার বলল, আমার গায়ের হলুদ রঙের গেঞ্জিটা তাকে দিতে। বললাম, ছবি তুললে কিছু বোঝা যাবে না। ছেঁড়া জামা ছবিতে উঠবেও না, বোঝাও যাবে না। একটা ছবি নিলাম। তার অনুরোধে ছবির একটা কপি তাকে পাঠিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তার ঠিকানা নিয়ে, ফিরবার পথ ধরলাম।

একটু এগিয়েই আমার হাতের লাঠিটা আমায় ত্যাগ করে, নীচে যমুনায় চলে যাচ্ছিল। ওটাকে ধরে আবার আমার সঙ্গে নিয়ে চললাম। মাধব ও দিলীপ অনেক এগিয়ে গেছে। আমি বেশ ধীরে সুস্থে পথ চলছি। বেশ বুঝতে পারছি, চেষ্টা করলে আজই সায়নাচট্টি ফেরা সম্ভব হবে। আর এও বুঝতে পারছি, আজ যাওয়া আসা নিয়ে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ কিলোমিটার পথ হাঁটতে বললেও, ওরা দু'জনের কেউই আজ আপত্তি করবে না।

আমার এখন একটাই ভাবনা, আগামীকাল ফেরার বাস পাওয়া যাবে তো? কল্যাণদা যদি বাসটা আবার নিয়ে আসে তো খুব ভাল হয়। হাঁটতে হাঁটতে যখন একসময়, সেই ভুল করে যমুনোত্রী মন্দির ভাবা, মন্দিরটার কাছে এলাম, তখন দেখি, একদল স্ত্রী ও পুরুষ, সঙ্গে বাচ্ছা নিয়ে আসছে। ওরা যমুনোত্রী যাবে। আরও অনেকটা পথ হাঁটার পর, আর একজনের সাথে দেখা হ'ল। সে আমাদের কাছে একটা সিগারেট চাইলো। তাকে একটা সিগারেট দিয়ে পকেট থেকে দেশলাই বার করে দেবার আগেই, সে সিগারেটটা ছিঁড়ে ফেলে, মশলাটা খৈনির মতো হাতে পিষে, মুখে ফেলে দিল। একসময় জানকী চটির সেই দোকানে এসে হাজির হলাম। মাধব ও দিলীপ দোকানে বসেই ছিল। আমাদের খাবার তৈরিই ছিল, তাই অহেতুক সময় নষ্ট না করে, ডাল আর রুটি খেয়ে আবার নিজেদের চলার পথ ধরলাম। ওদের এবার একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে বলে বললাম, আজই সম্ভব হলে সায়নাচট্টি ফিরে যাব। এবার উৎরাই-এর পথই বেশি, কাজেই হাঁটার কষ্ট অনেক কম। কিন্তু মাধবের আবার এই এক রোগ, ওপরে ওঠার সময় কিছু হয় না বটে, কিন্তু নীচে নামতে হলেই ওর হাঁটুর ব্যথা শুরু হয়। হাঁটতে হাঁটতে

সেই পুরানো পথ ধরেই একসময় ফুলচটি এসে পৌঁছলাম। বেশ বুঝতে পারছি যে, যে কারণেই হোক, আজ কিন্তু আমাদের হাঁটার গতিবেগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। শেষ পর্যন্ত সেই পুরানো একঘেয়ে পথ ধরে, একসময় আমরা এঁকেবেঁকে হনুমান চটির সেই দোকানে ঢুকে, চা, ঝুড়িভাজা আর মিষ্টি খেয়ে, বেঞ্চে শুয়ে পড়লাম। এখন সবে বিকেল, তার মানে হাতে অনেক সময় আছে। দোকানদারকে জানালাম যে, আমরা আজই সায়নাচট্টি চলে যাব, কাজেই আজ রাতে আর এখানে থাকবো না।

হঠাৎই লক্ষ্য করলাম, আকাশের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। আর সময় নষ্ট না করে উঠে পড়লাম। সঙ্গীদের বললাম, খুব জোরে বৃষ্টি আসবে, তাড়াতাড়ি পা চালাতে। দিলীপকে নিয়ে এখন আর কোন সমস্যা নেই। কিন্তু মাধবের হাঁটার গতি ক্রমশঃ কমে আসছে। দাঁড়িয়ে পড়লে দাঁড়িয়েই থাকতে হবে, কাজেই হাঁটতে শুরু করলাম। আমি আর দিলীপ একটু আগে আগে হাঁটছি, মাধব কিছুটা পিছনে। মাঝে মাঝেই পিছন ফিরে ওকে গতি বাড়াতে বলছি। বড় রাস্তা থেকে যেখানে ডানদিকে পায়ে হাঁটার সেই শর্টকাট পথটা নেমেছে, সেখানে পৌঁছে বুঝলাম, বৃষ্টি নামলো বলে। মাধবকে আরও তাড়াতড়ি নামতে বলে, আমি আর দিলীপ খুব জোরে পা চালিয়ে নামতে শুরু করলাম। এইভাবে যখন আমরা প্রায় নেমে এসেছি, তখন ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি শুরু হ'ল। বৃষ্টির ভয়ে মাধবও দেখি তার পায়ের ব্যথা ভুলে, আমাদের ধরে ফেললো। আমরা এবার ছুটতে শুরু করলাম। এইভাবে আমরা যখন প্রায় ট্রাভেলার্স লজের সামনে এসে পৌছলাম, তখন বেশ বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি শুরু হ'ল। আমরা ছুটে ট্রাভেলার্স লজে গিয়ে ঢুকলাম। এবার শুরু হ'ল প্রচন্ড শিলাবৃষ্টি। আমাদের দেখে তো কেয়ারটেকার অবাক। সে জিজ্ঞাসা করলো, এত তাড়াতাড়ি আমরা কিভাবে ফিরে আসলাম? সে আমাদের ভাগ্যবান আখ্যা দিয়ে বললো, দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির পর, আজই প্রথম বৃষ্টি নামলো। আমরা আমাদের মালপত্র নিয়ে আগের সেই ঘরটায় চলে এলাম। ঘরে ঢুকেই যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এখন বেশ ঠান্ডা লাগছে। কম্বল চাপা দিয়ে আরাম করে শুয়ে থাকতে খুব ভাল লাগছে। শুয়ে শুয়ে ঘরের ছাদে, জানালায়, একভাবে শিল পড়ার শব্দ শুনতে শুনতে ভাবছি, বৃষ্টি নামায় এরা এত খুশি, কিন্তু রাস্তায় যদি ধ্বস নামে তাহলে আমাদের কী হবে? আবার বাস বন্ধ হয়ে যাবে না তো? এই বৃষ্টিতেই সেই দোকানদারটা ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলো যে, সে আমাদের খাবার নিয়ে আসবে কী না। বললাম, একটু পরে আমরা নিজেরাই যাব। রাত ন'টা নাগাদ দোকানে গিয়ে রুটি-তরকারি খেয়ে, সমস্ত দাম মিটিয়ে ঘরে ফিরে এসে, মালপত্র গুছিয়ে রেখে শুয়ে পড়লাম।

আজ সেপ্টেম্বরের পাঁচ তারিখ। আজও বেশ সকালেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। মুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে নিয়ে চা খেতে গেলাম। দেখলাম আমাদের বাস গতকাল সন্ধ্যাতেই এসে দাঁড়িয়ে আছে। গতকাল অন্ধকার আর মেঘবৃষ্টির মধ্যে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকা বাসটাকে লক্ষ্য করি নি। মালপত্র নিয়ে লজের বিল মিটিয়ে, বাসে এসে মালপত্র গুছিয়ে তুললাম। আর কোন চিন্তা নেই। চা জলখাবার খেয়ে বাস ছাড়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। বাসে আস্তে আস্তে লোক উঠছে। আমরাও বাসে উঠে বসলাম। একটু পরেই বাস ছেড়ে দিল।

আগের দিন এ পথ সন্ধ্যার অন্ধকারে এবং ভীষণ ভিড়ে এসেছিলাম। তাই রাস্তাঘাট, নদীনালা, ভালভাবে দেখার সুযোগ হয় নি। আজ খুশি মনে চারিদিক লক্ষ্য করতে করতে, ফুরফুরে মেজাজে চলেছি। অনেকটা পথ এসে, বাসটা একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে গেল। গতকালের প্রবল বর্ষণে ছোট হলেও, ভয়ঙ্কর ধ্বস নেমেছে। ঠিক বাঁকটার মুখে, রাস্তার খাদের দিকটায়, অনেকটা অংশ বহু নীচে নেমে গেছে। পাশ দিয়ে একটা জীপ চলে যেতে পারে, কিন্তু বাস নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জায়গাটার নাম দেখলাম "পালিগড়"। বাস থেকে নেমে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া, আমাদের আর করার কিছুই নেই। এ রাস্তা সারানো আমাদের কর্ম নয়। এর জন্য স্থানীয় অভিজ্ঞতা ও যথেষ্ট দক্ষতা থাকার বিশেষ প্রয়োজন। বাসের কয়েকজন বাস ড্রাইভারকে বললো, বাস খালি করে, সাবধানে ভাঙ্গা জায়গাটা পার হয়ে যেতে। সকলকে বাস থেকে নামিয়ে, বাস খালি করাও হ'ল। কিন্তু ঐ ভাঙ্গা অংশ পার করে বাস নিয়ে যাওয়া সম্ভব হ'ল না। তখন স্থানীয় বাস যাত্রীরা উপর থেকে বড় বড় পাথর বয়ে নিয়ে এসে, ভাঙ্গা জায়গা মেরামত করতে শুরু করে দিল। পাহাড়ের দিক, অর্থাৎ খাদের উল্টোদিকে রাস্তার একবারে পাশ থেকে পাথর সরিয়ে, ঐ জায়গার রাস্তা, খানিকটা চওড়া করার চেষ্টাও করা হ'ল। বুঝতে পারছি এটা সম্পূর্ণ সাময়িক, হয়তো দু'চারটে গাড়ি পার করার মতো ব্যবস্থা হচ্ছে। তা হোক, তবু একটা গাড়ি পার করা সম্ভব হলেও, আমরাই পার হচ্ছি। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কাজ করার পর, বাস চলাচলের মতো অবস্থা তৈরি করা সম্ভব হ'ল। ড্রাইভার খুব সাবধানে ভাঙ্গা জায়গাটা দক্ষ হাতে পার করে নিয়ে গেল। জানিনা সামনে আবার আমাদের জন্য আর কোন দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে কী না। আস্তে আস্তে এঁকেবেঁকে আগের দিনের সেই পুরানো পথ ধরে, আমরা বারকোট ফিরে এলাম। সমস্ত লোক বাস থেকে নেমে পড়লো। মাধব ও দিলীপ রাস্তায় নেমে পড়েছে। প্রত্যেক বারের মতো, আমি বাসের ছাদে উঠেছি মালপত্র নামাতে। আমাদের ছাড়া আর সকলের মালপত্র বলতে ঝুড়ি, ছোট ছোট কাপড়ের পোঁটলা ইত্যাদি। কাজেই ওরা চটপট্ নিজেদের মালপত্র নিয়ে বাসের ছাদ থেকে নেমে পড়লো। আমাকে অতগুলো হোল্ড-অল্, ও সুটকেস নামাতে হবে। একটা মালও নীচে নামানো হয় নি, বাসের মুখ ঘুরিয়ে আনার জন্য, বাস ছেড়ে দিল। সঙ্গীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে রইলো। আমি বাসের ছাদে উবু হয়ে বসে আছি। ড্রাইভার খুব জোরে বাস চালিয়ে নিয়ে চললো। অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েও, বাসের মুখ উল্টোদিকে ঘোরানোর কোন লক্ষণ দেখছি না। কোন জায়গা থেকে বাসকে আবার মুখ ঘুরিয়ে বারকোট নিয়ে যাওয়া হয় তাও জানিনা। বাসটা আদৌ মুখ ঘুরিয়ে আনতে যাচ্ছে কী না, তাও সঠিক জানা নেই। ভয় হচ্ছে, এখন যদি বলে এবেলা বাস এখানেই থাকবে, তাহলে এত মালপত্র নিয়ে কী করবো? হঠাৎ রাস্তায় বাসের ছাদে হনুমানের মতো আমার বসে থাকার ছায়া দেখে, ড্রাইভার জানালা দিয়ে মুখ বার করে, অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, বাসের ছাদে বসে আমি কী করছি। বললাম আমাদের মালপত্র এখনও নামানো হয় নি। বুঝলাম ড্রাইভার বা কন্ডাক্টার, কেউই জানতো না যে, আমি বাসের ছাদে বসে আছি। যাহোক্, এতক্ষণে একটা জায়গায় এসে, বাসের মুখ আবার বারকোটের দিকে ঘোরানো শুরু হ'ল। এই জায়গার রাস্তাও কিন্তু বেশ সরুই। বাসটা একবার সামনে উচু পাহাড়ের দিকে এগোয়, আবার খাদের দিকে পিছিয়ে এসে, ব্রেক কষে হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে এগিয়ে পিছিয়ে, অনেক কসরত করে বাসের মুখ ঘোরানো পর্ব চলছে। আমি খুব সাবধানে ছাদের একটা পাটাতন ধরে বসে আছি। ড্রাইভার আমাকে ধার থেকে সরে গিয়ে বাসের মাঝখানে বসতে বলল। বাসটা যখন পিছিয়ে খাদের দিকে এসে থেমে যাচ্ছে, বাসের ছাদ থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বাসের পিছন দিকের অনেকটা অংশ, পিছনের চাকার প্রায় আগে পর্যন্ত, আমাকে নিয়ে খাদে ঝুলছে। বুঝতে পারছি না, সেই যদি সরু রাস্তার ওপরেই বাস ঘোরাত হয়, তাহলে বারকোট থেকে তেল পুড়িয়ে এতটা পথ কষ্ট করে পার হয়ে, এই সুইসাইডাল পয়েন্টে আসার দরকার কী! বাসের ছাদে উবু হয়ে বসে, প্রায় দম বন্ধ করে ড্রাইভারের কেরামতি দেখছি। যাহোক, শেষ পর্যন্ত ঐ ভাবে এগিয়ে পিছিয়ে বাসের মুখ ঘরিয়ে, বাসকে আবার বারকোটের দিকে নিয়ে যাওয়া হ'ল। বারকোটে ফিরে এসে, মালপত্র নামিয়ে, হোটেলে ঢুকলাম। আগের দিনের সেই ঘরটা পাওয়া গেল না। ঠিক তার উল্টো দিকে একটা ঘর পেলাম। এ ঘরটা থেকে বাথরুম পায়খানা কাছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, একে একে তিনজনে খুব ভাল করে স্নান করে, অবশিষ্ট বোর্ণভিটাটা শেষ করলাম। তারপরে একতলায় গিয়ে খেয়েদেয়ে, আবার ঘরে ফিরে এলাম। আগেরবার লক্ষ্য করেছি, বিকেল তিনটে-সাড়ে তিনটে নাগাদ, একটা স্টেট বাস বারকোট আসে। বাসটা কিন্তু আসে, যেদিক থেকে আমরা প্রথম দিন বারকোট এসেছিলাম, তার উল্টো দিক থেকে। অর্থাৎ বাসের ছাদে বসে আমাকে যেদিকে যেতে হয়েছিল, সেই দিক থেকে। বাসটা রাতে বারকোটে থেকে, পরদিন সকালে ঐ পথে মুসৌরি হয়ে, দেরাদুন যায়। অপর দিকে যে বাসটা হৃষিকেশ থেকে বারকোট হয়ে, সায়নাচট্টি যায়, সেটা আবার বারকোট থেকে হৃষিকেশ ফিরে যায়। আমরা আর কোন ঝুঁকির মধ্যে না গিয়ে ঠিক করলাম যে, সকালে যে বাসটা আগে ছাড়বে, তাতেই দেরাদুন বা হৃষিকেশ চলে যাব।

আমরা ঠিক করেছিলাম, সমস্ত জায়গা ঘুরে, ফিরবার সময় হরিদ্বারে দিনকতক রেষ্ট নিয়ে হাওড়া ফিরব। রেষ্ট মানে কমপ্লিট রেষ্ট। ভালমন্দ খাওয়া দাওয়া করব, আর নিশ্চিন্তে ঘুমাব। সন্ধ্যাবেলা হর-কি-পেয়ারিতে গিয়ে আরতি দেখে, বসে বসে গল্প করে সময় কাটাব। এই উদ্দেশ্যে মাধব একসেট পায়জামা পাঞ্জাবিও সঙ্গে নিয়ে এসেছে। কিন্তু এখন বুঝছি বাড়ির টান, নাড়ির টানের মতোই প্রবল। এখন আর আমাদের কোথাও যাবার ইচ্ছা নেই। এখন শুধু একটাই চিন্তা, কখন বাড়ি ফিরব।

পুঃ - দেরাদুন থেকে ফেরার ট্রেনে আমি আর মাধব কিছুতেই বেড়ানোর খরচের হিসাব মেলাতে পারছিলাম না। হিসাব মতো হাতে সাত টাকা ছিয়ানব্বই পয়সা একসেস্ থেকে যাচ্ছে। পাশ থেকে এক ভদ্রলোক বললেন, হিসাব মেলাচ্ছেন? ওটা কোনদিন মেলে না। আমরা হেসে হিসাব নিকাশ বন্ধ করে রাখার আগে শুধু দেখে নিলাম, এই ট্যুরে আমাদের জুতো, ওয়াটার প্রুফ, ওয়াটার বটল্, ইত্যাদি কেনার খরচ বাদ দিয়ে, এক একজনের, সাত শত ছিয়াত্তর টাকা ঊনত্রিশ পয়সা করে খরচ হয়েছে, আর প্রায় ২২৫ কিলোমিটার মতো হাঁটতে হয়েছে। ( গোবিন্দ ঘাট–হেমকুণ্ড ১৮.৫ কি.মি.+ হেমকুণ্ড-ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স ৮.৫ কি.মি.+ ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স-ঘাংরিয়া ৩.৫ কি.মি.+ ঘাংরিয়া-ভ্যালি অফ্ ফাওয়ার্স ৫ কি.মি.+ ভ্যালি অফ্ ফ্লাওয়ার্স-গোবিন্দ ঘাট ১৮ কি.মি.+ বদ্রীনারায়ণ-বসুধারা ৮ কি.মি.+ বসুধারা-বদ্রীনারায়ণ ৮ কি.মি.+ শোণপ্রয়াগ-ত্রিযুগী নারায়ণ ৫ কি.মি.+ ত্রিযুগী নারায়ণ-শোণপ্রয়াগ ৫ কি.মি.+ গৌরীকুণ্ড-কেদারনাথ ১৪ কি.মি.+ কেদারনাথ-গৌরীকুণ্ড ১৪ কি.মি.+ ভুখি-ডাবরানী ১৩ কি.মি.+ লঙ্কা-ভৈরবঘাঁটি ৩ কি.মি.+ গঙ্গোত্রী-গোমুখ ১৮ কি.মি.+ গোমুখ-লঙ্কা ২৮ কি.মি.+ ডাবরানী-ভুখি ১৩ কি.মি.+ সায়নাচট্টি-যমুনোত্রী ২১ কি.মি.+ যমুনোত্রী-সায়নাচট্টি ২১ কি.মি. = মোট ২২৪.৫ কি.মি.)।

= সমাপ্ত =

আগের পর্ব - যমুনোত্রীর পথে - গোমুখ থেকে উত্তরকাশী

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অবসরপ্রাপ্ত অফিসার সুবীর কুমার রায়ের নেশা ভ্রমণ ও লেখালেখি। ১৯৭৯ সালে প্রথম ট্রেকিং – হেমকুন্ড, ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স, বদ্রীনারায়ণ, মানা, বসুধারা, ত্রিযুগী নারায়ণ, কেদারনাথ, গঙ্গোত্রী-গোমুখ ও যমুনোত্রী। সেখান থেকে ফিরে, প্রথম কাগজ কলম নিয়ে লিখতে বসা। ভ্রমণ কাহিনি ছাড়া গল্প, রম্য রচনা, স্মৃতিকথা নানা ধরণের লিখতে ভালো লাগলেও এই প্রথম কোনও পত্রিকায় নিজের লেখা পাঠানো। 'আমাদের ছুটি' পত্রিকার নিয়মিত লেখক, পাঠক, সমালোচক এখন নেমে পড়েছেন কীবোর্ডে-মাউসে সহযোগিতাতেও।

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

ড়ানোর ছবি-লেখা পাঠানোর আমন্ত্রণ রইল =

# সুন্দরবন দর্শন

শ্রাবণী ব্যানার্জী

~ সুন্দরবনের তথ্য ~ সুন্দরবনের আরও ছবি ~

প্রতিবছর মার্কিন মুল্লুক থেকে এসে কলকাতায় কাটানোর স্বল্প কয়েকটি দিনে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই বাড়িতে একটি মজলিসি আড্ডা বসে। সেই আসরে রাজনীতি, বিরিয়ানি, দেশবরেণ্য নেতা, চলচ্চিত্র, পুরনো দিনের গান, টিকটিকি, চোরডাকাত, রবীন্দ্রনাথ, বার্নাড শ, শক্তিগড়ের ল্যাংচা, বাঘ, তেলেভাজা, ভূত, কুকুর মায় পাজামার দড়ি পর্যন্ত কোনওটাই আড্ডার টপিক থেকে বাদ পড়ে না। আসর জমানোর কম্পিটিশনে নিঃসন্দেহে অনেকেই ব্রোঞ্জ বা সিলভার মেডেল পাওয়ার উপযুক্ত কিন্তু গোল্ড মেডেলটি সযত্নে তোলা থাকে শুধু একটি মানুষের জন্য – যিনি সম্পর্কে আমার এক দাদা। কখনও ছড়া কেটে, কখনও গান গেয়ে আর কখনও বা শুধুই অভিনয়ের দ্বারা (তিনটিতেই সিদ্ধহস্ত) তিনি এমন একটি গল্পের পরিবেশ সৃষ্টি করেন যে লোকজন নাওয়াখাওয়া ভুলে শুধু তাঁর মুখের দিকেই তাকিয়ে থাকে, মায় দুঁদে উকিলরাও বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে অসহায় বোধ করেন। এক কথায় আমার এই দাদাটি ব্রজদা, টেনিদা ও তাড়িণীখুড়োর এক মিলিত সংস্করণ।
এই ভাবেই কিছুবছর আগে শ্রাবণের এক সন্ধ্যায় হাতে রঙিন পানীয় নিয়ে দাদা তাঁর সুন্দরবনের বাঘ দেখার গল্প আরম্ভ করলেন। প্রথমেই হাত দুটিকে কপালে ঠেকিয়ে পরশুরাম বর্ণিত বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের স্তবটি সেরে নিলেন। কারণ নাকি তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন বলেই বাঘ দাদাকে অত্যন্ত স্নেহের চোখে দেখেছিল।

'নমামি দক্ষিণরায় সোঁদরবনে বাস,
হোগলা উলুর ঝোপে থাকেন বারোমাস।
দক্ষিণেতে কাকদ্বীপ শাহাবাজপুর
উত্তরেতে ভাগীরথী বহে যতদূর,
পশ্চিমে ঘাটাল পূবে বাকলা পরগণা –
এই সীমানার মাঝে প্রভু দেন হানা।'

জ্যোৎস্না রাতে দাদা একা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছেন – মাঝে মধ্যে জলের ঝুপঝাপ, গাছ থেকে ডাব পড়ার ধুপধাপ, সাপ চলার খসখস ও ওনার জুতোর মসমস শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না। এইভাবেই চলতে চলতে হঠাৎই এক অপরূপ দৃশ্য দেখে তিনি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। চাঁদের আলো গায়ে মাখিয়ে একটি কেঁদো বাঘ গ্যাঁট্ হয়ে ঠিক তাঁর সামনেই থাবা গেড়ে বসে আছে। আহা কি হ্যান্ডসাম দেখতে, রূপ যেন একেবারে ফেটে পড়ছে আর তেমনি পাগলা করা চাহনি। মুগ্ধ হয়ে দাদা তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন আর সেও অপলক দৃষ্টিতে দাদাকে দেখতে লাগল। পাশ থেকে একজন বেরসিক ফোড়ন কাটল, 'আপনাদের শুভদৃষ্টি হয়েছিল নাকি দাদা?' এ ধরনের তুচ্ছ মন্তব্য গায়ে মেখে দাদা কোনও দিনই গল্পের ফ্লো নষ্ট করেন না আর তাঁর সেই অসাধারণ গল্প বলার গুণে ধীরে ধীরে আমাদের সবারই মানসপটে যেন বাঘের সেই মিষ্টি মুখটি ভেসে উঠল শুধু কাছে গিয়ে তার থুতনিটা তুলে ধরে একটু চুমু খাওয়ার অপেক্ষা।
পরের দিন সকালেই এক পাড়াতুতো ভাই এসে বলল, (তিনিও সেই সান্ধ্য আড্ডাতে উপস্থিত ছিলেন) 'চলো না দিদি আমরা সবাই মিলে একটু হৈ হৈ করে সুন্দরবন ঘুরে আসি।' সে আর বলতে! দিদি তো সারাক্ষণ নেচেই আছে তাতে হ্যান্ডসাম বাঘের যে বর্ণনা শুনেছে তাতে এখন মাথা ঠিক রাখাই শক্ত। তাই কয়েকদিনের মধ্যেই সুন্দরবন যাওয়ার সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। শুধু দাদা এই ট্রিপে যোগ দিতে পারলেন না বলে সবারই মনটা একটু খারাপ। যাত্রার আগে উনি টেলিফোনেই জ্ঞান দিয়ে বললেন 'ওখানে গিয়ে চাষা, জেলে মাঝি সবার সাথেই আলাপ করিস তাহলে ওদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেককিছুই জানতে পারবি। সবসময় মনে রাখিস –

যস্মিন দেশে যদাচার
কাছা খুলে নদী পার।'

প্রথম লাইনটি আমি সব জায়গাতে গিয়েই মেনে চলি আর দ্বিতীয়টি আমার জেন্ডারে ফলো করা অসম্ভব বলে কান দিলাম না।
ভোর বেলাতেই একটি বড়সড় জীপ নিয়ে সুন্দরবনের দিকে রওনা হলাম। শহর ছাড়ার পর থেকেই রাস্তার অবস্থা হয়ে উঠল ভয়াবহ। সব গর্তাগর্ত উপেক্ষা করে ছোকরা ড্রাইভার তীরবেগে জীপটি চালিয়ে দিল। কখনও শূন্যে লাফ মেরে জীপের ছাদে গিয়ে মাথা ঠুকি আর কখনও বা টাল সামলাতে না পেরে অন্যের কোলে গিয়ে বসি। পেছন থেকে একজন বলে উঠল 'এক পিস্-এ একটু গদখালি পর্যন্ত পৌঁছে দাও ভাই (কারণ তারপর আর রাস্তা নেই - নৌকোই ভরসা) সারাজীবন তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।' আমার পাশের মানুষটি করুণ সুরে বলতে লাগলেন তাঁর ভেতরের অনেক অর্গানই নাকি ঠেলে বেরিয়ে আসার উপক্রম করছে উনি কোনওমতে সেগুলিকে চেপেচুপে সামলে রেখেছেন। আমাদের ড্রাইভার বাবাজি সব কথাই অগ্রাহ্য করে নিজেও নাচতে নাচতে এবং আমাদেরও নাচাতে নাচাতে গোলার বেগে ছুটে চললেন। ঘন্টা আড়াই পরে যখন গদখালি পৌঁছোলাম তখন একজনই মাত্র ড্রাইভারের উচ্ছ্বসিত প্রসংসা করে বললেন, বেশ কিছু দিন যাবৎ ওনার কোমরের গোটা দুয়েক হাড় নাকি এদিক ওদিক ম্যুভ করে যাওয়ায় অকথ্য কষ্ট পাচ্ছিলেন আর এখন ঝাঁকানিতে সেগুলি আবার যথাস্থানে বসে যাওয়ায় অত্যন্ত আরাম বোধ করছেন। গদখালিতে নেমেই কয়েকজন প্রচুর পরিমাণে কর্দমাক্ত পানিফল, শাঁস সমেত ডাব আর তেলেভাজা কিনে নিয়ে এলে আমার স্বামী

একটিও দাঁতে কাটলেন না আর তা দেখে লোকজন আমাদের আমেরিকান পেট ও ইমিউনিটি নিয়ে হাসাহাসি করতে লাগল। সেসব শুনে কেমন যেন একটা রোখ চেপে গেল। অত্যন্ত তেজের সঙ্গে সেই রাস্তার তেলেভাজা, কাদায় ভরা পানিফল ও ডাবের শাঁস খেয়ে দেখিয়ে দিলাম এতবছর আমেরিকায় থাকলেও ইমিউনিটিতে আমি তাদের থেকে কিছুমাত্র কম যাই না।

গদখালি থেকে নৌকাযাত্রা আরম্ভ হল - ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমরা হোটেলে গিয়ে পৌঁছোলাম। এই গ্রামটি জনমানবশূন্য না হলেও গণ্ডগ্রাম বললে অত্যুক্তি হয় না। ইলেকট্রিসিটির কোনও বালাই নেই তাই হোটেলের আলো পাখা জেনারেটরেই চলে। নৌকো থেকে নামতে গিয়ে দেখলাম অনেকেরই পা হড়কে গেল। ঘাটের গায়েই একটি ছোট মুদির দোকান আর তার পাশে গোটা দুয়েক ছাগল আর একটি বাছুর বাঁধা। সেই দোকানে আবার ভাঁড়ে চা বিক্রি হয়, দেখলাম লোকজন লেড়ো বিস্কুট সহযোগে সেটি সেবন করছে। আগেও দেখেছি গ্রামাঞ্চলে লোকজন মাঝে মধ্যেই খুব ভালো ভালো বাংলা বলে। দোকানের মালিক সেই বৃদ্ধ চাচা আমাদের চা খেয়ে যেতে অনুরোধ করলেন কারণ ওনার তৈরি চা-তে নাকি অত্যন্ত ভালো সুবাস। পরে আসব বলে হোটেলে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসলাম। মেনু ছিল - ডাল, চচ্চড়ি, মাছের ঝোল আর আমড়ার টক।

বলাবাহুল্য কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার আমেরিকার পেট সেই বিশুদ্ধ পাঁক মাখানো পানিফল, ধুলোর কোটিং দেওয়া রাস্তার তেলেভাজা আর এখনের আমড়ার টকের ধাক্কা সামলাতে পারল না, কোনওমতে ধুঁকতে ধুঁকতে বিছানার পরিবর্তে বাথরুমের মেঝেতেই শয্যা নিলাম। চতুর্দিকে তখন আমাকে নিয়ে একেবারে হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড। এখানে না আছে কোনও রাস্তাঘাট, না কোনও ডাক্তার বা হাসপাতাল মায় হিন্দু সৎকার সমিতিকে খবর দেওয়ার পথও বন্ধ! এমন সময় হোটেলের বাচ্চা চাকরটা ছুটতে ছুটতে এসে বলল – চাচার দোকানে ইলেকট্রিকের গুঁড়ো (ইলেকট্রল) পাওয়া যায়, জলে গুলে খেয়ে নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। আমার কাণ্ডকারখানার সঙ্গে বহুদিনের পরিচয় থাকায় আমার স্বামীর কাছে সব ব্যবস্থাই মজুত থাকে, তিনি দুটি ট্যাবলেট আমার হাতে দিয়ে রাস্তার তেলেভাজা ভক্ষণের জন্য যে পরিমাণ বাক্যিবাণ ছাড়তে লাগলেন তাতে মনে হল এর থেকে বাঘের পেটে যাওয়াও শ্রেয়।

পরের দিন সকালে লোকজন আমার সামনেই গরম গরম ফুলকো লুচি, হালুয়া আর আলুর দম দিয়ে প্রাতরাশ সারল আর আমার হাতে ধরাল জলে ভেজানো কিছুটা চিঁড়ে। এমন সময় একটি সৌম্যদর্শন ছেলে এসে হাতজোড় করে নমস্কার করল। তার নাম দীপ্ত আর সে নাকি দুদিন ধরে গাইড হিসাবে আমাদের সুন্দরবন ঘুরিয়ে দেখাবে। ছেলেটিকে দেখে একটু অবাক হলাম কারণ তার চালচলন কথাবার্তা কোনওটাই ঠিক পেশাদারি গাইডের মত নয় যাদের বেশিরভাগেরই জ্ঞানগম্যির ওপরে আমার কোনও শ্রদ্ধা নেই। তখনই হোটেলের মালিক ফোন করে জানালেন, এই ছেলেটি অত্যন্ত বড়লোকের একমাত্র সন্তান। তাদের কাছ থেকে একটি নয়াপয়সাও পায় না শুধু জঙ্গল ভালোবাসে বলে সুন্দরবনে কিছুদিন আছে। ছেলেটির নাকি জঙ্গল সম্বন্ধে অসাধারণ জ্ঞান আর শুধু ভারতবর্ষ নয় ইন্দোনেশিয়া ও আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়েও কিছুদিন থেকে এসেছে। পথ চলতে চলতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কতরকম বিচিত্র লোকের সঙ্গে যে আলাপ হল তার কোন ইয়ত্তা নেই - এই ছেলেটি নিঃসন্দেহে তাদেরই একজন।

দীপ্ত আমাদের নিয়ে নৌকোতে সজনেখালির দিকে চলল, সেখানেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ব্যাঘ্র ও কুমীর সংরক্ষণের ব্যবস্থা। জলের ধারে ধারে ম্যানগ্রোভ বা গরান গাছগুলিকে দেখিয়ে বলল সারা পৃথিবীতে আর কোথাও এত ম্যানগ্রোভের জঙ্গল নেই। ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশ দুটোতেই সুন্দরবনের ব্যাপ্তি। তাই জলে এক নদী থেকে আর এক নদীতে যেতে যেতে কোনটা যে ভারতবর্ষ আর কোনটা বাংলাদেশ সেটা বোঝাই ভার। এখানে হিন্দু-মুসলমান সবাই মিলেমিশেই থাকে আর বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায় ছাড়াও কালুখাঁ ও বনবিবির পুজোও লোকজন খুব ভক্তিভরে করে। সজনেখালিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ট্যুরিষ্ট লজ দেখতে পেলাম - সামনে বেশ কিছু ইউরোপীয়ান বাঁদরদের কলা খাওয়াচ্ছে। যদিও ট্যুরিস্টদের কল্যাণে এখানে বাঁদরদের খাওয়ার কোনও অভাব নেই তবুও দেখলাম একটি বাঁদর অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে আর একজনের পিঠ থেকে উকুন বেছে দিচ্ছে এবং মাঝেমধ্যে সেগুলিকে মুখেও পুরছে। দীপ্ত বলল, বাঁদররা মূলত ভেজিটেরিয়ান হলেও উকুনগুলোকে ঠিক ননভেজের মধ্যে ধরে না, এগুলো অনেকটা খাওয়াদাওয়ার পর মুখশুদ্ধির কাজ করে।

এ তল্লাটে ছোট বড় সব সাইজের কুমীরই দেখতে পেলাম কিন্তু বাঘ দেখার সৌভাগ্য হল না। একটা কুমীর ছলোছলো চোখে এমনভাবে শুয়ে আছে যে দেখে বড় মায়া হল। পাশ থেকে একজন বলে উঠল 'দেখো দিদি আহা বলে যেন আবার রুমাল দিয়ে চোখের জল মোছাতে যেও না তাহলেই ল্যাজের ঝাপটা দিয়ে জলে টেনে নেবে। কুম্ভীরাশ্রু কথাটা মনে আছে তো?'

শুনলাম পশ্চিমবঙ্গের দিকের সুন্দরবনে দুশো আড়াইশোর বেশি বাঘ থাকে না আর বাংলাদেশকেও ধরলে খুব বেশি হলে পাঁচশো। যদিও এদের পাসপোর্ট ভিসা লাগে না তবুও বাঘেরা যে যার নিজেদের গণ্ডির মধ্যেই ঘোরাফেরা করে। মাঝিদের সঙ্গেই দীপ্ত আমাদের বাঘের দেবতা 'দক্ষিণ রায়'-এর মন্দিরে নিয়ে গেল। তারা দেখলাম দক্ষিণরায় ছাড়াও কালুখাঁ ও বনবিবিকেও ভক্তিভরে প্রণাম করছে যাতে সাপ কুমীরেরও দর্শন পেতে না হয়, অর্থাৎ ইনসিওরেন্সের ফুল কভারেজই নিয়ে রাখছে। আমি ভাবলাম – এটা কেমন হল? আমি বলে প্রার্থনা করছি যাতে বাঘের দর্শন পাই আর এরা কিনা উল্টো গান গাইছে? নাহ্, ঈশ্বরদের অযথা ডিলেমায় ফেলে লাভ নেই তাই আর কোনও প্রার্থনা না করেই কয়েকটি টাকা পুরোহিতের হাতে তুলে দিলাম।

দীপ্ত আমারই অনুরোধে মন্দিরের কাছে একটি বিধবার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল যার স্বামী ও একটি সন্তান বেআইনি ভাবে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের পেটে গেছে। এই তল্লাটে লোকজন অত্যন্ত গরিব তাই পেটের দায়ে মধু চুরি করতে যায়। বাঘ পেছন থেকে অ্যাটাক্ করে বলে তাদের ধোঁকা দেবার জন্য মাথার পেছনে মানুষের মুখোস সেঁটে বেরোয় যাতে বাঘ তাদেরকে সামনে থেকে দেখছে বলে মনে করে। সামনের লোকটি মুখ না ঘুরিয়ে পেছনের লোকের উদ্দেশ্যে একটি করে সংকেত পাঠায়, উত্তর পেলে বোঝে এখনও তারা আছে, না পেলে ধরে নেয় বাঘ নিয়ে গেছে। বাঘ এতটাই নিঃশব্দে কাজ সারে যে অনেক সময় পাশের লোকটিও টের পায় না কখন তুলে নিয়ে গেল। দীপ্ত বলল, মামাদের শিকারের পদ্ধতি হল পেছন থেকে এসে সজোরে ঘাড়ে থাবা মেরে এক ঝটকায় ঘাড়টা ভেঙে দেওয়া। এই তল্লাটে একটি বিধবাদের গ্রাম আছে যাদের স্বামীরা নাকি প্রায় সবাই-ই মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের পেটে গেছে।

শুনলাম বাঘ অত্যন্ত ভালো সাঁতারু। জন্তুজানোয়ারকে নদী পেরোতে দেখলে জলে গোঁফ ডুবিয়ে স্রোতের গতিটা মেপে নেয় তারপর ঠিক ততটা পিছিয়ে এসে স্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাঁৎরাতে থাকে। দীপ্ত বলল, সপ্তাহখানেক আগে ও নাকি নৌকোতে চেপে যাচ্ছিল হঠাৎ নৌকোটাকে অসম্ভব টলমল করতে দেখে পেছনের মাঝিকে ঠিক করে লগি ধরতে বলতে গিয়ে সেদিকে তাকিয়ে দ্যাখে মাঝিটা আর নেই।

এখানে বাঘ, সাপ বা কুমীরের কামড়ে মরাটা এতটাই স্বাভাবিক ব্যাপার যে বলতে গিয়ে লোকজনের গলাও কাঁপে না। হোটেলের রাঁধুনি বলল, কয়েকদিন আগেই নাকি পথে একটি সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছিল, কোনওমতে এঁকেবেঁকে দৌড়ে প্রাণে বেঁচেছে।

আমাদের লঞ্চটা যখন পাখিরালয়ের পাশ দিয়ে চলতে লাগল তখন নামটা কানে বেশ মধুর ঠেকল কারণ চারদিকে গ্রামের নামগুলির পেছনে 'খালি' শুনতে শুনতে কান যেন ধরে গিয়েছিল। এই যেমন ধরুন, গদখালি, বকখালি, সজনেখালি, সন্দেশখালি, সুধন্যখালি ইত্যাদি। লোকজন এখানে হয় নৌকায় নয়ত নির্দিষ্ট সময়ে চলা লঞ্চে এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামে যাতায়াত করে, রাস্তাঘাটের কোনও বালাই নেই। দীপ্ত মাঝিকে বিদ্যাধরী নদীর ওপর দিয়ে নিয়ে যেতে বলল। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম মাতলা নদীও তার সঙ্গে এসে মিশেছে। সাগরের কাছে এসে অনেকগুলি নদীই মিলেমিশে একাকার হয়ে পলিমাটি ফেলে বিশ্বের সবথেকে বড় ডেল্টা বা বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে।

শুনলাম জঙ্গলে হরিণ ও অন্যান্য জন্তুর সংখ্যা এতটাই কমে গেছে যে বাঘেদের খাবার বড় একটা জোটে না তাই বাঘ মূলত অনাহারেই মারা যাচ্ছে। পেটের জ্বালাতেই তারা গ্রামের মধ্যে ঢুকে গরু ছাগল তুলে নিয়ে যায়, জাল দিয়ে আড়াল করেও বিশেষ লাভ হয় নি। সেটা শোনার পর থেকেই সেই খেতে না পাওয়া বাঘগুলোর ওপর আমার ভাইয়ের দরদ একেবারে উথলে উঠল। যখনই কোথাও হরিণ চরতে দ্যাখে তখনই আহা বাঘ ওদের মিস্ করে গেল বলে হাহুতাশ করে। শুধু তাই নয় দীপ্ত যখন বলল – এখন ভাঁটার সময় তাই বাঘ নদীতে মাছ খেতে আসতে পারে তখুনি সে ছুটে গিয়ে তার কাছে ঝুলোঝুলি করতে লাগল একটু বাঘ দেখিয়ে দেওয়ার জন্য; ভাবখানা এমন যেন দীপ্ত বাঘ পকেটে নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমন সময় দূর থেকে তিনটে চিতল হরিণ দেখতে পেয়ে আমার পাতানো ভাইটি একেবারে হায় হায় করে উঠল সম্ভব হলে সে নাকি তখুনি এসএমএস পাঠিয়ে মামাবাবুকে হরিণগুলোর লোকেশন জানিয়ে দিত। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দীপ্ত ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় সবাইকে চুপ করতে বলল। নদীর ধারে সে বাঘের পায়ের টাটকা ছাপ দেখতে পেয়েছে। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই যেন চোখের পলকে ঘটনাটা ঘটে গেল, হরিণগুলো প্রাণভয়ে এক চুড়ান্ত লাফ দিল আর তাদেরকে একটি ডোরাকাটা বিদ্যুৎবেগে ধাওয়া করল। মুখচোখ ভালো করে দেখতে না পেলেও সেটা যে বাঘ সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না, তাই আমি আর ভাই দুজনেই বাঘ বাঘ বলে চিৎকার করে উঠলাম। দুঃখের বিষয়, আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ সেই দ্রুত গতিতে চলে যাওয়া বাঘটিকে দেখতে পায়নি, তাই অন্যান্যরা বয়েসের দরুণ আমাদের কার চোখে ঠিক কতটা চালশে পড়েছে সেই গবেষণায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন শুধু আমার কর্তা মশাই ভিন্ন মত দিয়ে বললেন– পরশুরাতে সেই চাচার দোকানের ভেজাল 'ইলেকট্রিকের' জল খাওয়ার পর থেকেই আমি নাকি লাগাতার চোখে সরষে ফুল দেখে যাচ্ছি আর খুব সম্ভবত সেটিকেই 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' বলে ভ্রম করেছি।

সব টিটকিরি অগ্রাহ্য করে আমার ভাই আবেগের বশে সামনে হাত বাড়িয়ে সাংঘাতিক হেঁড়ে গলায় কিশোর কুমারের সেই বিখ্যাত গানটি গেয়ে উঠল – 'এক পলকে একটু দেখা আরও একটু বেশি হলে ক্ষতি কি?' ক্ষতি যথেষ্টই হত যদি মামাবাবু সামনে উপস্থিত থাকতেন। ভাগ্নের গলায় সেই বিকট বেসুরো গান শুনে তিনি নিঃসন্দেহে মেজাজ ঠিক রাখতে পারতেন না আর ক্ষেপে গিয়ে তাকেই হয়ত সে রাত্রের ডিনার হিসাবে ব্যবহার করতেন।

সেদিনের মধ্যাহ্ন ভোজন বোটেই সারা হল আর তার কিছুক্ষণ পরেই দীপ্ত এসে বলল ও আমাদেরকে বিদায় জানাতে এসেছে। এক মাঝির সঙ্গে তাদের গ্রামে চলে যাচ্ছে, সেখানেই কয়েকটা দিন কাটাবে। খেয়াল করলাম 'পথের আলাপ পথেই শেষ হয়ে যাওয়া ভাল' কথাটা মুখে বলা যতটা সহজ কাজে করা ঠিক ততটা নয়। গত দুদিনে এই আপনভোলা ছেলেটিকে সবাই-ই খুব ভালোবেসে ফেলেছিলাম আর ওর জ্ঞানের পরিধি দেখেও অবাক হয়েছিলাম। বাঘ, কুমীর, পাখি বিভিন্ন লতাপাতা মায় বাঁদর সম্বন্ধেও বিচিত্র প্রশ্ন করে তাকে উত্যক্ত করে তুলেছিলাম কিন্তু বিরক্ত হওয়ার পরিবর্তে সে হাসিমুখে ধৈর্য্য ধরে আমার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে তাই একসময় ভুলেই গিয়েছিলাম এই ছেলেটি দুদিন আগেও আমার কাছে ছিল অপরিচিত। ধরা গলায় জিজ্ঞাসা করলাম 'তোমার সাথে আবার কবে দেখা হবে ভাই?' উত্তর পেলাম 'জানি না তো দিদি, হয়ত এই সুন্দরবনেই আপনাদের সাথে কোনও একদিন দেখা হয়ে যাবে, তখন আমার কথা আপনাদের মনে থাকবে তো?' নাহ্, আজও আমরা সেই সদাহাস্যময় ভবঘুরে জঙ্গলপ্রেমী ছেলেটির কথা ভুলি নি।

পরেরদিন সকালে আমাদের ফিরে আসার পালা। শুনতে পেলাম চাচার দোকানের পাশে বসে থাকা বাছুরটিকে কাল রাতেই বাঘে তুলে নিয়ে গেছে, সেটা শোনা অবধি বুকের ভেতরটা কেমন যেন করতে লাগল। কাল সকালেও বাছুরটার মাথায় হাত বুলিয়ে নৌকোয় উঠেছিলাম আর আজ কিনা সে নেই? ফেরার পথে সেই শূন্য খুঁটিটার দিকে তাকিয়ে বার বার বাছুরটার মুখ মনে পড়তে লাগল তবুও কেন জানিনা সেই ঘাতক বাঘটার ওপর রাগ করতে পারলাম না। খাদ্য-খাদক সম্পর্ক তো পৃথিবীতে চিরদিনের। তবু তো প্রাণীরা বাঁচার তাগিদে হত্যা করে আর আমরা তথাকথিত সভ্য মানুষরা তো অকারণেই হিংস্রতা দেখাই। এ প্রসঙ্গে বার্নাড শর সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে গেল - 'When a man wants to murder a tiger he calls it sport; when a tiger wants to murder him he calls it ferocity'। মনে পড়ে গেল আমার বাবা মাঝেমধ্যেই বলতেন, 'মনে রাখিস পৃথিবীটা শুধুমাত্র মানুষের জন্য নয়।' সুন্দরবনকে বিদায় জানানোর আগে বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায় ছাড়াও কালুখাঁ, গাজি সাহেব সবাইকেই মনে মনে পেন্নাম ঠুকে বলে এলাম এই 'বন্যেরা বনে সুন্দর' প্রাণীগুলো তোমাদের জিম্মাতেই রইল প্রভু, দেখো এরা যেন পৃথিবী থেকে হারিয়ে না যায়।

শ্রাবণী ব্যানার্জীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির বাসিন্দা। বাংলা সাহিত্যের পাশাপাশি সঙ্গীতচর্চা ও ইতিহাস পাঠে জড়িয়ে আছে ভালবাসা। কৌতূহল এবং আনন্দের টানেই গত কুড়ি বছর ধরে বিশ্বের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত করে বেড়াচ্ছেন।

কেমন লাগল : - select -

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

# শিলাবতীর পাড়ে

সুদীপ্ত মজুমদার

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতই ঘুরতে বেড়িয়ে পড়াটা অনেকের মত আমারও জীবনের অঙ্গ হয়ে পড়েছে বহু বছর। এখন মনে হয় ওটাই জীবনে অক্সিজেনের কাজ করে। বন্ধু ও ছোট ভাইয়ের মত অজিত একদিন ফোন করে বলেছিল - দাদা টিকিট কেটে ফেলেছি, চলো গনগনি ঘুরে আসি। এক রাতের মামলা। মনে মনে ইচ্ছেটা ছিল অনেক দিনের কিন্তু কেন যেন যাওয়াটা আর হয়ে ওঠেনি। এবার শুধু দিনটা আসার অপেক্ষা। পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা টাউন আর তার কাছেইই গনগনি। কথিত আছে, অজ্ঞাতবাসের সময় মধ্যপাণ্ডব ভীম এই গনগনিতেই বকাসুরকে বধ করেন। গড়বেতা জুড়ে ছড়িয়ে আছে নানান দর্শনীয় মন্দির।

গত মার্চের নির্ধারিত দিনে বিকেল ৪টে ৫৫ মিনিটে পুরুলিয়া এক্সপ্রেস হাওড়া ছাড়ল। সিট রিজার্ভ করা আমাদের। দলও বেশ বড়ই, চব্বিশ জনের শক্তপোক্ত দল। ট্রেন ছুটল জোর কদমে, সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আড্ডা, গল্প। দেখতে দেখতে খড়্গপুর। বলা বাহুল্য দীর্ঘ বা মধ্য দূরত্বের ট্রেন সফরের অন্যতম আকর্ষণ টুকটাক মুখ চালানো - আর ভাজাভুজির প্রতি চিরকালই আমার কেমন যেন এক দুর্নিবার আকর্ষণ। তাই বার কয়েক চা-কফির সঙ্গে ডিমের ডেভিল, পকোড়া, ঝাল মুড়ির সঙ্গতে জমজমাট ব্যাপার। ওদিকে মেদিনীপুর পার করে গেছি। ঝাপসা অন্ধকার চিরে ট্রেন চলেছে, কাছে দূরে কখনও কখনও আলো দেখা যাচ্ছে। ঘড়িতে রাত ৮-১০, পৌঁছে গেলাম গড়বেতা। রাজনৈতিক নানা কারণে গড়বেতা নামটি খবরের শিরোনামে এসেছে বিগত বছরগুলিতে। আজ পা রাখলাম গড়বেতার লাল মাটিতে।

রাত্রিবাসের বুকিং ছিল 'আপ্যায়ন' লজে। মালিক বিপ্লববাবুই ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন গড়বেতা স্টেশন থেকে লজে পৌঁছবার। মারুতি ভ্যান, মিনিট দশেকের পথ, গাড়ি প্রতি ১০০ টাকা। নামলাম 'আপ্যায়ন'-এর দোড়গোড়ায়। অত্যাধুনিক না হলেও মোটামুটি ছিমছাম ব্যবস্থা। এসি, নন এসি দুরকমই ঘর আছে। ভাড়া ৯০০ টাকা ও ৩৫০ টাকা। খাদ্য-পানীয় সবই বিপ্লব বাবুর ব্যবস্থাপনা। আমিষ, নিরামিষ - ফিস ফ্রাই থেকে মোগলাই সবই পেতে পারেন আগাম বলে রাখলে। তবে বিরিয়ানি বা চাউমিন পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি!

গড়বেতার ইতিহাস কিন্তু যথেষ্ট প্রাচীন। নামকরণটিও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রচলিত মত হল, এর নাম ছিল বকদ্বীপ। আর বকদ্বীপ ছিল বকাসুরের রাজ্য বেত্রবতীর মধ্যে। ভীম বকাসুরকে বধ করার পর শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকা থেকে এসেছিলেন ভীমকে অভিনন্দন জানাতে। শ্রীকৃষ্ণকে সম্মান জানাতে যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি তৈরি করান। অনেকে বিশ্বাস করেন বর্তমান কৃষ্ণনগর গ্রামের শ্রীকৃষ্ণরাই জিউ এর মূর্তিটিই সেই মূর্তি।

আর একটি মত হল, এক বিশাল অঞ্চলের নাম ছিল বার্গাটাটি। বাংলার তৎকালীন শাসক সিহারুদ্দিন বুগ্রাশাহ-এর নামে নাম হয় 'বাগ্রি'। রাজা বিক্রমাদিত্য এসেছিলেন এই বাগ্রিতে। বাগ্রির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন এবং স্থানীয় দেবী সর্বমঙ্গলার অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে সর্বমঙ্গলা মন্দির নির্মাণ করেন। রাজা বিক্রমাদিত্যের সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী সর্বমঙ্গলা তাকে তাল-বেতালের উপর প্রভুত্ব করার বর দেন। বিক্রমাদিত্য ওই স্থানের নাম রাখেন বেতা। পরবর্তীকালে গুপ্ত যুগে এখানে তৈরি হয় একটি দূর্গ বা 'গড়'। কালক্রমে লোকমুখে নাম হয় গড়বেতা।

ফিরে আসা যাক বর্তমানে - আমাদের বেড়ানোর কথায় - পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূমের গরম তাদের নিজগুণে বিখ্যাত। তাই মার্চের শেষ হলেও ভাজা হওয়ার আশঙ্কাটা ছিলই। কিন্তু আমাদের কপাল ভাল, রাতে হাল্কা বৃষ্টি আর ভোরের সূর্যহীন আকাশ স্বস্তি দিল দারুণভাবে। সাত সকালে বেরিয়ে পড়লাম দেবী সর্বমঙ্গলা দর্শনে। দলের কেউ কেউ সর্বমঙ্গলাদেবীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে আগে থেকেই ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাই তাঁদের উৎসাহে দল বেঁধে চললাম দেবী দর্শনে। মিনিট পনেরোর হাঁটা পথ। আধা গ্রাম্য পরিবেশে মন্দ লাগার কথা নয়। মন্দির নির্মাণে ওড়িয়া স্থাপত্যের প্রভাব। এসি বসানো গর্ভগৃহ। পাথরের নাটমন্দির ও প্রশস্ত উঠোন। গেরুয়া রঙে রাঙানো সমগ্র মন্দির চত্বর। দেবী দর্শন ও প্রসাদ পাওয়া হল। মন্দিরের প্রবেশ পথের বাইরে বাঁধানো বটতলায় চা-পর্বের পর ফেরার পথ ধরলাম। লজে ফিরে চা-টোষ্ট-অমলেট সহযোগে ব্রেকফাস্ট পর্ব সেরে বেরিয়ে পড়লাম উল্টো পথে। লক্ষ্য গনগনি। অটো এবং টোটো পাওয়া যায়। ১০/১৫ মিনিটের হাঁটা পথ। আদিবাসীদের একটা ছোট্ট বসতি পার করে কাজুবাদামের বাগানের মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে লাল মাটির পথ। মাঝে মধ্যে স্থানীয়দের আসা-যাওয়া, কেউ হেঁটে, কেউ সাইকেলে। পথের শেষ শিলাবতী নদীর ধারে গনগনিতে। প্রথম দর্শনে শিলাবতীকে দেখে মনে হল কবিতা থেকে উঠে আসা সেই নদী -

আমাদের ছোটো নদী চলে বাঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে।
পার হয়ে যায় গোরু, পার হয় গাড়ি,
দুই ধার উঁচু তার, ঢালু তার পাড়ি।

হুবহু তাই-ই। মুগ্ধ বিস্ময়ে অনেক নীচে বয়ে চলা শিলাবতীকে দেখছি, আর দেখছি নদীর বুকের ওপর দিয়ে পার হওয়া গরুর পাল। ডান দিক, বাঁ দিক যেদিকেই দেখি হাজার হাজার বছরের স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা লাল, গেরুয়া মাটির পাহাড়। বিচিত্র, বিভিন্ন আকৃতি তৈরি হয়েছে প্রকৃতির আপন খেয়ালে। দূর থেকে মনে হয় ক্ষয়িষ্ণু কোনো বেলে পাথরের থাম, কোথাও গুহামুখ আবার কোথাও সুড়ঙ্গপথের শুরু যেন। বাঁধানো সিঁড়ি আছে নদীর পাড়ে নামার জন্য। অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দে কেউ কেউ ওই বিশাল রাঙামাটির পাহাড় ধরে নামেন, তবে সেটি বিপজ্জনক হতে পারে। শক্ত ঝুরো মাটিতে শরীরের ভারসাম্য রাখা বেশ কঠিন। যাই হোক নেমে এলাম নদীর পাড়ে। কোথাও কোথাও সবুজ ঘাসের গালিচা, নদীর বুকে চড়া, কোথাও হাঁটু জল, কোথাও বা কোমর সমান জল বয়ে চলেছে তির তির করে। ওদিকে মেঘের প্রভাব কাটিয়ে সূর্য ফিরছেন নিজের মহিমায়। দিব্যি মালুম হচ্ছে তার প্রভাব, তবে তখনও সহনীয়। সাঁতার কেটে কোনও নদী পার হবার অভিজ্ঞতা ইতিপূর্বে হয়নি আমার, তাই হাঁটু জল কেটে নদী পারাপারের লোভ সামলানো গেলো না, পৌঁছে গেলাম নদীর অপর পাড়ে। শক্ত বালিমাটির পাড়। মাঝে মাঝে ঘাসের ছোপ, কিছুটা এগিয়ে গেলে চাষের জমি আর এপাড়ে ছবির মত গনগনি - দ্য গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন অফ বেঙ্গল। ঘোরাঘুরি হল ইতস্তত, ফটো তোলার পালা আর বাচ্চাদের মত জলে দাপানো আর জল ছোঁড়াছুঁড়ি। হু হু করে সময় চলে গেল, ঘড়ি তখন একটার ঘর ছুঁয়েছে। ধীর পায়ে শিলাবতীকে বিদায় জানিয়ে সিঁড়ির পথ ধরলাম। উপরে উঠে একটাই মাত্র দোকান, ঠাণ্ডা জল, আইসক্রিম রাখে। শুনলাম এক সময় বসার জায়গা, শৌচালয়, খাবার জল সবই ছিল কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কোনটাই আজ নেই। একটা খুব ভাল ট্যুরিষ্ট স্পট পড়ে আছে সম্পূর্ণ অনাদরে।

দোকান মালিকই ফোন করে টোটো ডেকে দিলেন, জনপ্রতি ১০ টাকা। লজে পৌঁছে গেলাম কয়েক মিনিটে। দু'রকম মাছ দিয়ে দুপুরের খাওয়াটাও বেশ হল। ঘণ্টাখানেক বিশ্রামের পর গাড়ি এসে গেল স্টেশনে পৌঁছে দিতে। বিকেল ৬টায় ফেরার ট্রেন 'রূপসী বাংলা' আমাদের হাওড়া পৌঁছে দেবে রাত ৯টা ৩০ নাগাদ। পড়ন্ত সূর্যের আলোয়, হাজার পাখির কলরবে বিদায় জানালাম গড়বেতাকে। ইচ্ছে রইল কোনও এক শীতের সকালে আবার পা রাখব শিলাবতীর পাড়ে।

ইংরেজি সাহিত্য ও ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা সুদীপ্ত মজুমদারের। কিন্তু আসল নেশা বেড়ানো, ছবি তোলা আর লেখালেখি। ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ে আগ্রহ তীব্র।

কেমন লাগল : - select -

মত দিয়েছেন :

গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

# মণির খোঁজে মণিমহেশে

## সুদীপ্ত দত্ত

~ মণিমহেশ ট্রেক রুট ম্যাপ ~ মণিমহেশ ট্রেকের আরও ছবি ~

পাহাড়, নদী, সমুদ্রের সঙ্গে নিভৃতে সময় কাটানোর মধ্যে যে শান্তি তা ভাষায় বোঝানো খুব কঠিন। একবার সেই শান্ত প্রকৃতির স্বাদ পেলে দ্বিতীয়বার কি আর তাকে উপেক্ষা করা যায়? তাই সেপ্টেম্বরের পয়লা তারিখে জমানো ছুটি খরচ করেই বেরিয়ে পড়লাম নতুন এক পথে, হিমাচলের শেষ সীমানায়। অলিম্পকদার (আমরা ডাকি এডি) ২০১৮ পর্যন্ত এক সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার এটা দ্বিতীয় ধাপ, আগের বছর ২০১৪ তে অমরনাথ যাত্রার পর এবার মণিমহেশ। প্রতিটিই শিব ঠাকুরের স্মৃতি বিজরিত, মায়াময় এক দুর্গম ঠিকানা। আকারে খুব বড় নয়, সৌন্দর্যেও হয়তো মণিমহেশ লেকটি আর পাঁচটা সাধারণ লেকের থেকে আলাদা কিছু নয়, কিন্তু মায়াবী রূপ ও মহিমায় একে রাখা হয় মানস সরোবরের ঠিক পরেই। তাই এই লেক দেখার জন্য পর্যটক আর পুণ্যার্থীদের যে ভিড় হবেই তা আর আলাদা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু কলকাতায় বসে অনেক খুঁজেও এমন কাউকে পেলাম না যে এই পথে আমাদের গাইড করতে পারে। তাই অলিম্পকদার যোগাড় করা একটা গাইডবুক আর কিছুটা ইন্টারনেটের ওপর ভরসা করেই রওনা দিলাম।

### বিষণ্ণ এক নদী

হিমগিরি এক্সপ্রেস ঘন্টা চারেক লেট করে যখন পাঠানকোট পৌঁছল তখন ভর দুপুর। মণিমহেশ যাওয়ার প্রথম পদক্ষেপে আমাদের পৌঁছতে হবে ভারমোর। পাঠানকোট ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে পৌঁছে দেখি ট্যাক্সি ইউনিয়নের লোকেরা ইচ্ছেমতন দরকষাকষি শুরু করেছে যাত্রীদের সঙ্গে। ইন্টারনেটে দেখে এক ট্যাক্সি অপারেটরের খোঁজ পেয়েছিলাম, তাকে ফোন করে অনেক কম খরচেই ট্যাক্সি বুক করে নিলাম। ইউনিয়নের ঝামেলা এড়াতে গাড়ির মালিক নিজেই একটা রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আমাদের মণিমহেশ যাত্রার কথা শুনে বললেন, এ এক ভীষণ কঠিন যাত্রা, এমনকি অমরনাথ যাত্রার চেয়েও অনেক কষ্টকর। একটু অবাক হলাম, সঙ্গে কিছুটা অবিশ্বাস! গাইড বইয়ের বর্ণনার সঙ্গে কোনওভাবেই যেন মেলাতে পারলাম না। "মকাই কি রোটি" আর "সরষো কি শাগ"-এ বিকেলবেলা "লাঞ্চ" সেরে ভারমোরের পথ ধরলাম। গাড়ির ড্রাইভার পাপ্পুজি পাঞ্জাবি বৈষ্ণব। শিব ও বিষ্ণুর উপাসনামূলক প্রাণোচ্ছল পাঞ্জাবি ভক্তিগীতি শুনতে শুনতে এগিয়ে চললাম হিমাচল প্রদেশের ৩৩নং রাজ্য সড়ক ধরে। কিছুক্ষণ পরেই রাভী নদী যাত্রাপথের সাথী হল। রাভী, বাঙালির কাছে যা ইরাবতী নামেও পরিচিত, এক আপাত শান্ত নদী, অনেক বাঁধ ও জলাধার যেন তার প্রাণোচ্ছলতা ছিনিয়ে নিয়েছে। কখনও পাহাড়ের আড়াল আবার কখনও বা সুগভীর গিরিখাতে নিস্তরঙ্গভাবে বয়ে চলা ইরাবতীর বিষণ্ণতা যেন ছুঁয়ে গিয়েছিল হিমাচলের আকাশকেও। ঘন কুয়াশা আর মেঘলা আকাশে সন্ধ্যা নেমে এল বড় তাড়াতাড়ি। পথে মণিমহেশ যাত্রার তীর্থকর দেওয়ার জন্য গাড়ির লম্বা লাইন ও পরে ট্রাফিক জ্যামে পড়ে অনেকক্ষণ আটকে থাকতে হল। ভারমোর পৌঁছতে পৌঁছতে রাত সাড়ে দশটা।

### মণিমহেশের দোরগোড়ায়

হিমাচল সরকার অনুমোদিত যে হোম স্টে-তে উঠলাম সেখান থেকেই ভারমোর শহরটা শুরু। সামনের বাড়িঘরগুলোকে যেন পাহাড়ের গায়ে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। তাই শহরের পুরো ছবিটা চোখের সামনে ধরা পড়ে। সেপ্টেম্বরের শুরুতে শীত সেভাবে জাঁকিয়ে বসেনি, কিন্তু কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় শীতের আভাস স্পষ্ট। সেই ঠান্ডা উপেক্ষা করেই ছাদে চলে গেলাম রাতের শহরকে অনুভব করতে।
ভারমোরের রাত মায়াবী আলোয় ঝলমল। পাহাড়ের গায়ে যেন অজস্র জোনাকি একসঙ্গে মিটমিট করে জ্বলছে, আর সামনেই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য গাড়ির আলো এক সর্পিল রেখা তৈরি করেছে। রাতের পরিষ্কার আকাশে চাঁদকে যেন অনেক কাছে মনে হল, কলঙ্কগুলোও অনেক স্পষ্ট, আলো-আঁধারিতে রাস্তার একপাশে অতল খাদ আর অন্য পাশে খাড়াভাবে উঠে যাওয়া পাথুরে পাহাড় অনুভব করা যাচ্ছে। আলোর রেখা পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে দিগন্তে গিয়ে কোন এক পায়ে চলা পথ বেয়ে নেমে গেছে খাদের দিকে। শহরের উল্টোদিকের পাহাড়ে শুধুই অন্ধকার।

### ভারমণী মায়ের খোঁজে

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই ঘুম ভেঙে গেল। ভারমোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারমণী মাতার মন্দিরে যাওয়ার জন্য আগে থেকেই গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছে অলিম্পকদা। গাড়ি আসার তখনও ঢের দেরি দেখে একাই ক্যামেরা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মর্নিং ওয়াকে। সকাল ছ'টায় ভারমোরে তখনও রাতের অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি। দূরে কুচকুচে কালো 'মণিমহেশ কৈলাশ' পর্বতের চূড়া আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে। এখানে তা 'কৈলাশ' নামেই পরিচিত, তবে মানস সরোবরের কৈলাশ শৃঙ্গের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। রাস্তার পাশে খাদের কিনারায় গিয়ে নীচের দিকে তাকালাম। নীচে অনেক গভীরে জলের রেখার উপস্থিতি অনুভব করা যাচ্ছে। হঠাৎ চোখ পড়ল 'কৈলাশ' পর্বতের ওপর। এই পাহাড়ের পেছন দিক থেকে আস্তে আস্তে সূর্য উঠছে। মনে হল কেউ যেন পর্বতের চূড়ার পেছন থেকে অসংখ্য টর্চ ফোকাস করেছে আকাশের দিকে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ের ওপার থেকে রবিমামা উঁকি মারলেন, আর ভোরের আলো মুহূর্তের মধ্যে পুরো শহরকে আলোর বন্যায় ভাসিয়ে তুললো। কিন্তু এখানে সূর্যের আলোর তেজ খুব বেশি, খালি চোখে তাকাতেও যেন কষ্ট হচ্ছিল। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম মূল শহরের দিকে। যদিও গাড়ি বুক করাই আছে তবুও ভারমণী মায়ের মন্দিরের দিকে পায়ে হেঁটেই যাওয়ার ইচ্ছে হল। ভারমোর বাজারের কাছে এসে আশেপাশের লোকজনকে জিগ্যেস করে ভারমণী মাতার মন্দিরের পথ ধরলাম। পায়ে চলার পথ গাড়ি চলার পথের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা, দূরত্ব অনেকটাই কম। গাড়িপথ যেখানে প্রায় দশ কিলোমিটার সেখানে হাঁটা পথ মাত্র তিন-চার কিমি। ঝরনার আকারে নেমে আসা একটি পাহাড়ি নালার পাশ দিয়ে সিমেন্ট বাঁধানো পায়ে চলা পথ উঠে গেছে পাহাড়ের ওপর দিকে। সামনে কিছু দর্শনার্থীও একই পথ ধরেছেন। তাঁদের অনুসরণ করতে করতে উঠতে

থাকলাম।

সেপ্টেম্বর মাস, তাই পাশের আপেল বাগানও পরিপুষ্ট লাল আপেলে ভরা। কিছুদূর যেতেই গ্রাম শেষ হয়ে পাহাড়ি ঢাল শুরু হল, আর সিমেন্টের রাস্তা শেষ করে পাথুরে-মাটির পথ ধরতে হল। কিছুটা ওপরে উঠতেই ডান পাশের বিস্তীর্ণ নীল আকাশ আর পাহাড়ের সারি চোখের সামনে ভেসে উঠল। প্রকৃতির এই রূপকে প্রাণভরে না দেখে এগিয়ে যেতে মন চাইল না, দাঁড়িয়ে পড়লাম নির্জন পাহাড়ি পথে। বাঁদিক থেকে সবুজ গালিচার মত তৃণভূমি পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে, আর তার মাঝখান দিয়ে সরু আঁকাবাঁকা রেখা হয়ে এগিয়ে চলেছে পায়ে চলার পথ। সেই পথ কখনও সিমেন্ট বাঁধানো কখনও বা শুধুই মাটির। ডানদিকে এক বিশাল শ্যাওলা রঙের পর্বতশ্রেণি যেন মূর্তিমান দেওয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তবে প্রকৃতির সুন্দরতম অলংকার হল মেঘ-কুয়াশাহীন গাঢ় নীল আকাশ যা কলকাতার বাঙালির কাছে নিতান্তই দুর্লভ। এই সুন্দর প্রকৃতির বুকে দূরে পাহাড়ের কোলে দেখতে পেলাম এক ছোট্ট মন্দির। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই আবিষ্কার করলাম এই নিরিবিলি পথে আমি ছাড়া আর কোনও জনমানব নেই, যে দর্শনার্থীদের অনুসরণ করছিলাম তারা পাহাড়ি খাঁজের আড়ালে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। কিছুদূর এগিয়ে যেতেই পায়ে চলা পথ দুভাগ হয়ে গেল। পড়ে গেলাম চরম দোটানায়। তুলনামূলক চওড়া পথটি ধরেই ওপরের দিকে এগিয়ে চললাম। রাস্তাটি কখনও সর্পিল, কখনও সমকোণের আকৃতি, কখনও সিঁড়ির মত কখনও বা উটের কুঁজের আকার নিয়েছে। সামনে তাকাতেই চোখে পড়ল পাহাড়ের ওপরে দেবদারু গাছের সারি। মোবাইল নেটওয়ার্ক সব সময় পাওয়া যাচ্ছিল, তাই সম্পূর্ণ হারিয়ে যাওয়ার ভয় ছিল না। আরও অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে চোখে পড়ল একটি ভেড়ার পাল। মেষপালকের কাছে মন্দিরের পথ জিগ্যেস করতেই বলল আমি অনেকটা ঘুরপথে চলে এসেছি। তবে পেছনে ফিরে যেতে হবে না, এই পথে আরেকটু সামনে এগোলেই ভারমণী মায়ের মন্দির চোখে পড়বে। প্রকৃতির সৌন্দর্যে বিভোর হওয়ার খেসারত দিতে হল প্রায় দু'কিলোমিটার বেশি হেঁটে। এমন সময় অলিম্পকদা ফোন করে জানালো বুক করা গাড়ি আসেনি, অগত্যা হেঁটেই এই পথে রওনা হয়েছে। আমি বারবার বলে দিলাম কোনো গাইডকে সঙ্গে নিয়ে নিতে। একটু এগোতেই ভারমণী মাতার মন্দিরের রাস্তা চোখে পড়ল।

ভারমণী মাতার মন্দির

ভারমণী মাতার মন্দিরের দুটি প্রবেশপথ, প্রায় দু'ঘন্টা হেঁটে একটি পথে এসেছি, অপর পথটি তুলনামূলকভাবে ভারমোর থেকে কম দূরত্বের, যা আগেই ছেড়ে এসেছিলাম। দুটি পথেই আর্চের আকৃতির দুটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। প্রবেশদ্বারের সামনে এক সাধু দর্শনার্থীদের আশীর্বাদ করছেন। আমি মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলাম। সামনেই একটি ছোট সুইমিং পুল আর সেখানকার ঠান্ডা জলে ঝাঁপ দিয়ে স্নান করছে অগনিত পুণ্যার্থী। সকাল তখন আটটা, মন্দিরে তখনও ভিড় বিশেষ হয় নি। মণিমহেশের মেলার রেশ বজায় রেখে এখানেও তৈরি হয়েছে বেশ কিছু লঙ্গরখানা। একটা দোকান থেকে পুজোর সামগ্রী কিনে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে ভারমণী মায়ের পুজো দিলাম। এখানে পুজো দেওয়ার সময় ধূপ জ্বালানো হয় আর একটা জড়ির কাজ করা উত্তরীয় মায়ের পায়ে সমর্পণ করা হয়। পুজোর প্রসাদের জন্য যা নিবেদন করবেন তার কিছু অংশ মায়ের বেদিতে রেখে বাকি অংশ ফেরত দিয়ে দেওয়া হয়। প্রসাদ হিসেবে সাদা মুড়ি আর ছোট নকুলদানাই বেশি প্রচলিত। ভারমণী মাতার এখনকার মন্দিরের পেছনেই রয়েছে প্রাচীন মন্দিরটি। সেখানে এখন পুজো দেওয়া হয় না। মন্দির চত্বরের মাঝখানে রয়েছে একটি জলাশয়। পাহাড়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা জল একটি সুড়ঙ্গ দিয়ে সেখানে এসে পড়ছে, আবার অন্য একটি সুড়ঙ্গ দিয়ে সে জল বের হয়ে যাচ্ছে। আশেপাশের সমস্ত লঙ্গরখানা ও দোকানদার এই জল ব্যবহার করছে, ও অবশেষে সেই জল গিয়ে পড়ছে আগের দেখা সেই সুইমিং পুলে। মন্দির চত্বরের মাঝের এই জলাশয়েই আগে পুণ্যার্থীরা স্নান করতেন, কিন্তু এখন আর এখানে স্নান করতে দেওয়া হয় না। পুজো দিয়ে সামনের একটি লঙ্গরখানায় সকালের খাওয়া খেয়ে নিলাম। লঙ্গরখানায় সমস্ত খাওয়াই নিরামিষ, আর বিভিন্ন রকমের ডাল, আতপ চালের ভাত আর আচার মোটামুটি সব জায়গাতেই পাওয়া যায়। যত খাবার চাই তত খাবার বিনা পয়সায় দিতে এরা প্রস্তুত, কিন্তু খাবার নষ্ট করা একেবারেই নাপসন্দ। অলিম্পকদাকে ফোন করে জানতে পারলাম একটা গাড়ি পেয়ে গেছে এখানে আসার জন্য, এক দোকানদার তার গাড়িতে লিফ্ট দিয়েছেন, তবে পৌঁছতে এখনও অনেক দেরি। ফিরে গেলাম সেই দোকানে যেখান থেকে পূজার উপকরণ কিনেছিলাম। দোকানদারের কাছে জানতে চাইলাম ভারমোরের ইতিহাস। বললেন, ভারমোরের আদি নাম ব্রহ্মপুর। রাজা মেরুবর্মন এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা। তবে এর এক পৌরাণিক ইতিহাস জানাতেও ভুললেন না। সংক্ষেপে তা অনেকটা এরকম – শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভারমণী মাতা নিজে হাতে মনোরম এই শহরকে গড়ে তুলেছিলেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও পাহাড়ের অপর পাশে থাকা সন্ধোলা নাগের জলভাণ্ডার থেকে পবিত্র জল চুরি করে এনেছিলেন এই শহরের অধিবাসীদের কাছে সরবরাহের জন্য। ভগবান শিব চুরাশিজন সঙ্গী নিয়ে মণিমহেশ যাত্রার সময় ভারমণী মাতার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন। ভারমণী মাতা তাঁদের ভারমোরে থাকার অনুমতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর পাহাড়ের চূড়া থেকে শিবের অনুচরদের জ্বালানো আগুন ও ধোঁয়া দেখতে পান। প্রকৃতিপ্রেমী ভারমণী মাতা তখনই শিব ঠাকুরকে ভারমোর ছেড়ে যেতে নির্দেশ দেন। অবশেষে শিব তাঁর অনুচরদের এই শহরেই ছেড়ে খুব সকালে মণিমহেশের দিকে রওনা দেন। ভারমোরে চৌরাশির মন্দিরে সেই অনুচরদের চুরাশিটি সমাধি রয়েছে। শিবঠাকুরের ইচ্ছানুসারে ভারমণী মাতার মন্দিরের সামনের এই জলাশয়ে স্নান করে যাত্রা শুরু না করলে মণিমহেশ অভিযান সফল হলেও তা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ছেলে মারা যাওয়ার পর প্রকৃতিকন্যা ভারমণী মাতা মনের দুঃখে নিজেও সমাধিস্থ হন। ভারমোরে ভারমণী মাতা দেবী দুর্গা বা গৌরীর প্রাণোচ্ছল রূপ হিসেবে পূজিতা হন।

পৌরাণিক কাহিনিতে অনেক ক্ষেত্রে হিসেব মেলানো কঠিন হলেও তা যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছিল। কে জানে হয়তো ভারমণী মাতা ছিলেন কোনও দক্ষ স্থপতি, যিনি পাহাড়ের উল্টোদিকের লেক থেকে টানেল বানিয়ে ভারমোরে জলের যোগান দিয়েছিলেন! পুরো ভারমোরেই সাতটি ভূগর্ভস্থ জলধারা রয়েছে, যার অনেকেরই উৎপত্তি নিশ্চিত করে বলা যায় না। হয়তো একমাত্র ভারমণী মাতার কাছেই ছিল এই উৎসসন্ধান।

মন্দিরের পাশে পাহাড়ের ঢালে ধাপ কেটে কেটে অনেক পায়েচলা পথ উঠে গেছে। তার পাশে কিছুক্ষণ বসে রইলাম নিস্তব্ধ পাহাড়ের কোলে। একটু পরেই অলিম্পকদা পৌঁছে গেল মন্দিরে। কিন্তু তখন অসংখ্য দর্শনার্থীর ভিড়। অলিম্পকদা পুজো দিয়ে আসতে আসতে দুপুর প্রায় বারোটা। হেঁটে ফেরার জন্য তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত রাস্তাই বেছে নিলাম। আসার সময় এই রাস্তা খুঁজে পাই নি, কিন্তু এবার সবাই এই পথেই নেমে চলেছে। পায়ে চলার পথটি ধুলোময়, আর সৌন্দর্যে ওপরে যে পথে উঠেছিলাম তার চেয়ে অনেকটাই ম্যাড়ম্যাড়ে। তবে এই পথে বেশ কয়েকবার চোখে পড়ল মণিমহেশ কৈলাশ শৃঙ্গ। এ পথে আপেল বাগান ছিল, কিন্তু তা ওই পথের মত উন্মুক্ত নয়, তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। গোয়াল ঘর আর বসত বাড়ির মধ্য দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি শহরের কাছে পৌঁছে গেলাম। পথে পড়ল হেলিপ্যাড, এখান থেকেই মণিমহেশ যাওয়ার হেলিকপ্টার ছাড়ে, পৌঁছে দেয় গৌরীকুণ্ড পর্যন্ত। ফেরার পথে আমার "দামী" ট্রেকিং স্যু এর সুকতলা গেল খুলে! ভারমোরে পৌঁছে বাজারের কাছে এক মুচিকে পেয়ে গেলাম। পুরো শহরে মাত্র একজনই মুচি, তাই সকলের জুতো সারাইয়ের যাবতীয় দায়িত্বও তাঁরই। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম, যা হওয়ার ভারমোরে হয়েছে, মণিমহেশের পথে হয়নি।

মণিমহেশ যাত্রা উপলক্ষ্যে ভারমোরে লোকের মেলা। এই মেলা শুরু হয় জন্মাষ্টমীর দিন আর শেষ হয় রাধাষ্টমীতে। এই এক পক্ষকাল এখানে হোটেলগুলোতে তিল ধারণের যায়গা থাকে না। পুরো শহর জুড়ে তৈরি হয় অসংখ্য অস্থায়ী "লঙ্গরখানা"। বিনি পয়সায় খাবারের পাশাপাশি খুব দরকারে একরাত থাকার ব্যবস্থাও করে দেয় এঁরা। বছরের অন্য সময় এই শহরকে শহর বলেই চেনা যায় না, তখন ভারমোর যেন আড়ম্বরহীন, নিরিবিলি এক ছোট্ট পাহাড়ি লোকালয়। শহরের বাসস্ট্যান্ডকে কেন্দ্র করে কিছু দোকানপাট তৈরি হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের এটিএম থাকলেও এই সময় অধিকাংশই অর্থশূন্য। হোম স্টের সবচেয়ে কাছের লঙ্গরখানা থেকেই রাতের খাবার খেয়ে নিলাম। এখানে বিভিন্ন রকমের ডাল, ভাত আর

সবজির পাশাপাশি দেওয়া হচ্ছে গরম গরম জিলিপি!

## মোটরপথের শেষ সীমানায়

পরদিন খুব সকালেই বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছে ছিল মণিমহেশের পথে। প্রথমে আমাদের পৌঁছতে হবে হাদসার, সেখান থেকেই শুরু হবে পায়ে চলা পথ। সেই মত হোম স্টের ম্যানেজারকে বলে গাড়ির বন্দোবস্তও করা ছিল। কিন্তু প্রথমতঃ গাড়ি আসতে একটু দেরি হল, আর তারপর সঙ্কুল পাহাড়ি পথের ট্র্যাফিক জ্যামে পড়ে আধঘন্টার পথ দেড় ঘন্টায় পাড়ি দিয়ে হাদসার পৌঁছতেই বেজে গেল সকাল দশটা। হাদসারকে শহর না বলে গ্রাম বলাই ভাল। আসলে এখানে জনবসতি খুবই কম, রাস্তার পাশে গুটিকতক বাড়ি আর মণিমহেশ যাত্রা উপলক্ষ্যে অল্প কয়েকটি দোকান। একটা বাস স্ট্যান্ড আছে যা ভারমোরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে, এই মেলার সময় ভিড় থাকলেও অন্য সময় যাত্রীর দেখা পাওয়া যায় না। বাস স্ট্যান্ডের পাশেই একটা ধাবা, যেখানে সামান্য কিছু খাবার পাওয়া যায়। পথেরও শেষ প্রান্ত যে থাকতে পারে তা এখানে এসে উপলব্ধি করলাম। গাড়িগুলো এখান থেকেই আবার ফিরিয়ে নেওয়া হচ্ছে ভারমোরের দিকে। এখান থেকে দুটি পায়ে চলার পথের একটি চলেছে কুগতি পাসের দিকে, আর অপর একটি পথ মণিমহেশে। বেশ কয়েকটি সিঁড়ি ভেঙে পৌঁছলাম মণিমহেশ যাত্রার প্রধান তোরণের সামনে। মাথার ওপর ঝোলানো মস্ত এক ঘন্টা বাজিয়ে যাত্রা শুরু করছে সবাই। নীচে এক সুন্দর জলধারা বয়ে চলেছে। মণিমহেশ লেক থেকে বেরিয়ে এই নালা গিয়ে মিশেছে আমাদের পরিচিত রাভী নদীতে। খরস্রোতা এই জলের রেখা মণিমহেশ থেকে হাদসার পর্যন্ত ধঞ্চো নালা নামে পরিচিত, এর পর রাভী পর্যন্ত তা বুধিল নদ। একটু খোঁজ করতেই মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পোর্টার পেয়ে গেলাম। আমার পোর্টার কাম গাইড তালেব হুসেন, জম্মুর লোক। মণিমহেশ যাত্রা উপলক্ষ্যে এখানে এসেছে কিছু রোজগারের আশায়। অলিম্পকদার রুকস্যাক বয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বৃদ্ধ লালদিনের। সেও তালেবের "দেশের লোক"। অলিম্পকদা ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হবে বলেই ঠিক করল, তাতে সময় অনেকটাই বাঁচবে। আমি হেঁটে যাব বলেই মনস্থির করলাম। ঠিক হল, অলিম্পকদা গৌরীকুণ্ডে পৌঁছে আমার জন্য অপেক্ষা করবে, আর অলিম্পকদার মালপত্র নিয়ে লালদিন তো যাবে আমার সঙ্গেই। হাদসারে যাত্রাপথ দুটি তলায় ভাগ করা, সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওপরের রাস্তা দিয়ে যে পথে আমরা যাত্রা শুরু করলাম তার দু'ধারে দেবদারু গাছের সারি। নীচের রাস্তাটা ধঞ্চো নালার পাশ দিয়ে কিছুটা এগিয়ে এই রাস্তার সঙ্গেই এসে মিশেছে। ওপরের রাস্তার ধারে কিছু সাধু সন্ন্যাসী দুহাত তুলে আশীর্বাদ বিতরণ করছে, কিন্তু পছন্দমত দক্ষিণা না পেলে শাপ-শাপান্ত করতেও ছাড়ছে না। আমরা খুব সতর্কভাবে তাদের নজর এড়িয়ে এগিয়ে চললাম। হাদসার থেকে মণিমহেশ লেক প্রায় চৌদ্দ কিলোমিটার। এতটা পথ চলার জন্য একটি সস্তার কাঠের লাঠিও কিনে নিলাম।

ধঞ্চোর কাঠের সাঁকো

হাদসারে ধঞ্চো নালা পাথরের ওপর দিয়ে প্রবল স্রোতে বয়ে চলেছে। সবরকম শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাচ্ছে তার গর্জন। এখানে ধঞ্চো নালার খুব কাছে পৌঁছানো যায়, ছোঁয়া যায় তার বরফশীতল জল। আমার জলের বোতলে সেই জল ভরে নিলাম, আর তাতে দু'ফোটা জিওলিন। প্রকৃতির দেওয়া কোল্ড ড্রিঙ্কস পান করার এই সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়?

শুরুতে নিজের রুকস্যাক নিজের পিঠে নিয়েই চলতে শুরু করলাম। আমার ধারণা ছিল পথ অতটা কঠিন নয়। তাই তালেবকে বললাম "যতক্ষণ পারি আমি নিজেই নিজের বোঝা বহন করি, ততক্ষণ তুমি আমার গাইড। হাঁপিয়ে গেলে ব্যাগটা তোমায় দিয়ে দেব। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই আমায় ছেড়ে আগে আগে চলে যাবে না"। ফলতঃ তালেব পাশে পাশে খালি হাতেই হেঁটে চলল, আর একটু পড়ে পড়েই আমার কাছে ব্যাগ চাইতে লাগল। আরও সমস্যা হল অন্যান্য পোর্টাররা তালেবের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইতে থাকল আর তালেব মনে মনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। কিছুটা এগিয়ে একটু দম নেওয়ার জন্য থমকে দাঁড়ালাম, একটু ছায়া দেখে পিঠের রুকস্যাকটা পাশে রাখতেই তালেব সেটা তুলে নিল নিজের পিঠে। এরপর পুরো রাস্তায় সেটা আর বইতে দেয় নি।

## ভগবান বিষ্ণুর সাজানো বাগান

মণিমহেশ যাত্রার একদম শুরুর দিকে আমরা রওনা দিয়েছিলাম, তাই পথের সব জায়গায় দোকানপাট তখনও তৈরি হয় নি। তিন-চার কিলোমিটার হেঁটে দোনারি বলে একটি যায়গায় গুটিকয়েক দোকান খুঁজে পেলাম। এখানে এখনও লঙ্গরখানা বসেনি। চলার পথ মোটামুটি সমতল, কিছুটা ধুলোময়। আর পাশ দিয়ে চলা ধঞ্চো নালার গর্জনে নিস্তব্ধতাও ভেঙে খান খান। পথে পুণ্যার্থীর সংখ্যাও নেহাত কম নয়। একটু পরেই যা দেখতে পেলাম তাতে এক নিমেষেই সমস্ত সাহস কোথায় যেন কর্পূরের মত উবে গেল। নীচ দিয়ে পাথুরে খাদে বয়ে গেছে সেই নালা, আর ওপরে রেলিং-বিহীন এক কাঠের সাঁকো। সেই সাঁকো পেরিয়ে যেতে হবে নালার অপর পাড়ে আর তা দিয়ে পিলপিল করে হেঁটে চলেছে অসংখ্য যাত্রী আর ঘোড়া-খচ্চরের পাল। একটা ছোট্ট ধাক্কা বা শরীরের ব্যালেন্সে একটু গোলমাল হলেই সরাসরি নীচের পাথরের ওপর পড়তে হবে। সাঁকো পেরোনোর আগে অনেক্ষণ ধরে সাহস অর্জন করলাম, অনেক ছবি তুললাম। তারপর দেখতে পেলাম দু'পা কেটে বাদ যাওয়া এক প্রতিবন্ধী স্রেফ হাতে ভর দিয়েই রওনা হয়েছে মণিমহেশের পথে। অবলীলায় সে এগিয়ে চলল সাঁকো বেয়ে। তাকে অনুসরণ করে নির্বিঘ্নেই অপর পাড়ে পৌঁছে গেলাম।

প্রতিবন্ধী মণিমহেশ যাত্রী

এপাড়ে নালাটি পাথরের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এক নদীর আকার নিয়েছে। আর সেই পাথরের ওপর বেশ কয়েকজন নেমে শিবের নামগান করছে আর দুহাত তুলে নাচছে। কিছুটা এগিয়ে যেতেই পৌঁছে গেলাম ধঞ্চো গ্রামে। এখানে কিছু জনবসতি আছে। তবে এই মেলার সময় লঙ্গরখানা আর গ্রামের ঘরবাড়ি আলাদা করে চেনার উপায় নেই। যাত্রাপথে ধঞ্চোই প্রথম বিশ্রামস্থান। অনেকেই এখানে রাতে থেকে পরদিন আবার যাত্রা শুরু করেন। তাই রাত কাটানোর জন্য অনেক টেন্ট রয়েছে। তার অনেকগুলি একেবারে ধঞ্চো নালার পাশেই। তৈরি হয়েছে অনেক অস্থায়ী পাবলিক টয়লেট। ঘড়ির কাঁটায় তখন দুপুর দেড়টা। একটা লঙ্গরখানা থেকে রাজমার ডাল, ভাত আর সুন্দর গন্ধযুক্ত এক তরকারি দিয়ে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে হর-পার্বতী সেজে বহুরূপী দুটি শিশুও চেটেপুটে ডালভাত খেয়ে নিল। ওরা স্থানীয় গাদ্দি অধিবাসী, বছরের এই ক'টা দিন খাওয়ার জন্য চিন্তা করতে হয় না, অন্য সময় ভেড়ার পাল চড়িয়েই দিন কাটে। দুর্গম অঞ্চল হওয়ায় খাবার সব সময় পৌঁছায় না। আর শীতে তো পুরোটাই বরফে ঢেকে যায়। লঙ্গরখানাটি স্থানীয় কাংড়া উপত্যকার একটি ক্লাবের। ওদের কাছেই জানতে পারলাম, ধঞ্চো আসলে ভগবান বিষ্ণুর বাগানবাড়ি। কেউ কেউ একে 'বৈকুণ্ঠধাম'ও বলে। শীতের ছ'মাস শিব ঠাকুর মণিমহেশের বাসস্থান ছেড়ে সমতলে চলে যান। তখন তিনি এই পার্বত্য অঞ্চল দেখভালের দায়িত্ব দিয়ে যান ভগবান শ্রীবিষ্ণুর হাতে। হাতে সময় কম, তাই খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে পাহাড়ি পথ ধরে এগিয়ে চললাম।

যত ওপরের দিকে উঠছি প্রকৃতি যেন অনেক বেশি সুন্দর হয়ে উঠছে। ধঞ্চো নালা পাথরের ওপরে আরও খরস্রোতা আর ধবধবে সাদা জলের ধারায় পরিণত হচ্ছে। চারদিক খোলা একটি পাহাড়ের ওপর এসে নির্বাক হয়ে সামনে চেয়ে রইলাম। সামনের পাহাড়ের ওপর থেকে অনেকগুলো ছোট ছোট ধাপে ধঞ্চো নালা নেমে এসেছে সমতলে। প্রত্যেকটি ধাপই এক একটা ছোট জলপ্রপাত। ধঞ্চোর লঙ্গরখানাতেই শুনেছিলাম পুরাণ অনুসারে শিব একবার ভস্মাসুরের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে তাকে এক প্রাণঘাতী বর দিয়ে ফেলেন, সে যার মাথাই স্পর্শ করবে সে মুহূর্তে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু চতুর ভস্মাসুর প্রথমেই তা স্বয়ং শিবের ওপর প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়। বিপদ বুঝে শিব ঠাকুর পালিয়ে ধঞ্চোর এই জলপ্রপাতের আড়ালে থাকা এক গুহায় আশ্রয় নিয়ে ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু মোহিনীর রূপ ধরে নর্তকী রূপে ভস্মাসুরের সামনে আবির্ভূত হয়ে নাচের ভঙ্গীমায় ভস্মাসুরকে নিজের হাত নিজের মাথায় রাখতে বাধ্য করেন। সঙ্গে সঙ্গে ভস্মাসুর নিজেই ভস্মে পরিণত হয়।

জলপ্রপাতের দুপাশ দিয়ে দুটো রাস্তা সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলেছে মণিমহেশের দিকে। বাঁদিকের পাহাড়ি ঢাল বেয়ে যে পথে যেতে হবে, সে পথ সর্পিল রেখা হয়ে ওপরে উঠে গেছে, আর সেই পায়ে চলা পথের দুপাশে হলুদ ডেইজি ফুলের চাদর বিছানো। ভগবান বিষ্ণু নিজে হাতেই যেন তার প্রিয় বাগানবাড়িটি সাজিয়ে রেখেছেন।

## মেঘের দেশের নায়ক

'বৈকুণ্ঠধামে' সর্পিল চড়াই

ধঞ্চো পেরিয়ে চড়াই পথ পরপর সর্পিল বাঁক নিয়ে ওপরে, অনেক ওপরে উঠেছে। নীচ থেকে ঘাড় ওপরে তুলে তাকালে শুধু পথ চলতি মানুষের রেখা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেই রেখা যে কতটা ওপর পর্যন্ত পৌঁছেছে তা ঠিক বুঝে ওঠা যাচ্ছে না, পাহাড়ের ওপরে একটি বিন্দুর আকারে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। এতটা চড়াই দেখেই আমার গলা শুকিয়ে এল। কিন্তু জল কোথায়? সে তো তালেবের কাছে আমার রুকস্যাকে। অনেক ঘাড় ঘুরিয়েও তালেবের দেখা পেলাম না, পথ চলতি মানুষের স্রোতে কোথাও হারিয়ে গেছে। অগত্যা তেষ্টা চেপে রেখে বৃদ্ধ লালদিন আর আমি চড়াই বেয়ে ওপরে উঠতে থাকলাম। খুব আস্তে, কিন্তু না থেমে একটানা আধঘন্টা হেঁটে ওপরে উঠে এলাম। দেখলাম তালেব আগেই সেখানে পৌঁছে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমাদের নীচে রেখে চলে আসার জন্য আমি দু'কথা শুনিয়েও দিলাম। শেষমেশ ঠান্ডা জলে গলা ভিজিয়ে আমার রাগ কমল। শিব ঠাকুরের প্রতিটি দুর্গম তীর্থক্ষেত্রে ক্লান্তি এড়াতে পুণ্যার্থীরা বিভিন্ন শ্লোক উচ্চারণ করে। কোথাও "ব্যোম ভোলে", "জয় ভোলে", আবার কোথাও "ভোলে বাবা পার করেগা..." কিংবা "হর হর মহাদেব..."। এখানে শ্লোকটি একটু আধুনিক, "এক দো তিন চার, ভোলে নাথ কি জয় জয়কার..."।

এর পরের পথ অনেকটাই সমতল, চড়াই প্রায় নেই বললেই চলে। কিন্তু সেই পথ অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে, পথে কোথাও দোকান-পাট বা লঙ্গরখানাও নেই। অনেকক্ষণ পর দেখতে পেলাম পাহাড়ের পাথর কেটে একটি চাতাল তৈরি করে সেখানে একটি শিবলিঙ্গের পুজো করা হচ্ছে। এই উপাসনাকক্ষটিকে অস্থায়ী বলে মনে হল না। বুঝলাম কাছাকাছি কোন গ্রাম রয়েছে যেখানকার লোকেরা নিয়মিত এখানে পুজো দিয়ে থাকে। আর কিছুটা এগিয়ে পাহাড়ের গায়ে একটা বাঁক ঘুরতেই পৌঁছে গেলাম একটি বড় লোকালয়ে। এই গ্রামের নাম সুন্দরাসী। এখানেও বসেছে অসংখ্য লঙ্গরখানা, তবে সংখ্যায় ধঞ্চোর থেকে অনেক কম। যাত্রাপথে এপর্যন্ত সবচেয়ে কঠিন পথ পেরিয়ে এসে যে একটু বিশ্রাম নেব সে উপায় নেই। ঘড়িতে তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা। তালেবকে জিগ্যেস করলাম - "আর কত দূর?" জবাব এল - "আউর স্রেফ দো-তিন কিলোমিটার বাকি।" মনে মনে হিসেব করলাম, আমার যা চলার গতি তাতে এই রাস্তা যেতেই দু'ঘন্টা লেগে যাবে।

পাহাড়ের ওপরের দিকে চেয়ে দেখলাম ধূসর জলভরা মেঘ ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে। বুঝলাম বৃষ্টি আসন্ন। তালেবকে জিগ্যেস করলাম এই অবস্থায় এগনো কতটা নিরাপদ? বলল - "বাবু, চিন্তা মত কিজিয়ে, হামলোগ জলদি পৌঁছ যায়েঙ্গে।" গৌরীকুণ্ড আমরা নাকি এক ঘন্টাতেই পৌঁছে যাব। আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে তখনই সেখান থেকে বিদায় নিলাম। সুন্দরাসী থেকে দু'টো পথ চলে গেছে গৌরীকুণ্ডের দিকে। দূর থেকে ওপরের পথে সাদা বরফের মত কিছু একটা পড়ে থাকতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু আমরা চললাম নীচের পথ ধরে। এপথে যাত্রী অনেক কম, আর ঘোড়া বা খচ্চর কিছুই নেই। আমি তালেবকে জিগ্যেস করলাম এই পথে কোনও বিশেষ সুবিধা আছে? উত্তর এল - "হাঁ বাবুজি, ইসমে টাইম বহুত কম লাগতা হ্যায়"। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম বৃদ্ধ লালদিনও ওপরের পথই ধরল। কিছুটা যেতে না যেতেই পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসা মেঘ আমাদের ঘিরে ধরল। রেইন কোটটা তালেবের পিঠের রুকস্যাকে, কিন্তু এই টিপটিপে বৃষ্টিতে তা আর বের করতে ইচ্ছে করল না। রাস্তার পাশে দেখতে পেলাম প্লাস্টিকের জামা-প্যান্ট বিক্রি হচ্ছে। বৃষ্টি মাথায় নিয়েই যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এগিয়ে চললাম। একটু

এগোতেই রাস্তা আর খুঁজে পেলাম না। দেখলাম তালেব সরাসরি পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠছে। অনেকটা রক-ক্লাইম্বারদের মত কখনো কখনো হাত দিয়ে পাথর আঁকরে ওপরে উঠে যাচ্ছে। হাতের লাঠিটায় কোনো হাতল না থাকায় হাতে কেমন যেন চিনচিনে ব্যথা করছিল। তাড়াতাড়ি পথ চলতে গিয়ে কিছুটা হাঁপিয়েও উঠেছিলাম। তার ওপর বৃষ্টিতে পাথুরে পথ যেমন পিছল তেমনি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। পাথরের ওপরে পা রাখতেও ভয় হচ্ছিল, নীচের দিকে তাকাতেও সাহস হচ্ছিল না - মাথা ঘুরে যাওয়াও অস্বাভাবিক নয়। বেশ কিছুটা ওপরে গিয়ে তালেব আমার করুণ অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারল। পাথর বেয়ে আবার নীচে নেমে এল আমায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। পিঠে রুকস্যাক আর এক হাতে আমায় প্রায় টানতে টানতে ওপরে নিয়ে চলল। একটু পরেই দেখতে পেলাম বিদ্যুতের ঝলকানি, সশব্দে বাজ পড়ল খুব কাছেই। খোলা আকাশের নীচে সাড়ে তিন হাজার মিটার পাহাড়ের ওপরে বৃষ্টি আর বজ্রপাত আর যাই হোক খুব একটা উপভোগ্য বলে মনে হল না। অনেক কষ্টে পাথুরে পথ পেরিয়ে পায়ে চলা পথের সন্ধান পেলাম। তালেবের কাছে জানতে পারলাম এই পথই হল "বান্দরঘাটি"। প্রায় বাঁদরের মত দেয়াল বেয়ে উঠতে হয় বলে পথটির এই নাম। বেজায় কঠিন বলে অধিকাংশ অভিযাত্রীই এপথে আসতে চায় না। পথের পাশে একটা ছাউনি দেওয়া দোকান দেখতে পেলাম, কিন্তু সেখানে আগে থেকেই অনেক অভিযাত্রী জড়ো হয়েছে, তিল ধারণের জায়গাও নেই। অগত্যা তালেব আমাকে কখনও টানতে টানতে, কখনও বা উৎসাহ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। কিন্তু কনকনে ঠান্ডা হাওয়ায় আর প্রচণ্ড পরিশ্রমে আমি তখন নিস্তেজ হয়ে পড়েছি। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, পায়ে চলার পথও বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। শুধুই তালেবকে অনুসরণ করে চললাম, আর একটু পরেপরেই জিগ্যেস করতে লাগলাম - "গৌরীকুণ্ড আর কত দূর?" আর একটাই উত্তর পেলাম - "বাস, আউর থোড়া..."। পাহাড়ের প্রায় মাথায় পৌঁছে দেখতে পেলাম ঘোড়ার লাইন। একটু পরেই চোখে পড়ল একটা টেন্টের টিমটিমে আলো, বুঝতে অসুবিধা হল না যে গৌরীকুণ্ড আর বেশি দূরে নয়।
ভগবানে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের প্রশ্ন আমি সব সময়ই এড়িয়ে যাই। যাকে কোনোদিন দেখিনি তার সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা আমার সাজে না। কিন্তু তালেব যেন ভগবানের দূত হয়ে আমার কাছে এসে আমার জীবনের রক্ষাকর্তা হয়ে উঠেছিল। সারা জীবনের জন্য আমি ওর কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।

বান্দরঘাটির চড়াই

## শান্তির ঠিকানায়

পাহাড়ের ওপর একটা সমতল জায়গা - গৌরীকুণ্ড। বান্দরঘাটির চড়াই পেরিয়ে ওপরে উঠে ঘোড়া-খচ্চরের সারি, অসংখ্য টেন্ট আর লোকারণ্যের মাঝে মুহূর্তে যেন হারিয়ে গেলাম। ঘড়ির কাঁটায় তখন প্রায় সোয়া সাতটা, এই জনসমুদ্রে অলিম্পকদাকে খুঁজে পাওয়া এক দুঃসাধ্য কাজ। তবে আমাদের মধ্যে এক অলিখিত সমঝোতা আছে, সাধারণত প্রধান ফটকের সামনে বা অনুসন্ধান কেন্দ্রের কাছে আমরা একে অন্যের জন্য অপেক্ষা করি। এক্ষেত্রেও আমায় কোনও সমস্যায় পড়তে হল না, প্রবেশপথ বলে আলাদাভাবে কিছু না থাকলেও, সমস্ত পথ এক জায়গায় এসে মিশে গৌরীকুণ্ডে ক্যাম্প এরিয়ায় প্রবেশ করেছে। সেই সংযোগস্থলের ঠিক মুখেই যে টেন্ট রয়েছে তাতেই একটা বেঞ্চের ওপর অলিম্পকদা বসে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল, আমি পৌঁছতেই একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বুঝতে পারলাম আমার দেরি দেখে চাপা টেনশনে ভুগছিল।
গৌরীকুণ্ড মণিমহেশের আগে শেষ ক্যাম্প, পথে পাওয়া ক্যাম্পগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড়। অলিম্পকদা দুপুর দেড়টায় এখানে পৌঁছে আমাদের থাকার জন্য একটা টেন্ট বুক করে রেখেছে। ভিজে সপসপে শরীরটা নিয়ে কোনও রকমে টেন্টের বিছানায় আশ্রয় নিলাম। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসার মত ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম, ক্লান্ত শরীরে ভিজে জ্যাকেট ছেড়ে স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে আশ্রয় নিতেও খুব কষ্ট করতে হল। টেন্টে সার বেঁধে পরপর অনেকগুলো বিছানা পাতা। একসারি বিছানা মাটি থেকে কিছুটা ওপরে, সম্ভবতঃ নীচে খাট রয়েছে আর তাতে গদি পাতা, তাই ভাড়াও কিছু বেশি, বিছানা পিছু ৩০০-৫০০ টাকা, আর মাটিতে পাতা বিছানা অপেক্ষাকৃত সস্তা ১৫০-২০০ টাকা। তবে ভিড় অনুযায়ী এই দামের হেরফের হয়। অন্ধকারাচ্ছন্ন টেন্টে চেয়ে চিন্তে একটা লম্ফ জোগাড় করা গেল, তার টিমটিমে আলোতে শুধু আমাদের বিছানার সামনেই যা একটু আলোর আভা দেখা গেল কিন্তু তা টেন্টের শেষ মাথা অবধি আর পৌঁছাল না। এদিকে অলিম্পকদার ব্যাগ নিয়ে লালদিন তখনও এসে পৌঁছায় নি। তালেব চলল তার সাথীকে খুঁজতে। কিছু পরেই দুজনে হাসিমুখে এসে দাঁড়াল। ব্যাগ বওয়ার জন্য ছ'শো টাকা করে দেওয়ার কথা থাকলেও আমরা এক হাজার টাকা করে দিয়ে দিলাম, আর ঠিক হল পরদিন ফিরে যাওয়ার সময়ও ওরাই আমাদের ব্যাগ বয়ে নিয়ে যাবে। দুজনেই খুব খুশি হয়ে আমাদের 'খোদা হাফেজ' জানিয়ে চলে গেল। টেন্টের আলো-আঁধারিতে দু'চোখ জুড়ে ঘুম নেমে এল।

## মায়াবী সেই হ্রদ

ক্লান্তি সত্ত্বেও রাতে বেশ কয়েকবার ঘুম ভেঙে গেল। একবার টেন্টের বাইরে গিয়ে দেখি সেখানে আরও অনেকেই টর্চ হাতে বেরিয়ে এসেছে। আকাশের দিকে চেয়ে তারাগুলোকে যেন খুব কাছে মনে হল। পূর্ণিমা নয়, কিন্তু পরিষ্কার আকাশে জ্যোৎস্নার আলো একাই সব অন্ধকার দূর করে দিয়েছে। টর্চ বন্ধ করে যে পথে এসেছিলাম সেদিকে একটু এগিয়ে গেলাম। সার বেঁধে ঘোড়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে নিচ্ছে। আর কিছুটা এগিয়ে যেতেই বান্দরঘাটির ঢালু পথ দেখতে পেলাম। ফিরে আসতে গিয়ে টেন্ট হারিয়ে ফেললাম। বেশ খানিকক্ষণ খোঁজার পর সেই টিমটিম করে জ্বলা লম্ফই টেন্টটিকে চিনিয়ে দিল।
ঘুম থেকে উঠেই আমরা ব্যাগ গুছিয়ে নিলাম। অলিম্পকদা ঘোড়ার ব্যবস্থা করল, প্রথমে তারা আমাদের মণিমহেশ লেক পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, এরপর আমাদের হাদসার পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার দায়িত্বও ওদেরই। ব্যাগ বয়ে নেওয়ার জন্য তালেব আর লালদিনের খোঁজ পড়ল, কিন্তু কোথায় তালেব, সে এই সাতসকালেই রওনা হয়ে গেছে হাদসারের পথে, অন্য কোন পর্যটকের পথের সাথী হয়ে। ঠিক হল লালদিন একাই দুজনের রুকস্যাক বয়ে নিয়ে যাবে।
মণিমহেশ লেক এখান থেকে বিশেষ দূরে নয়, কিলোমিটার খানেক হবে। গৌরীকুণ্ডের হেলিপ্যাডকে পাশে রেখে একটি কাঠের সাঁকো পেরিয়ে অপর পারে পাহাড়ের ওপরে মিনিট পনেরো ঘোড়ার পিঠে চড়ে যেতে যেতেই পৌঁছে গেলাম লেকের দোরগোড়ায়। মণিমহেশ লেকটা অনেকটা গোলাকার, কোমর উচ্চতার পাথরের পাঁচিলে ঘেরা, তার চারদিক দিয়ে বাঁধানো পাথরের রাস্তা। আকারে খুব বড় নয়, সাধারণ পাহাড়ি লেকের মতই এর বিস্তৃতি, কিন্তু সামনে দাঁড়িয়ে থাকা মণিমহেশ কৈলাশ পাহাড়ের চূড়া এই লেকের সৌন্দর্য অনন্যসাধারণ করে তুলেছে। অসংখ্য তাঁবু খাটানো হয়েছে লেকটিকে ঘিরে, বসেছে অনেক দোকানপাট। একটি দোকান থেকে আমরা পুজোর সরঞ্জাম কিনে নিলাম।

সকাল তখন সোয়া সাতটা, ভোরের আলো তখনও ফোটে নি। এদিন জন্মাষ্টমী, মণিমহেশ মেলার প্রথম দিন। লেকের পাশেই চলছে হর-পার্বতীর পুজো, সঙ্গে রয়েছে বাসুকী নাগ। পাশে কৈলাশ পর্বতের দিকে মুখ করে রয়েছে পাথরের ওপর সাদা রঙ করা শিবের বাহন নন্দীর মূর্তি আর তার সোনালী এক ধাতব প্রতিকৃতি। একটু পরেই সূর্যোদয়ের সময় হল, সবার নজর কেড়ে নিল এতক্ষণ আঁধারিতে দাঁড়িয়ে থাকা কৈলাশ পর্বত। সূর্য আবির্ভূত হল এই পর্বতের ঠিক পেছনে। প্রথমে পর্বতের পেছনে দেখা গেল এক দিব্য জ্যোতি। ধীরে ধীরে সেই আলোর উৎস ক্রমশঃ ওপরে উঠতে থাকল। পর্বতের মাথার ওপর হালকা সাদা মেঘ অনেকক্ষণ ধরেই ভেসে বেড়াচ্ছিল। এক সময় কৈলাশের চূড়ার ছায়া পড়ল সেই সাদা মেঘের ওপর, তাতে মেঘের ওপর যেন জটাধারী শিবের এক প্রতিকৃতি ফুটে উঠল। লক্ষ্য করলাম ভাবাবেগে আবিষ্ট অলিম্পকদার দু'চোখ বেয়ে নেমে এসেছে জলের ধারা, জিগ্যেস করলাম "কি হল? চোখে জল কেন?" জবাব এল - "ওপর দিকে চেয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছ না!" অনেকক্ষণ সেদিকে চেয়েও আমার চোখে বিশেষ কিছুই এল না, বুঝলাম আমার যুক্তিবাদী মনের স্তর এতটাই পুরু যে অনেক অপার্থিব অলৌকিক দৃশ্যও কোনও বিশেষ অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই যে দুর্লভ, দৈব ছবি অলিম্পকদার চোখে ধরা পড়েছে, আমার চোখে তা অধরাই রয়ে গেল। অগত্যা সেই পাহাড়চূড়ার অনেক অনেক ছবি ক্যামেরা বন্দি করলাম, এই আশায় যে যদি পরে কোনওভাবে সেই ছবি আমার চোখেও ভেসে ওঠে!

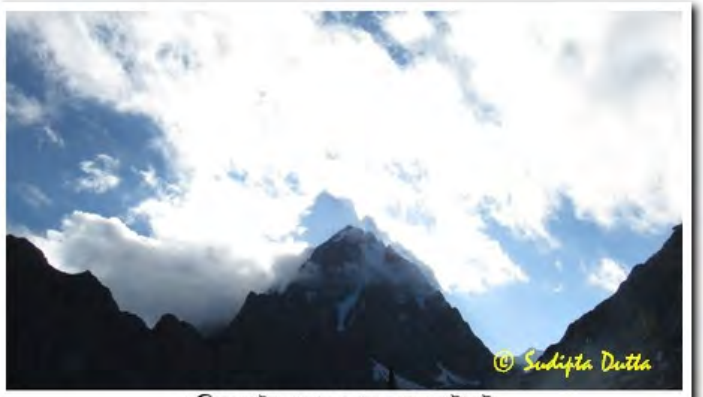

মণিমহেশ কৈলাশের চূড়ায় মেঘের জটাজূট

চতুর্দিক থেকে 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি ভেসে আসতে লাগল। একটু পরে কৈলাশের চূড়ার এক পাশের ছোট চূড়ার পেছনে সূর্যের আলো হীরের দ্যুতির মত এক রামধনুরঙা আলোর ছটা তৈরি করল। আস্তে আস্তে সূর্য যখন পর্বতের আড়াল থেকে আকাশে ভাসল তখন চারদিক শান্ত হল। মণিমহেশ লেকের উচ্চতা চার হাজার মিটারেরও বেশি, তার ওপর বায়ুদূষণ একেবারেই নেই, তাই সূর্যের আলোর তেজ এখানে খুবই বেশি, খালি চোখে সেদিকে তাকানোর চেষ্টা না করাই ভাল। আমরা লেকটাকে একপাক ঘুরে নিলাম। লেকের জলের ওপরে ভাসছে বরফের আস্তরণ, আর সেই ঠান্ডা জলেই স্নান করছে অসংখ্য পুণ্যার্থী। পৌরাণিক মতে স্বয়ং শিব ঠাকুর এই লেকের প্রতিষ্ঠাতা, এবং এর তীরে তপস্যা করেই তিনি সমস্ত পাপ দূর করেছিলেন, তাই এর জলে স্নান করাটাই রীতি, কিন্তু এই বরফ জলে নামার সাহস আমাদের হল না, লেকের কিছুটা জল মাথায় ছুঁইয়েই ক্ষান্তি দিলাম।

স্থানীয় গাদ্দিদের বিশ্বাস পূর্ণিমা রাতে সম্পূর্ণ মেঘমুক্ত আকাশে কৈলাশ পর্বতের চূড়ার 'নাগমণি' থেকে নাকি দিব্য জ্যোতি ঠিকরে বের হয়। তবে যুক্তিবাদীদের দাবি অনুযায়ী তা আসলে কৈলাশ পর্বতের বরফের স্তরে চাঁদের আলোর প্রতিফলন। আমাদের পক্ষে সেই মণি দেখতে পাওয়ার কোনও উপায় নেই, কারণ প্রথমতঃ পূর্ণিমার রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব, আর দ্বিতীয়তঃ কৈলাশ পর্বতের চূড়া মেঘমুক্ত পাওয়াও দুর্লভ। মণিমহেশ কৈলাশ পর্বতের মহিমা স্থানীয় লোকেদের মুখে মুখে ফেরে, এই পর্বত এতটাই দুর্গম যে আজ পর্যন্ত কোনো পর্বত অভিযাত্রী এই পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছতে পারে নি। এই পাহাড়ে উঠতে গিয়ে এক মেষপালক তার ভেড়ার পাল সমেত পাথরে পরিণত হয়েছে, একই দশা হয়েছে একটি সাপেরও! তবে আধুনিক কালে বছর পঞ্চাশেক আগে এক পর্বত অভিযান বিফল হওয়ার পর মণিমহেশ কৈলাশ অনেক লোককথার সৃষ্টি করে অজেয় হয়েই রয়ে গেছে। সূর্যের তাপ খুব দ্রুত বাড়তে থাকল, আমরা ফেরার পথ ধরলাম। কালো, সাদা আর রংবাহারি পাহাড়ে ঘেরা পার্বত্য লেককে পেছনে ফেলে ফিরে চললাম গৌরীকুণ্ডের পথে, তবে এবার ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে।

## কল্পলোক থেকে বাস্তবের পথে

ফেরার পথে দিনের আলোয় গৌরীকুণ্ডের প্রাণচঞ্চলতা আরও বেশি করে চোখে পড়ল। গৌরীকুণ্ডে একটি ছোট জলাশয় আছে, তার জল মণিমহেশের মত বরফ-শীতল নয়, বরং ঈষদুষ্ণ। এখানে মহিলাদের জন্য স্নানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, আর পুরো অঞ্চলটাকে পর্দা আর কাপড় দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। শুনতে পেলাম গৌরীকুণ্ডের এই জলাশয় নাকি মণিমহেশের মূল লেকের সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু কিভাবে তা আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। লোকমুখে শুনলাম স্নানের সময় পার্বতী এই জলাশয়েই স্নান করতেন আর শিব বেছে নিয়েছিলেন মণিমহেশ লেক। টেন্ট থেকে ব্যাগ-পত্তর নিয়ে তা লালদিনের হাতে তুলে দিয়ে ফিরে চললাম হাদসারের পথে। হেঁটে আসার সময় যে পথে এসেছিলাম ফেরার পথ তার থেকে কিছুটা আলাদা। ঘোড়ার পিঠে চড়ে বান্দরঘাটির পথে ফেরা সম্ভব নয়, তাই আমরা ওপরের পথ ধরলাম।

আসার সময় দূর থেকে এ পথে সাদা বরফের মত 'কিছু একটা' দেখতে পেয়েছিলাম, কাছে আসতে বুঝলাম তা আসলে একটা হিমবাহ, রাস্তার ওপর দিয়ে চলে গেছে। সেই হিমবাহ কেটেই রাস্তা তৈরি হয়েছে। পথের একপাশ থেকে হিমবাহ ঢাল বেয়ে নীচে এসেছে, আর অন্যপাশে গভীর গিরিখাতে নেমে গিয়েছে। মাঝের পিচ্ছিল পথ ঘোড়ার পিঠে চড়ে যাওয়া বিপজ্জনক, আমরা হেঁটেই পার করলাম। এদিনের পথে ভিড় অনেক বেশি, উল্টো পথে ঘোড়া আর খচ্চরের সংখ্যাও ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে। ঘোড়া আর খচ্চরের সম্ভবতঃ কোনো অলিখিত শত্রুতা রয়েছে, তাই মালবাহী খচ্চর কাছাকাছি এলেই আমার ঘোড়ার সহিস ঘোড়াটার সামনে দাঁড়িয়ে ওর চোখকে আড়াল করছিল। চলার পথে আমার ঘোড়াটাকে একটু অসুস্থ লাগছিল, ও বারবার অলিম্পকদার ঘোড়ার থেকে পিছিয়ে পড়ছিল। ধঞ্চোর কাছে একবার বাঁ পা মুড়ে পড়েই গেল, অনেক কষ্টে টাল সামলে নিলাম। এর পর হাঁটাপথেই রওনা দিলাম। পথে তালেবের সঙ্গে দেখা, সে সকাল থেকে আরো বার দু'য়েক এপথে যাতায়াত করে নিয়েছে! বুঝলাম আগের দিন আমার জন্যই বেচারা একবারের বেশি উপার্জন করতে পারে নি। আমরা খুব তাড়াতাড়িই হাদসার পৌঁছে গেলাম, কিন্তু বৃদ্ধ লালদিন দু'দুটো রুকস্যাক নিয়ে অনেক পরে পৌঁছাল।

হাদসার থেকে ভারমোর যাওয়ার বাস ছাড়ে, কিন্তু মেলার সময় বাসেও অসম্ভব ভিড়। অনেক চেষ্টা করেও অন্য গাড়ি খুঁজে পেলাম না। অত লোকের ভিড়ের মাঝে এতদিনে প্রথম এক বাঙালি মুখ খুঁজে পেলাম, মেদিনীপুরের অভিজিৎবাবু, চাষবাস সামলেও ঘুরে বেড়ানোই যার ধ্যান-জ্ঞান, তিনিও ফিরলেন মণিমহেশ থেকে। অবশেষে হোটেল থেকে পাঠানো গাড়িতে আমরা তিনজন ভারমোরের পথ ধরলাম।

মণিমহেশ কৈলাশের পাদদেশে মণিমহেশ সরোবর

~ মণিমহেশ ট্রেক রুট ম্যাপ ~ মণিমহেশ ট্রেকের আরও ছবি ~

'আমাদের ছুটি' আন্তর্জাল ভ্রমণ পত্রিকার সহসম্পাদক সুদীপ্ত দত্ত খুবই বহির্মুখী প্রকৃতির, কাজের ফাঁকে ছুটি পেলেই বেড়িয়ে পড়েন নিরালার খোঁজে। নতুন জায়গার সাথে মিশে আপন করে নেন সেখানকার জীবন, সংস্কৃতি আর খাদ্যাভ্যাস। আর তারপর? পাঠকের কাছে সেই অভিজ্ঞতা সাধ্যমত তুলে ধরার চেষ্টা করেন তাঁর অনভিজ্ঞ ভাষায়।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

# বর্ষায় গোয়ায়

শ্রাবণী দাশগুপ্ত

~ ~ গোয়ার তথ্য ~ গোয়ার আরও ছবি ~

বর্ষায় গোয়াতে অফ সিজন...। যেতে হয়েছিল, বিশেষ কাজ ছিল তাই।
আর তাই 'সিজন'-এ যা দেখা যায়, তা থেকে সম্পূর্ণ অন্য একরকমের গোয়াকে দেখে এলাম। ট্যুরিস্টহীন, ভিড়বিহীন। সবুজে সবুজ, জলে অথৈ।

ট্রেনে যাওয়া নিশ্চিত করা হল পথের আনন্দ নেব বলে।
মুম্বইয়ের দাদার থেকে জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ভোর পাঁচটা কুড়িতে ছাড়ে – চেয়ার কার (এসি/নন এসি)। তখন আলো ফোটেনি। পশ্চিমে সূয্যিমামা মুখ দেখান দেরিতে। তার ওপরে বৃষ্টি বলে মেঘলা-আকাশ। যাত্রার বেশিটা ট্রেনের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কন্যাসহ আমি। এসি-র চেয়ে একেবারে আলাদা প্রকৃতির বাতাস। ফোটো তোলাও আরেকটি উদ্দেশ্য বটে। ট্রেন ভালো, প্যান্ট্রি কারসহ। এমনিতেও ফেরিওলার আসা যাওয়া। বড়াপাও, ভাজাভুজি, ব্রেড অমলেট পাওয়া যায় স্টেশনে ট্রেন থামলেই।

প্রায় ৮০০কিমি রেলযাত্রার সমস্তটা পশ্চিমঘাট পর্বতের কোলে কোলে। অনেকগুলো টানেল পড়ে পথে, অন্ধকারে যেন পাতালে চলেছি। বাকি সবুজে নীচু মেঘ ভাসে, নেমে আসে, ঢেকে দেয়। আমরা সন্ধে ছটায় মদগাঁও স্টেশনে পৌঁছালাম। মেঘ ও বৃষ্টি অব্যাহত, কিন্তু আকাশের আলো নেভেনি।

জীবনের দিকে ফিরে চাওয়ার অর্থ সবুজ হয়ে ওঠা। এসময়ে এখানে Lush green all around - বলতে যা বোঝা যায়। মে মাস পর্যন্ত হা বৃষ্টি জো বৃষ্টি সবখানে। তীব্র ঘামময় গরম। এই তিনমাস নাকি এমন অঝোর ঝরবে, বলছিল স্থানীয়রা। ভাবছিলাম, বিধি বাম। আগে আসিনি, এমন সময়ে এলাম,যখন...।

উঠলাম মার্মাগাঁও পোর্ট ট্রাস্টের গেস্ট হাউসে। এসেছি যখন বেপরোয়া হয়েই বেরনো আমাদের, উপরঝান্তি বৃষ্টি শিরোধার্য করে। হাওয়ায় জলের শৈত্য, থামলে সামুদ্রিক চিটচিটানি।

পরদিন গাড়ি উত্তর গোয়ার আগুয়াডা ফোর্টে (১৬১২ সালে তৈরি) নামার মুখেই কালো আকাশ মুখ ভার করল। মাণ্ডবী নদী আর কণ্ডোলি সৈকতের পাশে এই দুর্গ তৈরি হয়েছিল। আগুয়াডা শব্দের অর্থ জল। অঝোর বৃষ্টিতে ছাতাধারী আমরা পেছল কার্নিশ ধরে সরীসৃপের মতো পা ফস্কানোর ভয় পেতে পেতে এধার থেকে ওধার হাঁটি। পাঁচিলের নীচে তাকালেই সাগর অপার। চিরকাল সমুদ্রের খোলা মুখেই গড়ে উঠেছিল যত দুর্গ। জলের নাম জীবন। জল বেয়েই এসেছিল অসমসাহসী পর্তুগিজরা, অচেনা অজানা কতশত মাইল দূরের সবুজ দেশে।

অদূরে লাইট হাউস। নীচে ঔপনিবেশিক স্টোর হাউস ছিল যেখানে, নামতে হল জল এড়াতে। কী উঁচু সিঁড়ি! চারপাশে পরিখা, এখন অবশ্য জলহীন। সবুজ গজিয়েছে ঘন হয়ে।

গাড়িতে পরপর আঞ্জুনা, বাগাতোর, কালাঙ্গুটে সৈকত। তখন ঠিক মুষলধার বৃষ্টি বলতে যা বোঝায় তাই! সামুদ্রিক হাওয়া এমনিতেই পাগলাটে। তারপরে শলার মতো বৃষ্টির জল। শৌখিন ছাতা অতি দুর্বল এক সুরক্ষা ব্যবস্থা। উলটে যাচ্ছে অনবরত। ক্যামেরায় বাষ্প। জলে ভিজে ফোটো তোলা।

কিন্তু সে অদ্ভুত দেখন! শান্ত সুশীল আরবসাগরের উত্তাল ঢেউ। কোনো জলক্রীড়ার (water sports) নামগন্ধও নেই।
বাগা সৈকতে এসে বৃষ্টি ধরল। হাওয়ায় বেহাল ছাতা। আপাদমস্তক চুপচুপে ভেজা। নীরবে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

দুধসাগর ফলস - শুনেছি, ছবিও দেখেছি। বারেবারে শুধাই গাড়ি-চালককে - যাওয়া যায় না? এই অন্তত খানিকটা দূর অবধি দেখে আসা? ট্রেনে? গাড়িতে?
বললেন, 'অভী সব বন্দ্ হ্যায়। কুছ দূর তক গাড়ি জায়েগা।'

সেখান থেকে আবার মোটর সাইকেল আরোহীর পেছনে বসে যেতে হবে কোমর অবধি জল ঠেঙিয়ে। তার দুপাশে ঘন জঙ্গল পড়ে।
পিছু হটে এলাম। ওরকম অ্যাডভেঞ্চার করব দিন শেষ হয়ে এলে। জীবনে প্রথম আর শেষবার দেখে আর ভুলব না, নবকুমার আর কপালকুণ্ডলার মতো সলিলসমাধি!

দুপুরে খাবার জন্যে কাছাকাছি থামা গেল। শ্যাক বা ধাবা যাই বলা যাক, আরও অনেক আছে আশেপাশে। আমরা হাভাতের মতো গোয়ানিজ-থালি বলে হামলে পড়েছি। কপাটহীন দরজার সামনে রাস্তা, ওধারে গ্রাম। ভিজছে,ভিজছে। তুমুল ছাঁট আসছে আমাদের বসার জায়গাতেও।
মেনুকার্ড নিয়ে এসে হাসিমুখে ছেলেটি বলল,'ক্যায়া খাইয়ে গা?'
মেনু দেখে নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বলছিলাম।
সে বলে উঠল - 'বাংরামাছ খান। টাটকা হবে। গোয়ানিজ রান্না।' পুলকিত হয়ে বলি - আরে, বাঙালি? কোথায় বাস? বলে, 'দাঁতন চেনেন? সেখান থেকে।'
কী খুশি সে! পথেপ্রান্তরে এমন আপন মানুষ জুটে যাওয়া উভয়পক্ষকেই মোহিত করে। থালিতে আয়োজন সামান্য। ভাতের সঙ্গে আবার একটা করে রুটিও। আর সে যে কী আতিথেয়তা করবে ভেবে পায়না। শেষে বলে,আমি আপনাদের দুটো করে রুটি দেব এনে। দিলও।
রুটি আমরা খাইনা যে দুপুরে! ফিরিয়ে দিতেই মুখটুকু শুকিয়ে গেল, কেন স্যার?
এই ভাতই অনেক! আমরা খাই খুব কম। তবু কেন জানি রেখে দিলাম একখানা।
তারপর? মাছ নিলাম আবার। তিনটে বাড়তি ভাজামাছের টাকা দিল নিজের থেকে, কিছুতেই শুনল না।
না না, একী? এটা কেন?
রুটি তো খেলেন না, তাই!
তার ক্ষমতায় কুলোল যতটুকু। মন ও মগজ মিলিয়ে বেরিয়ে এসে ভাবতে লাগলাম অনেক কিছু - আর কোনোদিন দেখাও হবে না!

ফেরার আগে রিভার ক্রুইজ মাণ্ডভী নদীর বুকে। দোতলার ডেকে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। বৃষ্টি অবিরাম। ভেজা জামাকাপড়ে শীত করছে আমাদের। নীচে তিনটে গোয়ানিজ নাচ দেখানো হল। ডিজে বাজাচ্ছিল বাজার-চলতি হিন্দি গান। চা-কফি-মদিরার ব্যবস্থা ছিল। সঙ্গে দর্শকের উদ্দাম নাচ। কিছুটা এলোপাথাড়ি উত্তেজনায় গরম হওয়া। খানিক দেখলাম, খানিক জানলায় ভিড় ঠেলে চারপাশ, ফোটো ইত্যাদি। গোয়ানিজ নাচের ছবি তোলার চেষ্টা করেছিলাম, ধরল না ক্যামেরা।

পোর্ট ট্রাস্ট গেস্ট হাউস আড়ে-দৈর্ঘ্যে মুক্তাঙ্গনে ছড়ানো। ভালো ব্যবস্থা। ভিড় নেই।
বৃষ্টিরও শেষ নেই। আকাশের অবস্থা একই। নিম্নচাপের বর্ষণ ক্ষান্ত দেয় না। প্রতিদিন ঘুম ভেঙে বিরক্ত যে লাগছিল না, তা নয়। প্রোগ্রাম ঠিক করা হয়েছিল একটু কাঠখড় পুড়িয়ে। অনুমতি যোগাড় হল পোর্ট-এর অন্দরে প্রবেশের। পুরনো বার্থ ছিল মোটে তিনটে,পর্তুগিজদের সময়ে তৈরি(উনবিংশ শতকের গোড়ায়)। ভারত সরকারের আমলে সংখ্যা বেড়েছে অনেকগুলো। এবিষয়ে আমার জ্ঞান ছিলনা কিছু। মুখ্য উদ্যোক্তা আমার স্বামী, উৎসাহও মূলত তাঁরই। আমার দেখাটা উপরি পাওনা। জমজমে ব্যস্ততা ছিল হয়ত, কিংবা অন্যসময়ে থাকে। ছিলনা তখন। বৃষ্টির মরশুমে আপাদমস্তক সিক্ত নীল বর্ষাতি-পরিহিত জাহাজঘাটার কর্মীদের দেখে মধ্যযুগ ও তৎকালীন সময় অনুমান করার অমূলক চেষ্টা করছিলাম। ওঁরা আগ্রহ নিয়ে দেখালেন, মাল ওঠানামা এবং আরও নানান কিছু।

বার্থ নাম্বার ওয়ান-এই এখন একমাত্র যাত্রীবাহী জাহাজ আসে যায়। যাওয়ার রাস্তায় জঙ্গলাবৃত পরিত্যক্ত পর্তুগিজ হোটেল - বিধ্বস্ত চেহারায়। সমুদ্রের গা ঘেঁষে জাহাজঘাটা, জাহাজ অদূরে জলে পা। প্রবল জলোচ্ছ্বাস পাঁচিল টপকে এসে পড়ছে দানাদানা জলসমেত। আধিকারিকের কাঠের কেবিনে অতিথি আপ্যায়নের জন্যে নকল মুকুট আর বর্শা।

বেলা গড়ালে অনন্ত আশ্রম সিটি শ্যাক-এ আহার আমাদের। বেশ সাজানো,মনোরম, আরামদায়ক। স্কুইড আর গোয়ানিজ আমিষ থালি - পঞ্চব্যঞ্জনে মহা আহার, নারকেলের দুধ আর কোকাম মেশানো সফেদ পানীয় 'সোলকারি'।

সেদিন সকালের মেঘ কাটল একটু বেলাতে। নিম্নচাপের অজস্র বর্ষণের অসোয়াস্তিমুক্ত ঝিলমিলে দিন। আর্দ্রতা আছে,বেশ চিটচিটে গরম।

দক্ষিণ গোয়াতে বম জেসাস ব্যাসিলিকা (১৬ শতকের)। ঔপনিবেশিকযুগ ফিরে আসে সামনে গিয়ে দাঁড়ালে। স্তব্ধ কোলাহলহীন। পথেঘাটে পুরনো গোয়ার গন্ধস্পর্শ অনুভব করা যায় স্পষ্ট। এই চার্চ পোর্তুগিজদের এদেশে উদয় ও অস্ত দুয়েরই সাক্ষ্য বহন করে।

প্রথমে ক্যাথরিনস চ্যাপেল,পরে এই চার্চ। অভ্যন্তর ঘুরে ঘুরে দেখি। লাইট অ্যান্ড সাউন্ড প্রোগ্রাম হয় সেন্ট ফ্রান্সিস দ্য সেভিয়ার (১৫০৬-১৫৫২)-এর জীবন নিয়ে। কী ভাবে এলেন, কোথায় চিনসমুদ্রের জনহীন কিনারে দেহ রাখলেন। কয়েকটি ঘরে মানবোদ্ধার,ধর্মপ্রচার ও মহিমার কথা মূর্তি, মানচিত্র দিয়ে মিনিট পনেরোর চমৎকার অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন মেয়েরা। এঁদের কথা বলার ধরন ভারী নরম, বাক্যের শেষে একটি অদ্ভুত সুরেলা টান। চার্চ এবং চ্যাপেল স্থাপত্যে করিন্থিয়াম স্থাপত্যের মিশ্রন। এছাড়া কিছু সে আমলের ধ্বসে যাওয়া তোরণ,থাম,কোণের অংশ দর্শকের জন্যে বাইরে সাজানো।

তারপরে মঙ্গেশ মন্দির - শিবের মন্দির। গ্রামের নাম মঙ্গেশি। আমাদের গাড়িচালক চার্চবিরোধী হিন্দু, মনে হচ্ছিল কথাবার্তায়। ঘাঁটাইনি তাঁকে। মন্দিরে ওঠার রাস্তায় প্রচুর ছোটবড় দোকান। মাত্র ৮০টাকা করে গোয়া-লেখা টীশার্ট বেচাকেনা। মাথায় লাগানোর গোয়ান-স্টাইল প্লাস্টিকের ফুলের রিং ৩০টাকা।

এখানে সবকিছু অন্য রাজ্য থেকে আসে, নিজস্ব কুটীরশিল্প উৎপাদন নেই। এমনকি কাঁচামালের মধ্যে নারকেল পর্যন্ত আসে কেরালা থেকে। অথচ অসংখ্য নারকেলগাছে ছবির মতো ঘেরা উপত্যকা। নারকেল পাড়বার লোক নাকি পাওয়া যায়না - বললেন আমাদের কোঙ্কনি চালক। (কেরালায় দেখেছি কীভাবে নারকেলকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছেন ওঁরা।)

শান্তাদুর্গা মন্দির এখানে বিখ্যাত মাতৃমন্দির। সুন্দর,শোভন,পরিচ্ছন্ন। যে কোনো মন্দিরের সামনে পিসার হেলানো মিনারের কাছাকাছি আকৃতির একটি করে দর্শনীয় উঁচু স্তম্ভ, আসলে প্রদীপদান।

আবার গন্তব্য সমুদ্রকিনারা...
বর্ষা মানে বৃষ্টিযাপন,এই স্বাভাবিক।

তবু সেদিন বৃষ্টিকে আকাশ নিয়ন্ত্রণ করছিল। হয়ত আমাদেরই জন্যে - ভাবতে ক্ষতি কি? আর আবহাওয়াবিদরা যদি অন্য ব্যাখ্যা দেন, শিরোধার্য।

খাওয়াদাওয়া শেষে ঘুরে এলাম তিনটি সৈকতে–বেনোলি, কোলভা আর বোগমালো। যদিও সেদিন জনাকয় পর্যটক ছিলেন, তা সত্ত্বেও 'নির্জন সৈকতে' শব্দদুটি একমাত্র উপযুক্ত।

এর আকাশের মেজাজের উত্থান ও পতন বুঝে জল আনাগোনা করছে। সমুদ্রপ্রহরীরা বালির ওপরে সীমানির্দেশক লাল ঝাণ্ডা পুঁতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন।
অতএব আমরা দণ্ডায়মান দর্শক – আকাশের রঙ, মেঘ আর সেই সঙ্গে সন্ধে নেমে আসার। সাহস করে সীমাহীন আরবসাগরের গড়িয়ে আসা ঢেউয়ে পা ভিজিয়ে ছুটে ফিরে আসি।
সুয্যি পাটে যাওয়ার আয়োজন করতে, আমাদেরও ফেরার তাড়া। ঘড়িতে তখন? সাতটা। পশ্চিম কিনা!

ভাস্কোতে আমাদের অতিথি-আবাস। যাত্রাপথের অল্পদূরে তীরচিহ্ন পথসূচিত করছে বায়না সৈকত মাত্র কয়েক কিমি। শুনলাম আগে ভিড় থাকত খুব, ইদানীং কৌলিন্য গেছে। খুল্লমখুল্লা নানান অসামাজিক কাজকর্ম চলে, আদিমতম ব্যবসাও। জানালেন গাড়ির চালক। আমরা গেলাম না। মাদক, মদিরা, জুয়া এবং দেহব্যবসা - পৃথিবীর অন্যান্য অনেক পর্যটনক্ষেত্রের মতো এখানেও মৌরসিপট্টা জমিয়ে নিয়েছে। ব্যাপারগুলো মোটামুটি ওপেন সিক্রেট - কার আর কী এল গেল?

পরদিন আবার উত্তরায়ণ। বৃষ্টি বর্ষাকালের মতো, আসে যায়। রোদ্দুরও তাই, মেঘও তাই।
চললাম চাপোরা দুর্গদর্শনে। শুরুতে খানিক কথা কাটাকাটি গাড়ির চালকের সঙ্গে। বুঝতে পারছিলাম - অনেক বেশিই চাইছেন। যাই হোক, উপায় নেই যখন!পৌঁছতে সময় লাগল অনেকখানি।

গ্রামের নাম বারডেজ, পর্তুগিজরা অধিকার করেছিল। আপাতত অকুস্থলে পৌঁছে আমরা হতোদ্যম। আদি ও অকৃত্রিম উঁচু টিলা একেবারে খাড়া হয়ে উঠেছে। লালচে গুঁড়োগুঁড়ো ঝুরঝুরে পাথর। তার ওপরে দুর্গ, নিরাপদ বৈকি! ভাবলাম, থাক এখানে দাঁড়িয়েই দর্শন সারি। কন্যা চিয়ার আপ করল - ভয় পেয়ো না। আর কি কোনওদিন আসতে পারবে? চলো।
বিপদকে বিপদ না গণি। ভয় আর কী,সে নিজেকে নিয়েই।
হামাগুড়ি দিয়ে কচ্ছপ-গমনে উঠতে উঠতে শেষ পাথরটায় পা রেখে মনে হল - আঃ, আমাকে আর পায় কে? বিশাল ট্রেকিং-এ সামিল হলাম! পতন ও অধঃপতনের চিন্তা তখন করে কে?

দুর্গের প্রাকার ছাড়া আর কিছু নেই এখন। আগে দুর্গ অন্যরকম ছিল, চার্চ-ও ছিল। ষোল সতেরো শতাব্দীতে মুঘল,মারাঠা আর পর্তুগিজদের ক্ষমতা দখলের মারামারিতে বহুবার হাতবদল হয়েছে এই দুর্গের। বহুবার ভেঙে বহুবার পুনর্গঠিত। ১৭১৭ সালে স্থাপিত বর্তমান দুর্গ শুধু ধ্বংসাবশেষ নিয়ে স্মৃতিবাহকের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে। এখন ভারতীয় নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধানে।
আরেকটি কারণে পর্যটকের ভিড় হয়। কষ্টগম্য ও নির্জনতার কারণে এটি শুটিং স্পট - হাল আমলের 'দিল চাহতা হ্যায়' এবং 'খামোসি' ছবির শুটিং হয়েছে এখানে। পাঁচিলের পাশে দাঁড়ালে সমুদ্রের বাতাস ও ঢেউয়ের চঞ্চলতা সজীব করে রাখে।
নেমে আসার সময়ে আবার সেই 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' -গোছের এখানে পা ওখানে পাথর - এই করতে করতে, সাবধানের মার নেই জপতে

জপতে নেমে আসা আমার!

কাছে বাগাতোর সৈকত, আরেকবার সেখানে - কারণ বৃষ্টিহীন সে একদিন পাওয়া গেছে, সমুদ্রের প্রতি অমোঘ টান আমাদের কন্যার।

'ফিশারম্যান ওয়ার্ফ' পানাজিতে – এককথায় যাকে বলে অসাধারণ! যেমন পরিবেশ, তেমন রন্ধন। অবশ্য তুমুল বর্ষণে মাছের বৈচিত্র্য খানিক কম। ওঁরা আমাদের দেখালেন ওঁদের সংগ্রহ, অর্ডার দিতে পারি ইচ্ছে করলে। অন্দরসাজ ঐতিহ্য বজায় রেখে, পরিচ্ছন্নতা উদাহরণযোগ্য। ভোজনান্তে তুমুল বর্ষণ আবার। অতিথিনারায়ণকে ছত্রধারণ করে এগিয়ে দিলেন বাহন পর্যন্ত।

সিক্ত অপার সবুজের অনন্য রূপ দেখতে দেখতে পেরিয়ে যাচ্ছি গ্রাম,ক্ষেত,শহরতলি।

পরের দুপুরে আমরা চার কিমি দূরত্বে ভাস্কো সিটিতে। সেখানে পৌঁছালে বাস, অটো পাওয়া যায়। ভাড়া তুলনায় বেশি। তবু নিজেরা একবার না ঘুরে এলে দেখা যে অসম্পূর্ণ থাকে,সকলে জানেন।

তা বেশ লাগল। ছোটোমতো গোছানো শহর। অনেক দোকান আছে পাশাপাশি পরপর। মলের আদবকায়দা আপাতত না থাকলেও 'ইট আউট'-এর খোলা জায়গায় পাতা চেয়ারগুলো ভিজছে। মাথায় টুপি ব্যস্ত শ্যেফেরা পরিবেশন করছেন কফি, কুকিজ এমনকী চাইনিজ ও অন্যান্য আমিষাহার। মানুষজন বন্ধুস্বভাবী। মুশকিলে পড়লে দুহাত বাড়িয়ে দেন।

আর পানাজি বা পানজিম তো বেশ সমৃদ্ধ ও কেতাদুরস্ত শহর। আমাদের গোয়া বেড়ানোর তালিকায় শেষ জনপদ।
ভাস্কো দ্য গামা-র পথভ্রান্তির কারণে একদা ১৪৯৮-এ কালিকট, গোয়া, দমন, দিউ - কোঙ্কনোপকূলে পশ্চিমপ্রান্তিক উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। ১৯৬১ পর্যন্ত গোয়ার মাটিতে দাপিয়ে রাজত্ব করেছে পর্তুগিজরা। শুরুতে বলে-কৌশলে নিজেদের মাটি শক্ত করেছে। জোর করে, ভুলিয়ে, লোভ দেখিয়ে ধর্মপ্রচার করেছে। অনেক চার্চ,অনেক চ্যাপেল ছড়িয়ে আছে আশেপাশে, বিশেষত পুরনো গোয়ায়। স্থানীয় বয়স্ক জনৈক বললেন, 'রোজগার করো, খাও-পিও। কাল কী হবে ভেব না' - এই নাকি পর্তুগিজদের জীবনের মকসদ ছিল। হবেও বা। ক্যাসিনো - পয়সায় পয়সা টেনে আনে। হয়ত কালো রং সাদা করে ফেরে কেউ! জানি না।

টানা তিনমাস (জুলাই-আগস্ট-সেপ্টেম্বর) অঝোর বরিষণে অনাবিল হরিৎ উৎসব। রূপটান ও অঙ্গসজ্জা সবই প্রকৃতির নিজস্ব পার্লারে। তাই এর রূপ অপূর্ব। দূরবিস্তৃত জলমগ্ন ক্ষেতে কাজ করছে মানুষ। পশ্চিমঘাট উপত্যকা বিভিন্ন পর্যায়ে ঢালু-খাড়া হয়ে কখনও পিছিয়ে প্রান্তরেখায় আবছা,কখনও সামনে এসে হাজির। পেশা বা উপজীবিকা বলতে মাছের চাষ আর কান্ট্রি ওয়াইনের ব্যবসা। গ্রামের মধ্যে চোখ ছড়িয়ে হাঁটু-পর্যন্ত জামা পরা কর্মরতা মধ্যবয়সিনী নজরে এসেছে।

শ্যামল সরস সজীব সতেজ - ঘরের চালা দুপাশে ঢালু। অঢেল বৃষ্টি ঝরিয়ে দেয় মাটিতে। মেঘ নেমে আসে। সমস্তটা কেমন প্রশান্ত,আরাম-ধরানো, ঘুমঘুম। তাড়াহুড়ো নেই, গড়িমসির জীবন। আমি পর্যটক বলে হয়ত এমন লেগেছে, কী জানি! ফিরতি আকাশপথে মেঘের আস্তরণ ভেদ করে নেওয়া ছবিগুলো স্পষ্ট হল না তেমন। না হোক, চোখে রয়ে গেল আরও অনেক বিস্তারে।

~ ~ গোয়ার তথ্য ~ গোয়ার আরও ছবি ~

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রাবণী দাশগুপ্ত বর্তমানে থাকেন স্বামীর কর্মসূত্রে রাঁচিতে। কিছুকাল স্কুলে পড়ানোর পর বাড়িতে থিতু হয়ে এখন লেখালেখি আর বই পড়াই ভাললাগার বিষয়। বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিন এবং ই-ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে ছোট গল্প। প্রথম পছন্দ পাহাড় - জঙ্গলও খুব প্রিয়। বেড়াতে ভালোবাসলেও ভ্রমণ কাহিনি লেখায় হাত পাকানো অল্পদিন।

tell a Friend

# আন্দামানের দিনলিপি

দেবাশিস রায়

~ আন্দামানের তথ্য ~ আন্দামানের আরও ছবি ~

দিনাঙ্ক ১ (১৬/০৪/২০১৬)
সেলুলার জেল:
ইতিহাস এখানে কথা বলে। রাষ্ট্রযন্ত্রের জিঘাংসা মেটানোর অপরূপ নিদর্শন।
তার শৈলী, কয়েদি পেষাই-এর আদর্শ পরিকাঠামো, মানুষের শরীর থেকে মন বিচ্ছিন্ন করার বাস্তবতাকে যে কত নির্মম রূপ দেওয়া যায় - এককথায় তার নিদর্শন, তাই অপরূপ।
অবশিষ্ট কয়েদ কুঠুরির প্রতিটি কক্ষে কান পাতলে এখনও শোনা যাবে সেই অনুচ্চারিত যন্ত্রণার ভাষা।
আর শোনা যাবে দীর্ঘশ্বাস। যাদের জন্য তাঁরা প্রাণপাত করেছিলেন, তাদের কাছে আজ শহিদ মানেই আলো-শব্দের হাল্কা বিলাসিতা আর সেলফির ঝলকানি, যাদের কাছে স্বাধীনতা থমকে থাকে স্মারক মিউজিয়ামে, তাদের জন্য ওই জরাজীর্ণ পিপুল গাছের স্বগতোক্তি। সব আলো নিভে যাবার পর যে গাছ কথা বলে ভিড় করে আসা বিদেহীদের সঙ্গে, দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে।

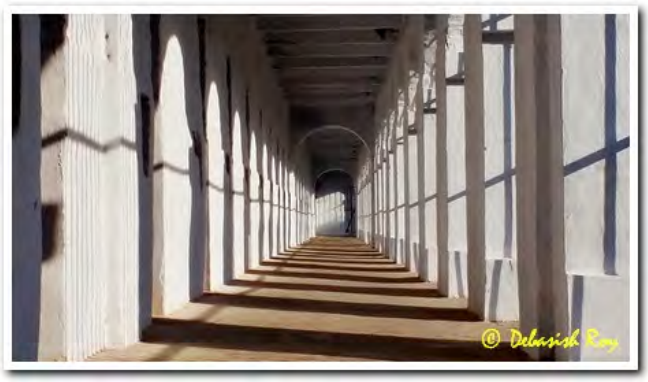


এটুকুই অনুভব। কাব্যকথা নয়, এক ভীষণ আত্মগ্লানি গ্রাস করে আছে।এটাকে যদি 'এনজয়' করা বলা যায়, তবে তা নিদারুণ।
ইংরেজদের পো-দের থেকে অনেক বেশি রাগ হচ্ছে আজকের উত্তরাধিকারী কুলাঙ্গারদের ওপর যারা সবার টুঁটি টিপে হলেও "মা" শব্দ বার করে দেশাত্মবোধ জাহির করতে চায়।
সে সব কথা থাক। কালাপানি ছেড়ে বরং সবুজ দ্বীপের গল্প শোনাই। অন্তত পয়সা উশুল করতে হবে যে!!

দিনাঙ্ক ২ - (১৭/০৪/২০১৬) প্রথম অঙ্ক:
(রাতের প্রস্থান, জানলায় সূর্যোদয় - আলোর প্রবেশ)
তখন সকাল।
চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল দ্বীপান্তরে এসেছি অথচ নোনা জলে পা রাখিনি। তাই সকাল হতেই সৈকত সান্নিধ্যে যাবার জন্য ছটফটানি।
নির্ধারিত সময়ে বৃশ্চিকের আগমন, সারথি ছেলেটিও সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণ মন্ডল। দুই পুরুষ আগে বরিশালের ভিটেমাটি ছেড়ে ঠাকুর্দার আন্দামানে আগমন - সরকারি আনুকূল্যে ৬০ বিঘা জমিতে এক সর্বহারার লড়াই - বাস্তুহারার পরিচয় ঘুচিয়ে অল্প অল্প করে নতুন জীবনের বীজ বপন। আম জাম কাঁঠাল ছায়াবীথি ঘেরা একান্ত নিজস্ব আশ্রয়ের পাশাপাশি নারকেল-সুপারির বিস্তীর্ণ বাগিচা তৈরি, যা আজ বছরে পাঁচ লাখেরও বেশি আয় দেয়। এক নাগাড়ে বলে চলে মন্ডল। গাড়িটা ওর নিজস্ব। আন্দামানেই ওর জন্ম-কর্ম। কলেজ পাশ করে ট্যুরিজম। কলজেটাও বড়।
চড়াই উতরাই পথে কখন যে শহর ছেড়ে গ্রামের পথে গাড়ি ছুটেছে খেয়াল করিনি। পথের দুপাশে যত দূর চোখ যায় দীর্ঘদেহী সুপারি আর নারকেল গাছ সারিবদ্ধ ভাবে কুচকাওয়াজ রত।মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ জলাভূমি - কিছু উপড়ে পড়া গাছের কংকাল আর ঘরবাড়ি ভগ্নদেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মন্ডল বলল, এক সময় ওখানে বসতি ছিল - ওটা ছিল মন্দির; দেবতার গ্রাসে আজ ওটার আর সুনাম নেই - বয়ে চলেছে সুনামির ক্ষতচিহ্ন।ওই ঢুকে পড়া সমুদ্রজল আর বেরোনোর পথ পায়নি। ফলনশীল জমি এখন নোনাজলের স্বাদ পেয়ে অনুর্বরা - নিকট ভবিষ্যতেও তার পোয়াতি হবার সম্ভাবনা নেই।
গ্রামের নাম ওয়ান্ডুর। গ্রামবাসীরা অধিকাংশই বাঙালি - পোশাকি নাম 'সেটেলার' - সেটেলমেন্ট-এর অধীন সকলেই জমি পেয়েছে কম বেশি। কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল হওয়ার সুবাদে সরকারি ভর্তুকি যথেষ্ট - একই কারণে সেটেলারদের বর্ত্তমান প্রজন্ম যথেষ্ট স্বচ্ছল - আন্দামানে নাকি কোনও ভিখারি নেই।

পথিমধ্যে একটা বড় প্রকল্প চোখে পড়ল। সাগরজল থেকে পরিস্রুত পানীয়জল প্রস্তুতকরণ চলে ওখানে - এক লিটার মিষ্টিজল তৈরি করতে প্রায় ১৫ টাকা খরচ হলেও সরকার বিনামূল্যে তা আন্দামানবাসীকে সরবরাহ করে!
কথায় কথায় পৌঁছে গেলাম সেই সমুদ্রতট।সেই সোনাবালি, সেই নোনাজল। পায়ের পাতা ডোবাতেই বালিকণাগুলো সমস্বরে যেন উঠল বলে - সর সর সর - আর অমনি সরে গিয়ে ঢেকে দিল চরণযুগল। নীল নীলাভ নীলচে অথবা গাঢ় নীল - কত রকম নীল হয়? গভীর থেকে গভীরতর কতদূর দেখা যায়? যতদূর চোখ যায় শুধু নীল। চরণ ছুঁয়ে যেতে যেতে তা যদি হৃদয় ছুঁয়ে ফেলে - মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে আসে "ওয়ান্ডারফুল"।
ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডুর - তারই কিছু মুহূর্ত বন্দী হল আজ আমার চলমান দূরভাষের ছোট্ট লেন্সে - আন্দামানের নামের সঙ্গে বন্দীত্বের কোথাও যেন একটা যোগ রয়েই গেছে। আমরা সপরিবারে তো তার কারাগারেই ধরা দিতে চলেছি, আজ সকাল থেকে। মনে ও মননে।

দিনাঙ্ক ২ (দ্বিতীয় অঙ্ক) - ১৭/৪/২০১৬
আজ বিকালে শুধুই উৎসব! পোষাকি নাম "বিচ ফেস্টিভ্যাল" - সমুদ্র আর বালুতট মিলেমিশে খেলা করল আজ বিকেল জুড়ে - আমাদের সঙ্গী করে। করভিনস কোভ বালুকাবেলায়।
পায়ের পাতা ভেজাতে ভেজাতে পৌঁছে গেলাম ঝিনুক সান্নিধ্যে - অঞ্জলি ভরে গেল, তবু মুক্তোর খোঁজ পেলাম না যে! বিস্তীর্ণ সমুদ্রতট জুড়ে কোথাও বা নিপুণ হাতে বালির স্থাপত্যকলা, কোথাও বা সংরক্ষিত সাগরজলে (কুমিরের গ্রাস থেকে বাঁচতে নেট দিয়ে ঘেরা) স্বল্পবসনার এক দেহে লীন হওয়ার শপথনামা। বেশ লাগছিল, সেই পড়ন্ত বিকেলের নিষ্পাপ নীলছবি।
নৌবিহারের ব্যবস্থাও আছে সেখানে। দ্রুত অথবা ধীরগতি। আমি অবশ্য স্থবির প্রস্তরবৎ থাকতেই ভালোবাসি - ঢেউ এসে কখনও সখনও যে হৃদয়ের অন্তঃস্থল নাড়া দেয় না এমন নয়। প্রাণের উৎস থেকে উৎসারিত সেই অনুভূতির নাম নাকি 'মহামায়া'।

করভিনস কোভ থেকে গিয়েছিলাম "চিড়িয়াটাপু" আর সংলগ্ন "মুন্ডা পাহাড়"। পাখিদের আড্ডা এখানে। নীরব নৈঃশব্দ্য - ঘরে ফেরার ডাক - সব পাখি ঘরে ফেরে। নীল জলে সোনার আগুন ছড়িয়ে সেথা সূর্য ডুব দেয় সারাদিনের ক্লান্তি ঘোচাবে বলে। আর তার সাতরঙা আলো শঙ্খচিলের ডানায় ভর করে আঁধারে হারায়। অন্ধকার নামে। শুধু জেগে থাকে আবছায়া ঘেরা সমুদ্রতট,ঢেউ ভাঙা চিকচিকে সফেদ ফেনা আর মহুয়াবনে ভেসে আসা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।
এই চিড়িয়াটাপুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে এমন অনেক শিকড় উপড়ে যাওয়া আন্দামানি মহুয়া গাছ, যার হৃদয়ে এখনো সুনামির দগদগে ক্ষত।আর ফিসফিসানি - আগত ভ্রমণ পিপাসু দ্বিপদীদের উদ্দেশ্যে - হাত ছেড়ো না বন্ধু আমাদের - তোমাদের শিকড় শক্ত রাখতে।মহুয়াফুলের মাদকতায় শরীর অবশ হয়।
ফিরে আসি অস্থায়ী আবাসে - শিকড়ের টানে।

দিনাঙ্ক ৩ (১৯/০৪/২০১৬)
আজ ভ্রমণ বৃত্তান্তের 'নোটবুক' খালি।সকালবেলা থেকেই একটা কষ্ট গলার কাছে এসে আটকে আছে। কোথাও ঘোরার মন নেই - শরীর টেনে এদিক ওদিক - ধারে কাছে দু-একটা মিউজিয়াম - স্মারক সংগ্রহ।
আজ স্মৃতিদেরই ভিড়। আজ সকালে ধ্রুব নামক নয় বছরের এক প্রিয় বালকের মৃত্যু সংবাদ পেলাম।
সকালে ঘুম থেকে উঠে মোবাইল ডেটা অন করতেই ধ্রুব'র অফ হয়ে যাবার খবর এলো। বালকাশ্রম ছেড়ে অন্য আশ্রমে পাড়ি দিয়েছে সে।
সারাটা দিন মনের আকাশ জুড়ে ধ্রুবতারা - সূর্য নামক নক্ষত্রকে ম্লান করে দিয়ে।আমার সারাটা দিন, মেঘলা আকাশ আর কাকে দেব?
ভালো থাকিস ধ্রুব।

দিনাঙ্ক ৪ (১৯/০৪/২০১৬)
(বারাটাং - মাড ভলক্যানো)
প্রায় ৮০-৯০ কিমি স্পিডে গাড়ি ছুটছে। জানলার কাঁচ নামিয়ে রাখা যাচ্ছে না, ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস তিরের মতো এসে চোখমুখে বিঁধছে। এলোমেলো চুল সামলাতে সামলাতে তুলতুলি বলল - জানলাটা উঠিয়ে দাও না! অগত্যা অর্ধ উত্তোলিত।
সকালের প্রথম কনভয় ধরতে হবে। মিস করলে ফের সাড়ে তিন ঘন্টার অপেক্ষা।
আজ যাচ্ছি বারাটাং - মাঝে প্রায় ৫০ কিমি পথ অতিক্রম করতে হবে জারোয়া অধ্যুষিত অঞ্চল। তারই আচরণবিধির প্রথম শর্ত - সমস্ত গাড়িকে পুলিশি নজরবন্দীর মধ্যে থেকে 'কনভয়'-এ চলতে হবে। গতি ৪০ কিমি ঘন্টাপ্রতি। চলতে হবে অবিরাম, পথিমধ্যে থামতে মানা। ছবি তুলতে মানা, খাবার দিতে মানা, আরও অনেক না - না। অন্যথায় জেল - জরিমানা। বিরল জনজাতি জারোয়াদের নিজস্বতা রক্ষার্থে সভ্য মানবজাতির ভারতীয় সংস্করণ যে আইন বানিয়েছে, তার নাম PAT Regulations.

উদ্দেশ্য বারাটাং হয়ে লাইম স্টোন কেভ অথবা মাড ভলক্যানো দেখতে যাওয়া, কিন্তু সারিবদ্ধভাবে কনভয়ে দাঁড়ানো শতকরা ১০০ ভাগ ট্যুরিস্টের অন্তরের উদ্দীপনা - একবার যদি জারোয়া নামক ওই কুহেলিকার সম্মুখীন হওয়া যায়! নিজের চোখের আয়নায় যদি একবারের জন্যও ওই আদিম মানুষের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়! ঘন জঙ্গল। গাছপালার ফাঁক ফোকর দিয়ে চিকচিকে রোদ এসে পড়েছে এক ফালি রাস্তায়। সকালের প্রথম কনভয় চলেছে আগে পিছে পুলিশি নজরদারিতে। সকলেই শির এবং দাঁড়া টানটান করে বসে আছে, আর ইতিউতি খুঁজে চলেছে আদিম উৎসাহে। দু-তিনবার যে তাদের দর্শন মিলতে পারে, গাড়িচালক বন্ধু আগেই জানিয়েছেন। মিললও তাই।
আমার ধারণা সভ্যজগতের মানুষগুলোর অসভ্য কৌতূহল নিবারণের জন্য তাঁরা চলে আসেন -নিরাভরণ রাস্তার ধারে। না কি পেটের টানে? PAT কি পেটের সংস্থান করেছে? সরকারী সাহায্য অপ্রতুল? বিষয়টা অস্পষ্ট। না জেনে বলতে পারব না, পড়ে দেখতে হবে। মনটা ভারী হয়, এই পৃথিবীর জল হাওয়ার স্বাভাবিক অধিকারী ছোট ছোট বাচ্চাগুলোকে দেখে চশমার কাঁচ ঝাপসা হয়ে আসে।আশপাশের গাড়ি থেকে শব্দ ভেসে আসে - ওই তো, ওই তো!! নিজের লজ্জাবস্ত্র হারিয়ে যায় ভেজাল সভ্যতার কাছে।
নাও চটপট উঠে পড়ো এবার - বিশালাকার বার্জে করে অন্য পাড়ে পৌঁছে - মাড ভলক্যানোর ভেলকি দেখে আসি। এই পথেই পারাপার হবে যত বাস-লরি, দুধের গাড়ি - যাদের দিতে হবে পাড়ি - আরো বহুদূর - ডিগলিপুর।
মিনিট দশেক সময় - শান্ত জলরাশির দু'পাড় জুড়ে নোনাজল ভালোবাসা ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বাস।তার মাথায় মাথায় রোদের ছোঁয়ায় দারুণ মায়া। তার শিকড়ে শিহরে সকাল বিকেল ছলাৎ ছল।
তাড়াহুড়ো করে উঠে পড়তে হবে অন্য গাড়িতে - অন্য পারে পৌঁছেই - নচেৎ ফেরার কনভয় মিস হবে বইকি!! কিছুটা এগোতেই রাস্তা চলে গেছে সোজা ডিগলিপুরের দিকে মায়াবন্দর হয়ে - আরো ৩০০ কিমি প্রায়, আন্দামানের দ্বিতীয় শহুরে সন্তানের হাত ধরতে। আমরা সামনের মোড় থেকে বাঁক নিয়ে সোজা ওপরে উঠে যাব ভাঙা পথ ধরে। ড্রাইভার ছেলেটি বেশ কথা বলে। জানাল, লাইম স্টোন কেভ খোলা থাকলে এই কাদা দেখতে কেউ আসে না। যাওয়ার রাস্তাতেও হাত পড়েনি গত দশ বছর।
গাড়ি থেকে নেমে ১৬০ মিটার পথ অল্প চড়াই। পৌঁছানো গেল - কাদামুখের উৎসে - যেখান থেকে বুদবুদের মতো উৎসারিত হচ্ছে তেলজলকাদা মিশ্রিত পলি আর মিথেন, ছড়িয়ে পড়ছে ধরিত্রী মায়ের স্তনবৃন্ত থেকে স্রোতধারার শাখা প্রশাখা হয়ে। বিরল দৃশ্য। দ্বীপ ভূখণ্ডের আরও অনেক বিরলতার মতো।

দিনাঙ্ক ৪ (সায়াহ্ন) রস আইল্যান্ড

সারাদিন ধরে অজস্র ভ্রমণ পিপাসু মানুষের আনাগোনা এইখানে। একসময়কার ব্যস্ত এই দ্বীপ ভূখণ্ডে কী না ছিল - ডাকঘর থেকে টেলিফোন, পাওয়ার হাউস থেকে জল পরিশোধনাগার, টেনিস কোর্ট থেকে অভিজাত ক্লাব - সাহেব সুবোদের স্ট্রাটেজিক প্ল্যানিং সেন্টার। আর ছিল সেই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যা না থাকলে রস আইল্যান্ডের রসমাধুরীতে টান পড়ত, অসমাপ্ত থাকত আন্দামানের ইতিহাস - কারাগারের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত সেই বন্দী জীবন,যেখানকার কয়েদিদের বিন্দু বিন্দু ঘামে গড়ে ওঠা দ্বীপের শৈশব - যৌবনের যন্ত্রণার কাহিনি লিপিবদ্ধ রয়েছে।

জানা গেল, সময়ের সাথে সাথে কয়েদখানায় এসেছে নতুন নতুন অতিথি।পাল্টেছে নজরদারির হুকুমদার। পাল্টায়নি শুধু অত্যাচারের দিনপঞ্জি।কয়েদিরা মুখ বুজে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। সকলে অবশ্যই নয়। বিনিময়ে চলেছে গণহত্যা, কেউ বা হয়েছে আত্মঘাতী। একটু আগেই তোপধ্বনি করে যে লাট সাহেবকে স্বাগত জানানো হয়েছে, বন্দি শের আলির অতর্কিত থাবায় তার নীল রক্ত মিশেছে সমুদ্রনীলে।

রস দ্বীপ বর্ত্তমানে জনবসতি শূন্য। কিছু হরিণ, খরগোশ আর ময়ূর সারাদিন মুক্তমনা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ময়ূরের পেখমে আর খরগোশের ছুটোছুটিতে বন্দীজীবনের ইতিহাস ভুলতে চায় ইট কাঠের ধ্বংসস্তূপ। ভ্রমণার্থীর হাত থেকে নারকেল মালার শাঁস খায় রসের হরিণ।

সারাদিন ধরে পোর্টব্লেয়ার থেকে রস দ্বীপান্তরে আসা মানুষের সঙ্গে মন খুলে কথা বলার ফুরসত নেই ইতিহাসের রাজসাক্ষী ওই ধ্বংসস্তূপের। তাই দিনের শেষে যখন সমস্ত দর্শনার্থী ফিরে যায়, সন্ধ্যা নেমে আসে দিগন্ত জুড়ে - তখন রিক্ত দ্বীপের উন্মুক্ত টেনিস কোর্টের সামনের গ্যালারিতে আলোশব্দের ছায়াধ্বনিতে জেগে ওঠে দ্বীপমালার ইতিহাস। শাবানা আজমি'র মায়াবী কণ্ঠ আর গুলজারের রচনায় ফিরে ফিরে আসে ঐতিহাসিক মুহূর্ত - ইতিহাসের পাতা উলটে সচল হয়ে ওঠে পাওয়ার হাউসের ইঞ্জিন, বেজে ওঠে ডাকঘরের টেলিফোন আর বুকের ভেতর বন্দীর হাহাকার।

বিশ্বযুদ্ধের দামামা শোনা যায়, সুদূর রস আইল্যান্ডে ধ্বনিত হয় নেতাজির উদাত্ত কণ্ঠ, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশমন্ত্র। নিভে যাওয়া সূর্যর সব রঙ শুষে নিয়ে সাদা আলোর জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে নীল সমুদ্রে। সাগরতল থেকে উত্থিত হয় তেরঙার ডাক। সদর্পে বলে আমি ভারতবাসী।

সপরিবারে সাক্ষী থাকি এক অসাধারণ অভিজ্ঞতার। মনে মনে তর্পণ সারি - মহাতর্পণ।

দিনাঙ্ক পাঁচ (নীল দ্বীপান্তর) ২০/০৪/২০১৬ সকাল হতে না হতেই ব্যাপক উদ্দীপনা, সপরিবার দারুণ চাঙ্গা - নীল স্বপ্নিল সমুদ্র সান্নিধ্যে যাব - বিশালাকৃতি এম ভি রানিচাংগা চেপে। যাত্রাপথ নীল দ্বীপ হয়ে হ্যাভলক। আমাদের গন্তব্য নীল। আগামীকাল হ্যাভলক। কিন্তু বন্দরে পৌঁছে জানা গেল কোন এক অজ্ঞাত কারণে আগামীকাল নীলদ্বীপ থেকে হ্যাভলক যাওয়ার জাহাজ অমিল! ওদিকে হ্যাভলক থেকে পোর্ট ব্লেয়ার ফেরার বিলাসবহুল ক্রুজের ই-টিকিট রয়েছে হাতে। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে নীল ঘন্টা দুয়েকের পথ, ২০ কিমি দূরত্বেই হ্যাভলক। অথচ উপায়ান্তর নেই। তা হলে কি নীল ছুঁতে পারব না! বুকের গভীর থেকে সাড়া পেলাম চলো নীলদ্বীপ, আগামীকালের কথা পরে ভাবা যাবে। আসন গ্রহণ করার মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই ভেসে পড়লাম জলে। প্রথম দশ মিনিট কাটতে না কাটতেই চোখের সামনে থেকে স্থলভাগ নিমেষে উধাও!! পৃথিবীর চারভাগ জল - বাকি শূন্য স্থল। পেটের মধ্যে গুড়গুড় করে উঠল - পকেটে ডাক্তার বন্ধুর দেওয়া স্টেমিটিল আর বুকের ধুকপুকানিতে থ্যালাসোফোবিয়ার রুগীকে জলে না নামার (বা ভাসার) পরামর্শ।

জানলার গোলে চোখ পড়তেই দেখি সফেদ ফেনিল সমুদ্র উচ্ছল ঢেউ তুলে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে জাহাজটিকে অথচ একটু দূর থেকে দিগন্তে দৃষ্টির সীমানা অবধি গাঢ় নীল শান্ত সমাহিত নিস্তরঙ্গ।

না, এ সমুদ্রকে ভালো না বেসে পারা যায় না। চোখের আরামটুকু ভালো করে উপভোগ করার সাধে ওপরে উঠে এলাম। সমুদ্র কি হৃদয়ের ভাষা বোঝে? অথবা ভালবাসা? এক হাত বাড়াতেই উজাড় করে ফিরে পেলাম নয়নাভিরাম দৃশ্যপট।এক ঝাঁক সমুদ্র শুশুক (ডলফিন) জাহাজের দুই পাশ ধরে আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলল - মাতল প্রতিযোগিতায়।সবাইকে হেঁকে "ডেকে" আনতে আনতে তারা প্রায় রণে ভঙ্গ দিয়েছে। তবু নিরাশ হল না কেউ। সকলেরই প্রায় সেই বিরল দর্শন মিলল।

হাতের চলমান দূরভাষের গুগল মানচিত্রে নীল জলরাশির মাঝে "মাই লোকেশন" বৃত্তাকারে কেন্দ্রগত, আরও জানান দিচ্ছে - দেখতে দেখতে আমাদের জলযান নীলদ্বীপ অভিমুখে ব্যবধান কমিয়ে আনছে।

নজরে এলো এক ঝাঁক উড়ন্ত পাখি জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে লাফিয়ে চলেছে, ভুল ভাঙল - মাঝ সমুদ্রে জলপৃষ্ঠে কোন পাখি? ওগুলো যে উড়ুক্কু মাছ, শৈশবে পড়া বইয়ের পাতা থেকে সদ্য পরিচয় সেরে গেল - আমাদের সাগরভ্রমণ সার্থক করবে বলে।

রানিচাংগা যখন নীলদ্বীপের জেটি ছুঁল, তখন সকাল গড়িয়েছে দুপুরে। জেটির দুধারে দীর্ঘ পথের ধারে ধারে রঙবেরঙ এর ফুলের সারি সমুদ্রের অন্তঃস্থল থেকে উঁকি দিচ্ছে। ওগুলোর পোশাকি নাম সি কোরাল। দেখবার মতো দৃশ্য।

পা রাখলাম নীলদ্বীপে। চারদিকের সৈকতরেখার কৌমার্য অটুট এখানে। ছোট্ট জনপদ - মূলত হিন্দু বাঙালিদের বাস। সৈকত তটগুলির নামের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের সরব উচ্চারণ - লক্ষণপুর, সীতাপুর, ভরতপুর সি বিচ। কয়েক ঘর দক্ষিণী আর এক ঘর মুসলিমের বাস এই চরাচরে। গাছপালা ঘেরা গ্রাম্য সরল পরিবেশ। আম পেয়ারা নিম মহুয়ার মিলমিশ আর কেয়াপাতার ঝোপঝাড় বালুতট জুড়ে। রোদের প্রকোপ বেশি হলেও পথিমধ্যে নারকেল রাজা (কিং কোকোনাট) গায়ে হলুদ মেখে নতুন বউয়ের মতো শীতল পানীয় পাত্র হাত বাড়িয়ে দিল।তৃপ্ত হলাম তার অমৃতসুধায়।

সার দিয়ে ছোট ছোট অকৃত্রিম কুঁড়েঘর অপেক্ষা করে আছে নতুন অতিথিদের জন্য। তারই একটির আতিথ্য গ্রহণ করলাম। দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে পাড়ি দেওয়া গেল সমুদ্র কিনারায় লক্ষণপুর -২ বিচে প্রাকৃতিক সেতু পরিদর্শনে। বাস্তব আর কল্পনার মিশেলে সেখানে অপরূপ সেতুবন্ধন।সূর্যর শেষ রশ্মি সেই সেতুর ছায়াকে দীর্ঘায়িত করার আগেই পাড়ি দিলাম লক্ষণপুর- ১ বিচে, সূর্যাস্ত দেখব বলে।

যতদূর চোখ যায় শুধু নীল - হাল্কা থেকে ঘন, অগভীর থেকে গভীরে। পড়ন্ত বিকেলে পরিচ্ছন্ন সাদা সমুদ্রতটে তখন চা-জলখাবারের পসরা, আতিথ্যের কোনও ত্রুটি নেই। চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে গোধূলিবেলার নরম রোদ গায়ে মেখে সূর্যাস্তের সাক্ষী হলাম আমরা।

তট ধরে ফেরার পথে জলে আলোড়ন - হাওয়া লেগেছে ঢেউয়ের পালে, পূর্ণিমার আগের রাতে চাঁদের আইবুড়ো ভাত - নীল জলে রূপোলি আলোর খেলা তীব্রতর হচ্ছে, সাদাবালির গায়ে হীরকের দ্যুতি, রক্তে মিশছে সি মহুয়ার নেশা। নিজেকে লুকিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসি গেরস্থের কুটিরে রাত কাটাতে, নিশিডাক উপেক্ষা করে।

নীল তুমি চিরকুমারী থেকো।।

দিনাঙ্ক ৬ (ভরতপুর বিচ, নীলদ্বীপ) ২১/০৪/২০১৬

নাহ্,গরমটা কমল না - সকাল আটটা বাজতে না বাজতেই রোদের প্রকট রোদ চশমা আর সানস্ক্রিন লোশনকে হার মানিয়ে গায়ে কাঁটার মতো বিঁধছে। প্রাতরাশে গরম লুচি আর আলুর দম। এবার গন্তব্য ভরতপুর বিচ। নীলদ্বীপের জেটি সংলগ্ন বিশাল সি বিচ। স্বচ্ছ জলে জীবন্মৃত কোরালের বাস। মাথাপিছু ৫০০ দিলে গ্লাসবোটে চাপিয়ে কিনারা থেকে অনেক দূরে গিয়ে দেখে আসা যাবে রঙবেরঙ এর কোরাল আর ক্ষুদে মাছেদের আস্তানা। এ বিচটিতে বিভিন্ন জলক্রীড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। স্পিড বোট বা ওয়াটার স্কুটারে চেপে উত্তেজনাপূর্ণ সাগর ভ্রমণ। জলের নীচে নেমে একটু গভীরে গিয়ে স্কুবা ডাইভিংও করা যায়, কিন্তু দক্ষ গাইডের অভাবে তা এখন বন্ধ।

সি বিচ থেকেই দেখা যায় জাহাজের আসা যাওয়া - নীলদ্বীপের জেটিতে। কিন্তু আজ সকাল থেকে তা জনমানব শূন্য। গতকালের আশঙ্কাকে সত্যি করে জানা গেল, আজ থেকে তিনদিন নীল দ্বীপ অভিমুখে কোন সরকারি জাহাজ নাও চলতে পারে। আর যদি বা চলে নীল থেকে হ্যাভলক যাওয়ার কোন উপায় নেই।

চিন্তার পারদ বাড়তে থাকল।এদিকে আবার আগামী শনিবার কলকাতায় ফেরার ফ্লাইট। অবশেষে সকাল দশটা নাগাদ খবর এল পোর্ট ব্লেয়ার থেকে একটা স্পেশাল বোট ছেড়ে আসবে নীলদ্বীপে। সেটা করেই আমাদের ফেরত পাঠানো হবে, হ্যাভলক ভ্রমণ অসম্পূর্ণ রেখে।

তবু কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ঘন্টা দু'এক ধরে সমুদ্রজল আর সমুদ্রতট দাপাদাপি করে সবাই যখন ক্লান্ত,তখন একটু দূরেই কিছু দক্ষিণী লোকজন বাজনাসহ সমুদ্রকোলে আসর বসিয়েছে মংগল অনুষ্ঠানের। মাথায় ফুল লাগিয়ে শ্যামলা মেয়েরা বাজনার তালে তালে পা ফেলে বৃত্তাকারে পরিভ্রমণ করছে। বাজনার বোলে সমুদ্রিকার ঘুম ভাঙছে, হলুদ বালির ওপর আছড়ে পড়ে ভাঙছে সফেদ ফেনায়। জল বাড়ছে দেখে সমুদ্রস্নানে ইতি টেনে, ছায়াঘেরা বালিতে বসে পড়া গেল। বালিতট জুড়ে অসংখ্য পসরা। বিশুদ্ধ ডাবের জল অথবা বেলপানা। সমুদ্রের ফিরিয়ে দেওয়া ঝিনুক- শাঁখ-পলা-র মেলা সামগ্রী। বিক্রেতারা মূলত বাঙাল - পূর্বপুরুষরা বাংলাদেশ থেকে এসে পুনর্বাসিত হয়েছিলেন এই দ্বীপ ভূমিতে। আরও কিছু বাসিন্দা বাস জমিয়েছেন অনেক পরে - সকলেরই আদি নিবাস কলকাতা - আদতে অধিকাংশই বসিরহাট, হাবড়া - কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা। অতিথিবৎসল এবং মধ্য-স্বচ্ছল।

দেখতে দেখতে দূর দিগন্তরেখায় ভেসে উঠল সেই জলযানের ছবি, যার অপেক্ষারত আমরা। যে ভাবেই হোক ফিরতে হবেই, তাই ট্রাভেল-এর লোক ভোর থেকে লাইন দিয়ে টিকিট তুলেছে। আর দেরি নয়। ফিরতে হবে পোর্ট ব্লেয়ার, দু ঘন্টার জলপথ পাড়ি দিয়ে।

যাবার আগে নিজেদের বসার জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেলা গেল। সমগ্র বিচে একটাও আবর্জনা পড়ে নেই - নির্দিষ্ট সময় অন্তর সাফাইকর্মীরা আবর্জনা সংগ্রহের গাড়ি নিয়ে ঘুরছে। স্বচ্ছ ভারতের স্বপ্ন নয়, এই জঙ্গল - এই জলাভূমি আর তার বিশাল জীববৈচিত্র্যকে বাঁচিয়ে রাখার জীবনবোধে ওরা উন্নীত।

কাল ২২ এপ্রিল ওয়ার্ল্ড আর্থ ডে, ওদের সেলাম না জানিয়ে পারলাম না।

দিনাঙ্ক ৭ - সপ্তাহান্তে মাউন্ট হ্যারিয়েট এবং শহর ভ্রমণ - ২২/০৪/২০১৬

পোর্ট ব্লেয়ারের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন একটা টুকরো চাথাম। একটা নাতিদীর্ঘ কংক্রিটের সেতু দিয়ে জোড়া। চাথাম থেকে আর এক ফালি (স্ট্রিপ) সমুদ্র পেরোলেই বাম্বুফ্ল্যাট। তারই পৃষ্ঠে মাউন্ট হ্যারিয়েট। পোর্ট ব্লেয়ার মায় সারা আন্দামানের উচ্চতম স্থান এটি। জাতীয় বনাঞ্চল হিসাবে সংরক্ষিত।

আমাদের অস্থায়ী ঠিকানা থেকে সকাল দশটায় রওয়ানা দিয়ে বেলা এগারটা হয়ে গেল শিখরে পৌঁছাতে। মাঝপথে বড় ভেসেলে করে গাড়িসুদ্ধ হেসে খেলে চাথাম থেকে বাম্বুফ্ল্যাট আসাটা মনে রাখার মতো। ভীষণ শৃঙ্খলা মেনে চলে সবাই।

সমুদ্রের কিনারা দিয়ে যেতে যেতে সুন্দর পথ উঠে গেছে চড়াই উতরাই ডিঙিয়ে। চারপাশের ফিকে গাছপালা উচ্চতার সাথে সাথে ঘন হয়ে আসে, নাম না জানা পাখির ডাকে মন উতলা হয়, দিন দুপুরে একটানা ঝিঁঝি ডেকে চলে।

অনেকটা পথ চলেছি জঙ্গলের আলো আঁধারির মধ্য দিয়ে, গাছপালার ফাঁক দিয়ে আলোছায়ার খেলা, অনেকটা উঠে এসেছি মনে হচ্ছে মেন সি লেভেল থেকে! হঠাৎই একটা বাঁক ঘুরতেই অস্ফুটে শব্দ বেরিয়ে এল - ওয়াহহ, অসাধারণ!! হঠাৎ ফিরে পাওয়া সেই হারিয়ে যাওয়া নীল - পাহাড়ের চরণতলে এসে আছড়ে পড়ছে। রাস্তার পাশে অনেকটা খোলা জায়গা দিয়ে দৃশ্যমান - নারকেল গাছের সারির মধ্য দিয়ে ওই দেখা যাচ্ছে নীল সমুদ্রে ঢুকে পড়া 'নর্থ বে' আইল্যান্ড, তার লাইটহাউস।

সেলভান (আমাদের আজকের সারথি) সেলডম কথা বলে, আমাদের উচ্ছ্বাস দেখে বলে উঠল - 'স্যার, এক বিশ রুপিয়া কা নোট নিকাল লিজিয়ে, অউর কম্পেয়ার কিজিয়ে।' তাই তো, ঠিকই বলেছে।পাখির চোখে এ দৃশ্য তো এখান থেকেই তোলা!

আর কিছুটা যেতেই মাউন্ট হ্যারিয়েট রিজার্ভ ফরেস্টের প্রবেশদ্বার - আগন্তুকের দলিলে নাম লিখিয়ে অরণ্যে প্রবেশ। গাড়ি গিয়ে থামলো বনবাংলোর গেটে। বিরাট এলাকা জুড়ে ব্রিটিশ আমলের গ্রীষ্মাবকাশের সাহেবি বাংলোর স্মৃতিচিহ্নের পাশে বর্তমান বন দপ্তরের বাংলো। সৌর বিদ্যুৎকোষ ও

হাওয়াকলের মাধ্যমে চেষ্টা হয়েছিল তড়িৎ সঞ্চারের। উদ্যোগ সফল হয় নি। ক্যাম্পাস জুড়ে ছড়ানো ছেটানো ভিউ পয়েন্ট - চোখ মেলে থাকলেই হল, সামনের বিস্তীর্ণ মানচিত্রে একে একে ধরা দেবে সাগরপারের রস আইল্যান্ড, নর্থ বে, হ্যাভলক, নীল দ্বীপ।
এখান থেকে আরও গভীর অরণ্যে পায়ে হেঁটে (ট্রেক) ঘুরে আসা যায় ২.৫ কিমি দূরত্বের কালাপাথর। আসা যাওয়া মিলিয়ে ঘন্টা দেড়েক। পাইথন, গিরগিটি অথবা প্রজাপতি আর পাখপাখালির একান্ত ঠিকানায়। সরু রাস্তার দুদিকে গাছপালা লতাগুল্ম মাটিতে নেমে এসে স্বাগত জানায় এখানে। আমরা ওই পথের এক চতুর্থাংশ পায়ে হেঁটে ঘুরে আসলাম, গা ছমছম অনুভূতি নিয়ে।
ফেরার পথে ঠিক করলাম, আবার আসব ফিরে - এই বনকুটিরে - দুদিনের তরে, শুধু নৈ:শব্দ্য ভালোবেসে।

~ আন্দামানের তথ্য ~ আন্দামানের আরও ছবি ~

'আমাদের ছুটি' আন্তর্জাল ভ্রমণ পত্রিকার অনেকদিনের বন্ধু দেবাশিস রায় ভালোবাসেন বেড়াতে। যুক্ত রয়েছেন বিভিন্ন এন জি ও-র সঙ্গে। এই প্রথম কলম ধরলেন তাঁর প্রিয় পত্রিকাটির জন্য।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

আপনার মন্তব্য জানাতে ক্লিক করুন

To view this site correctly, please click here to download the Bangla Font and copy it to your c:\windows\Fonts directory.

For any queries/complaints, please contact admin@amaderchhuti.com
© 2011 - AmaderChhuti.com • Web Design: Madhuwanti Basu
Best viewed in FF or IE at a resolution of 1024x768 or higher

# হিরাপুরের যোগিনীরা

দময়ন্তী দাশগুপ্ত

সালটা ১৯৫৩। জানুয়ারি মাস। ওড়িষার খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক কেদারনাথ মহাপাত্র পুরীর বালিয়ান্তা থানা এলাকায় প্রাচীন পুঁথি ও পুরাতাত্ত্বিক দ্রব্যাদির সার্ভে করতে আলওয়ারপুর গ্রামে ঘাঁটি গেড়েছেন। গ্রামের এক চৌকিদারের সঙ্গে গল্পে গল্পে হঠাৎই জানতে পারলেন, মাইল দুয়েক দূরে হিরাপুর গ্রামে একটি গোলাকার জায়গার মধ্যে অনেক দেবদেবীর মূর্তি রয়েছে। তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন বলে উঠল, নিশ্চয় রানিপুরের ঝরিয়ালের মতো গোলাকার নতুন আরেকটি প্রাচীন মন্দির খুঁজে পাওয়া যাবে। ২৪ জানুয়ারি সকালে হিরাপুরে পৌঁছে চৌষট্টিযোগিনী মন্দিরটি দেখে নিজের ধারণাটি হুবহু মিলে যাওয়ায় দারুণ খুশি হলেন। এরপরে তাঁরই উদ্যোগে আই.এন.টি.এ.সি.এইচ.-এর ওড়িষা শাখার তত্ত্বাবধানে শুরু হল মন্দিরটির সংস্কার।

চৌষট্টি যোগিনী মন্দির, হিরাপুর

## পুরাণ-গল্পকথা-ইতিহাস

যোগিনী পুজো ভারতের খুব প্রাচীন একটি প্রথা। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে ভীতি থাকার জন্যই ততোটা আলোচিত নয়। মূলত উত্তর ভারতের বিভিন্ন দুর্গম এলাকায় এই মন্দিরগুলি দেখতে পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে এই মন্দিরগুলির অধিকাংশের অস্তিত্বের কথাই উল্লেখ করেছেন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক কানিংহাম। কিন্তু তার খুব সামান্য কয়েকটিই পরবর্তীকালে সেভাবে খুঁটিয়ে দেখা বা আলোচনা হয়েছে। এর কারণও সেই ভীতিই।

তান্ত্রিক দেবীরা ডাকিনি বা যোগিনী নামে পরিচিত। ভারতে নারীকে দেবীরূপে পুজোর চল কিন্তু বৈদিক যুগেরও আগে থেকে ছিল। দ্রাবিড় সভ্যতায় মাতৃকা মূর্তির পুজো হত। কিন্তু ঠিক কোনসময়ে তন্ত্রশাস্ত্রের উদ্ভব হয় তা খুব স্পষ্ট নয়, সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে। তবে নবম থেকে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর সময়ে তন্ত্রচর্চার রমরমা বেড়েছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মেই তান্ত্রিক প্রথার চল বেশি থাকলেও বৈষ্ণব এবং জৈন ধর্মের মধ্যেও এর প্রভাব কখনও কখনও লক্ষ্য করা গেছে। বিভিন্ন সময়েই নানা কারণে তান্ত্রিক চর্চার প্রথা কমেছে আর পরবর্তীকালে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে খেয়াল করলে দেখা যাবে গ্রামীণ দেবতা হিসেবে মাতৃকা মূর্তির পুজো হয়। আর তাকে ঘিরে থাকে নানান সব প্রাচীন ধ্যানধারণা, জাদুচর্চার কাহিনি।

প্রচলিত একটি কাহিনি হল দেবতাদের সম্মিলিত শক্তি বা কসমিক ফোর্স থেকে অষ্টমাতৃকার সৃষ্টি হয়। এই অষ্ট মাতৃকার একেকজন আবার আরও আটটি ভাগে ভাগ হয়ে মোট চৌষট্টি যোগিনীর সৃষ্টি করেছে। এখানে মহিষাসুর নিধনের জন্য দুর্গার সৃষ্টির গল্প মনে পড়ে যায়।

ওড়িষায় মন্দির শহর ভুবনেশ্বরকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সময়ে হিন্দু এবং বৌদ্ধ তান্ত্রিক পুজোআচ্চা প্রসারলাভ করেছিল। বৈতাল মন্দির ও মোহিনী মন্দিরে ভীষণকায়া দেবী চামুণ্ডার মূর্তি তার প্রমাণস্বরূপ। ভুবনেশ্বরের আরও অনেক মন্দিরেই মাতৃকা দেবী মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। লিঙ্গরাজ মন্দিরের অষ্ট চণ্ডিকা মূর্তিগুলিও উল্লেখযোগ্য।

যোগিনী তন্ত্রকে মূলত ৬৪ টি ভাগে ভাগ করা হয়। তাই সাধারণভাবে যোগিনীর সংখ্যাও ৬৪ ধরা হয়। তবে কোথাও কোথাও ৪২ বা ৮২ যোগিনীর উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত যোগিনী মন্দিরগুলি বৃত্তাকার এবং ছাদবিহীন হয় - হাইপেথ্রাল টেম্পল। মন্দিরে ৬৪ টি ভাগ থাকে যেগুলিকে 'আরা' (কিরণ) বা 'ডালা'(পাঁপড়ি) বলা হয়।

স্কন্দ পুরাণ ও অন্যান নানা পুরাণে যোগিনীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেখানে তাদের পূর্ণাঙ্গ দেবীর বিভিন্ন দিক রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। বলা হয়, এই যোগিনী রূপের মাধ্যমেই তিনি পূর্ণতার দিকে যান। চৌষট্টি যোগিনীদের আটটি করে একসঙ্গে নিয়ে অষ্ট মাতৃকা হিসেবে বন্দনা করার রেওয়াজও ভারতের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে। সপ্ত মাতৃকার আরেকটি উন্নত রূপ বলা যেতে পারে। নয় বা ষোলো মাতৃকা রূপও দেখতে পাওয়া যায় কোথাও কোথাও। অগ্নিপুরাণে অষ্ট মাতৃকার উল্লেখ রয়েছে। এই অষ্ট মাতৃকা হলেন - ব্রাহ্মণী, মহেওয়ারি, কৌমারি, বৈষ্ণবী, ঐন্দ্রী, চামুণ্ডা, মহালক্ষী, বরাহী। স্কন্দপুরাণে উল্লেখ আছে যে, দেবী মহিষাসুরমর্দিনী অসুরকে বধ করার সময় যুদ্ধে সহায়তার জন্য যোগিনী বৃত্তটি সৃষ্টি করেন। ভগবতী পুরাণে বলা আছে, দেবী ভুবনেশ্বরী মণিদ্বীপে বসবাস করে। এই দেবীর চৌষট্টিটি দিক বা কাতা-র নামেরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

বৃত্ত সার্বিকভাবে সবচেয়ে সরল এবং পবিত্রতম অবস্থাকে নির্দেশ করে। এটি পুরাকাল থেকে বিম্ব বা প্রতিচ্ছবির চিহ্নকে বোঝায়। বৃত্ত একইসঙ্গে সূর্য, চক্ষু, সময়, রাশিচক্র এবং অনন্তকে বোঝায়। এটা কিছুই না অথচ সবকিছুই। এটা এমন একটা চেহারা ও অবস্থা যা তুলনামূলকতা এবং বিচ্ছিন্নতা উভয়ই বোঝায়। বৃত্ত কোনও সূচনা বা সমাপ্তি ব্যতিরেকেই নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। এবং বাইরের সমস্তকিছুকে আলাদা করে দেয়। বৃত্ত নিজেকেও বোঝায় - আত্মকে। প্রাচীনকাল থেকেই পবিত্র কোনও জায়গার সীমা নির্দেশ করতে বৃত্ত ব্যবহার করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মেও বৃত্তের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। বুদ্ধ ধর্মচক্রের প্রবর্তন করেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত ভারত সংহিতায় এই ধরণের মন্দিরের উল্লেখ আছে। অগ্নিপুরাণে বৃত্তাকার নয় ধরণের মন্দিরের কথা পাওয়া যায়। সাধারণ মন্দিরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের এই যোগিনী মন্দিরগুলির মধ্যে একমাত্র খাজুরাহোর মন্দিরটি চৌকাকার।

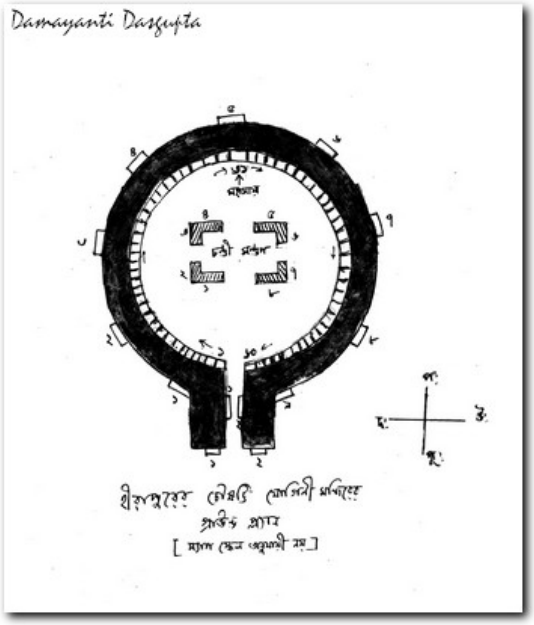


বিশেষ প্রকারের তন্ত্র সাধনায় চক্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যখন বিভিন্ন যোগিনী মূর্তিগুলি সেই চক্রের মধ্যে অধিষ্ঠান করানো হয়, তাকে যোগিনীচক্র বা যোগিনী মন্দির বলা হয়। কোনও কোনও তান্ত্রিক পাঠে ওই মন্দিরকে 'মণ্ডল' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মাতোত্তারা তন্ত্রে যোগিনীচক্র এবং চৌষট্টি যোগিনীর উল্লেখ রয়েছে। ভারতে কৌলার্নাভা তন্ত্রের অধীনে তন্ত্র চর্চার জন্য যোগিনী মন্দিরগুলির নির্মাণ করা হয়েছিল। বিশেষ এই তন্ত্রটির চর্চা ওড়িষার হিরাপুরের চৌষট্টি যোগিনী মন্দির থেকে শুরু হয়ে ভারতের অন্যান্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। হিরাপুর ছাড়া ভারতের অন্যান্য যেসব জায়গায় যোগিনী মন্দির বা তার ধ্বংসাবশেষের কিছু উল্লেখ পাওয়া গেছে তা হল, জব্বলপুরের ভেদঘাট, মধ্যপ্রদেশের দুদাহি, বাদো ও শাহদোল, উত্তরপ্রদেশের লোখারি, খাজুরাহ ও রিখিয়ান, গোয়ালিয়রের মিতাওলি ও নরেসার, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের সীমান্তের হিংলাজগড়, ওড়িষার রানিপুর-ঝরিয়াল এবং দক্ষিণ ভারতে কাঞ্চিপুরম। এছাড়া উত্তরপ্রদেশের বেনারস বা কাশীতে গঙ্গার একটি ঘাট সংলগ্ন চৌষট্টি দেবী মন্দির রয়েছে। এখানে কিন্তু মন্দিরটি ছাদবিহীন নয়। একটিমাত্র দেবী মূর্তিই চৌষট্টি দেবীর প্রতিভূ। ঘাটটির নামও চৌষট্টি যোগিনী ঘাট। এরমধ্যে বেশ কয়েকটা জায়গায় মন্দিরের অস্তিত্ব এখন আর নেই। ভগ্নমূর্তিগুলি বিভিন্ন মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

ওড়িষায় তন্ত্রচর্চার চল বহু পুরনো। অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর মধ্যে মৎসেন্দ্রনাথের কৌলাজনানির্ণয়-এ যোগিনী তন্ত্রের গোপন চর্চা এবং দর্শনকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিভুক্ত করা হয়। ওড়িষায় হিরাপুর ও রানিপুর-ঝরিয়ালে দুটি যোগিনী মন্দির রয়েছে। হিরাপুরের মন্দিরটি ভারতে ক্ষুদ্রতম। কুয়াখাই নদীর দক্ষিণ তীরবর্তী অঞ্চলে গ্রামের বহির্ভাগে বৃহৎ একটি পুষ্করিণী এবং ধানক্ষেতের গায়ে অবস্থিত এই মন্দিরটি। মন্দির শহর ভুবনেশ্বর থেকে মাত্র ৬ কিমি দূরে। এক লোককথা বলে, হিরাপুর গ্রামটির নাম তৎকালীন রানির নামে রাখা, আবার অন্য লোকগাথায়, এখানে কখনও হীরক বৃষ্টি হয়েছিল। তবে মন্দির প্রতিষ্ঠাকালীন কে যে ক্ষমতায় ছিলেন ওই অঞ্চলের তা খুব স্পষ্ট নয়। সম্ভবতঃ ভাঞ্জা শাসকেরা বা সোমবংশী রাজারা।

বৃত্তাকার মন্দিরটির বাইরের দিকের ডায়ামিটার তিরিশ মিটার। ল্যাটেরাইট পাথরে তৈরি মন্দিরটির বৃত্তাকার অংশটি স্যান্ডস্টোন ব্লক দিয়ে তৈরি। মূল দরজাটি একটি ছোট গলি দিয়ে বৃত্তাকার অংশের সঙ্গে যুক্ত। কালো ক্লোরাইট পাথরের স্ল্যাব থেকে কাটা যোগিনী মূর্তিগুলির একেকটি মোটামুটি দু ফিট উচ্চতার। সবকটি মূর্তির ভঙ্গীই দাঁড়ানো অবস্থার। মাটির কাছাকাছি ওপরে আর্চওলা প্রত্যেকটি যোগিনী মূর্তির ক্ষুদ্রাকার কুলুঙ্গিগুলিকে একেকটি ক্ষুদ্রাকার মন্দির রূপে ধরা হয়।

মহামায়া পুষ্করিণী

## এবং ভ্রমণকাহিনি

গত মার্চের এক রোদ্দুরভরা বেশ গরম সকালে পুরী থেকে হাফ ডে ট্যুরে বেরিয়েছিলাম। গন্তব্য ধৌলি, চৌষট্টি যোগিনী মন্দির, পিপলি আর রঘুরাজপুর। ধৌলিতে অশোকের শিলালিপি দেখে মুগ্ধ হয়ে ফিরছি চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরের দিকে। আমার আবার এই বয়সেও দুম করে অবাক আর মুগ্ধ হওয়ার বদ অভ্যেস আছে। মন্দিরের রাস্তা কেউ ঠিক বলতে পারছে না, মোবাইলে গুগুল ম্যাপ ভরসা করে এগোনো। মূল রাস্তা থেকে পাশের রাস্তায় নেমে গেছি অনেকক্ষণ। মন্দিরের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছলে কয়েকজন শেষ রাস্তাটুকুর সন্ধান দিলেন। বিশাল পুকুরের পাশে গাড়ি থামল - মহামায়া পুষ্করিণী। একটু এগিয়ে লোহার ছোট গেট পেরিয়ে সবুজে ভরা বড় চত্বরের একেবারে শেষে মন্দির। গোলাকার ছাদবিহীন মন্দিরটা দেখে ভারী আশ্চর্য হয়ে গেলাম। রোদে তখন পাথরে পা রাখা যাচ্ছে না। জুতো খুলে এক দৌড়ে... নাহ্, মন্দিরের ঢোকার ছোট্ট গলিতে মাথা নীচু করতে হল। এভাবেই বানানো। ভেতরে কোথাও রোদ্দুর কোথাও বা মন্দিরের দেওয়ালের ছায়া। ওইটুকু জায়গার ভেতরে যে এতগুলি দেবীর অধিষ্ঠান তাও ভাবিনি। আবার সেই অবাক হওয়ার পালা। গোল মন্দিরের ভেতরের দেওয়ালের নীচের দিকে ছোট ছোট কুঠুরিতে সুন্দরী সব দেবী, সুডৌল গঠন তাদের, যেমনটা দেখা যায় চিরাচরিত ভারতীয় ভাস্কর্যে। মূর্তির মুখ কখনও মানুষের, কোনটা বা পশুর। অনেকগুলি মূর্তির হাত বা কোনও অঙ্গ ভেঙে গেছে, তবু মোটের ওপর বোঝা যায়। মোট ষাটটি কুঠুরি। দরজার একেবারে সোজাসুজি মহামায়া মূর্তিটি গ্রামদেবী হিসেবে পূজিত। পরে জেনেছি যে ভারতের চৌষট্টি যোগিনী মন্দিরগুলির মধ্যে একমাত্র এই মন্দিরেই পুজো চালু আছে। মন্দিরের কেন্দ্রে থাকা উঁচু চণ্ডীমণ্ডপে, আরও চার কুঠুরির মধ্যে একটি ফাঁকা, বাকি তিনটেয় তিন দেবী। এখানে চারটি ভৈরবের মূর্তিও রয়েছে।

মন্দিরের পুরোহিত মূর্তি চেনান ঘুরে ঘুরে। আমরাও যতটা সম্ভব খুঁটিয়ে দেখি -

যোগিনী নং ৩ - নর্মদা

যোগিনী নং ১৩ - পঞ্চবরাহী

১) মায়া/বহুরূপা/চণ্ডিকা - মূর্তিটির চার হাত। ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় একটি সোজা করে রাখা মৃতদেহের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। মাথার ওপরে খোঁপা। গলায় হার, কোমরে গোট, হাতে বাজুবন্ধ ও পায়ে নূপুর। অধিকাংশ যোগিনী মূর্তির অঙ্গেই এই অলংকার বা কিছু অন্য অলংকার রয়েছে।
২) তারা - হাঁটু কিছুটা ভাঁজ করে মৃতদেহের ওপর দাঁড়ানো মূর্তি। দুটি হাত। মাথার বাঁপাশে কেশবন্ধন। অঙ্গে বিবিধ অলংকার প্রথম মূর্তিটির মতোই।
৩) নর্মদা - হাতির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা মূর্তিটির দুটি হাত। একটি হাতে নরকরোটির পেয়ালা (কাপালা) মুখের কাছে মতো ধরা - যেন রক্তপান করছে। গলায় মুণ্ডমালা ও সর্বাঙ্গে অন্যান্য নানা গহনা।
৪) যমুনা- চার হাত। ওপরের ডান হাতে কাপালা। বিরাট এক কচ্ছপের ওপরে দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে রয়েছে (প্রত্যালিধ ভঙ্গী)। মাথার ওপর কোঁকড়া চুল (জটামণ্ডল)।
৫) শান্তি/কান্তি/লক্ষ্মী/মানদা - দুই হাত, পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর দাঁড়ানো মূর্তি, মাথার ওপরে খোঁপা। প্রথম মূর্তিটির মতো গহনা ছাড়াও নাগের মাথাওলা বাজুবন্ধ (নাগকেয়ূর), পরনে ময়ূর পালকের ছোট ঘাগরা। প্রচলিত লক্ষ্মী মূর্তির সঙ্গে কোনও মিলই পাই না।
৬) বৃদ্ধি/ক্রিয়া/বারুণি - সমভঙ্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান দেবীমূর্তির দুই হাত। মাথার বাঁদিকে খোঁপার আকারে চুল বিন্যস্ত রয়েছে। মাথায় এবং বিভিন্ন অঙ্গে অলংকার। স্তম্ভমূলে ঢেউয়ের সারি।
৭) অজিতা/গৌরী/ক্ষেমঙ্করী - সমভঙ্গ মুদ্রায় কুমীরের ওপর দণ্ডায়মান দেবীমূর্তির চারটি হাত। মাথার ওপরে খোঁপা (চিগনোন)। অঙ্গে গোট, হার, বাজুবন্ধ, নূপুর ও মাথায় নানা অলংকার রয়েছে।
৮) ঐন্দ্রী/ইন্দ্রানী - প্রত্যালিধ মুদ্রায় হাতির ওপর দাঁড়ানো দেবীমূর্তিটির দুই হাত। খোঁপা মাথার ওপরে আর বিভিন্ন অঙ্গে ও মাথায় অলংকার রয়েছে।
৯) বরাহী - বরাহমুখী দেবীর চারটি হাত। প্রথম যোগিনী মূর্তির মতো দেহে অলংকার রয়েছে। তারসঙ্গে মুকুট এবং কিরীট। বাঁদিকের এক হাতে কাপালা ও অন্য হাতে ধনুক।

১০) রণবীরা/ পদ্মাবতী - সাপের ফনা আর শরীরে পা রেখে দাঁড়ানো ভীষণদর্শনা এই দেবীর দুই হাত। ডান হাতে খড়্গ। গলায় মুণ্ডমালা ও মাথায় অলকা। মাথার ওপরে খোঁপা।
১১) মূরতি/অষ্টগ্রীবা - দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় উটের ওপর দণ্ডায়মান বানরমুখী দেবীর চার হাত।
১২) বৈষ্ণবী - গড়ুড় পাখির পিঠে দাঁড়ানো দেবীমূর্তির দুই হাত। অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রী। কুঞ্চিত কেশে সর্পমুকুট। দেহেও নানা অলংকার।
১৩) বীরূপা/কালরাত্রী/পঞ্চবরাহী - ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় বরাহের ওপরে দণ্ডায়মান অনিন্দ্যকান্তি হাস্যমুখী দেবীমূর্তির দুই হাত। মাথার ওপর সুন্দর খোঁপাটি।
১৪) বৈদ্যরূপা - দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় ঢাকের ওপর দাঁড়ানো মূর্তিটির দুটি হাত। মাথার ওপরে খোঁপা।
১৫) চর্চিকা - ত্রিভঙ্গভাবে একটি পুরুষ মূর্তির ওপরে দাঁড়ানো দেবী মূর্তিটির দুই হাত। উপুড় হয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে থাকা পুরুষ মূর্তিটির মাথায় কুঞ্চিত চুল, ডানহাতে একটি পদ্মকাণ্ড আর বুকে একটি কাটারি।

যোগিনী মহামায়া সহ অন্যান্যরা

১৬) মার্জারি/বেতালি - সমভঙ্গ মুদ্রায় মৎস্যের ওপর দণ্ডায়মান দেবীর চার হাত। মাথার ওপরে খোঁপা। গলায় মুণ্ডমালা। শরীরে অলংকারাদি প্রথম যোগিনীর মতোই।

১৭) ছিন্নমস্তকা - দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় ছিন্ন নরমস্তকের ওপর দণ্ডায়মান দেবীর চারটি হাত। নীচের বাম হাতে ধরা ধনুক। মাথার ওপরে খোঁপা। এখানে চিরাচরিত ছিন্নমস্তা দেবী মূর্তির সঙ্গে পার্থক্য লক্ষ্যণীয়। দেবী নিজে ছিন্নমস্তক নয়, বরং ছিন্নমস্তকের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে মূর্তিটি। এখানে নারীর অসহায়তার বদলে শক্তি প্রকাশ পাচ্ছে। প্রায় সবকটি দেবী মূর্তির ভাষ্যই যেন এই শক্তির প্রকাশ।

১৮) বৃষবাহনা/বিন্ধ্যবাসিনী - সম্মুখে একটি ছোট গর্ত বা গুহামুখওলা গুহার মাথায় পা রেখে দাঁড়ানো বৃষমুখী রাগতদর্শনা দেবীর দুটি হাত ও মাথায় জটামণ্ডল।

১৯) জলকামিনী - ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় বৃহৎ একটি দাদুরির ওপর দণ্ডায়মান দেবীর দুইটি হাত। মাথার ডানপাশে চমৎকার কেশবন্ধ। কোমরের গহনা এবং পোশাক বেশ কারুকার্যময়।

২০) ঘটভারা - অনিন্দ্যকান্তি এই মূর্তিটি নৃত্যভঙ্গীতে দণ্ডায়মান। এই প্রসঙ্গে মনে করা যায়, ওড়িষার অন্য যে যোগিনী মন্দিরটি রানিপুর-ঝরিয়ালে রয়েছে তার সবকটি মূর্তিই নৃত্যভঙ্গীমায় দণ্ডায়মান। শক্তিশালিনী এই দেবী মূর্তিটি সিংহের ওপর দাঁড়িয়ে দুহাতে মাথার ওপর হাতি তুলেছে। হাতিটি মুখ লুকিয়ে রয়েছে।

২১) বীকারালি/কাকারালি - অনিন্দ্যকান্তি দেবীর মাথার ডানপাশে চমৎকার কেশবন্ধ। ডান পা তুলে বাম পায়ের থাইয়ের ওপর দুই হাতে শক্ত করে ধরা দেখে মনে হয় যেন নূপূরটি ঠিক করে পড়ছেন। ভঙ্গীটি ভারী চমৎকার। যেন শ্রী রাধিকা, পাছে নূপূরের শব্দ শোনা যায় তাই কাপড়ে বেঁধে রাখছেন। সেই মুহূর্তটি যেন বাঁধা পড়েছে অনন্তকালের জন্য।

২২) সরস্বতী - আমাদের চেনা সরস্বতী মূর্তি থেকে একেবারেই আলাদা এই দেবী মূর্তিটি একটি সর্পের ওপর দণ্ডায়মান। ডান কাঁধ থেকে একটি তারের বাদ্যযন্ত্র (তুমুরু) কোনাকুনিভাবে ঝুলছে। মাথার ওপরে চুলগুলি চালচিত্রের আকারে রয়েছে। দেবী বাম হাতে গুম্ফ মোচড়াচ্ছেন।

যোগিনী নং ২০, ২১ ও ২২ - ঘটভারা, কাকারালি ও সরস্বতী

এইখানে এসে একটু থমকে যাই। মনে পড়ে যায় বিভূতিভূষণের বড় প্রিয় একটা গল্প -'মেঘমল্লার'। বিভূতিভূষণের নানা গল্পেই তন্ত্রের কথা বা অতীন্দ্রিয় শক্তির কথা ফিরে ফিরে এসেছে। এই গল্পে তান্ত্রিক গুণাঢ্য, প্রদ্যুম্ন নামে এক তরুণ শিল্পীকে ভুল বুঝিয়ে তার বাঁশির মেঘমল্লারের রাগে দেবী সরস্বতীকে বন্দী করে এই পৃথ্বীলোকে। দেবী আত্মবিস্মৃত হয়ে সাধারণ নারী হয়ে ওঠেন। গল্পের শেষে প্রদ্যুম্ন নিজে পাথর হয়ে গিয়েও দেবীকে তাঁর পূর্বরূপ ফিরিয়ে দেয়। প্রদ্যুম্নের প্রেমিকা সুনন্দাও কোনদিন জানতে পারেনি সে কথা। বহুদিন প্রদ্যুম্নের জন্য অপেক্ষা করে শেষে সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়ে সে মাঝে মাঝে স্বপ্নে জঙ্গলের মধ্যে এক পাথরের মূর্তিকে দেখতে পেত।

তান্ত্রিক এই সরস্বতী-র মধ্যে মেঘমল্লারের সেই দেবীকে খুঁজে না পেয়ে মনের মধ্যে কেমন একটা ধাক্কা খাই যেন!

আবার এগোই। পূজারী আমার অনুরোধে দু-তিনবার ঘুরে ঘুরে সব মূর্তিকে বারবার করে চিনিয়ে দেন। মন্দিরের যেখানে রোদ এসে পড়ছে পা রাখা যাচ্ছে না। মধ্যগগণে থাকা সূর্যের তাপ কাপড়ের টুপি ভেদ করে মাথা ধরিয়ে দিচ্ছে। তবু অবাক হতে আশ্চর্য হতে কিম্বা বিস্মিত হতে আমার আটকাচ্ছে না একটুও।

২৩) বিরূপা - দ্বিভঙ্গপদ মুদ্রায় ঢেউয়ের ওপর দণ্ডায়মান দেবী মূর্তির দুইটি হাত। মাথার ওপরে খোঁপা।

২৪) কুবেরী - পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর নৃত্যভঙ্গীমায় দণ্ডায়মান দেবীর দুই হাত। পদ্মের ওপরে দেবীর পায়ের সামনে রাখা সাতটি রত্নকলস।

মুকুট ও কিরীটিধারণ করা মস্তকের ডানপাশে চমৎকার কেশবন্ধন। অন্যান্য অলংকারের সঙ্গে কোমরে একটি রত্নখচিত গোট।
২৫) ভল্লুকা - ভল্লুকমুখী এই দেবীর দুই হাত। অঙ্গে বিবিধ অলংকার। ডানহাতে একটি ডমরু। মাথার ওপর চুলের জটা। স্তম্ভমূলে পদ্মলতা।
২৬) নরসিংহী/সিংহমুখী - দেবী সিংহমুখী ও চার হাত বিশিষ্ট। নীচের দুটি হাতে পাত্র ধরা রয়েছে। মাথার ওপরে সিংহের কেশরের মতো চুলের জটা বা জটামণ্ডল। স্তম্ভমূলে দেবীর পায়ের কাছে পাতাসহ পাঁচটি ফুল।
২৭) বীরজা - দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় পদ্ম কুঁড়ি ও পাতার ওপর দণ্ডায়মান দেবীমূর্তির দুই হাত। অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তির মাথার ডানপাশে খোঁপাটি রয়েছে।
২৮) বিকটাননা - রাগত ভয়ালদর্শনা। দুই হাত। উদ্গত ঠোঁট। মাথায় কোঁকড়া জটা চুলে সর্প মুকুট।
২৯) মহালক্ষ্মী - পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান লাবণ্যময়ী দেবীমূর্তির দুই হাত। গলায় সর্পের মালা। একহাতে বজ্র এবং অন্য হাতে ঢাল। মাথার ডানপাশে কেশবন্ধন।
৩০) কৌমারি - দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় ময়ূরের ওপর দণ্ডায়মান লাবণ্যময়ী দেবী মূর্তির দুই হাত। ডানহাতে অক্ষমালা। অন্যান্য যোগিনীদের মতো অঙ্গে হার, গোট, নূপূর নানান অলংকার। বাঁ হাতের ঢালটি ভেঙে গেছে। মাথার ডানপাশে কেশবন্ধ।
৩১) মহামায়া-পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর দণ্ডায়মান দেবীমূর্তিটি আকারে-আয়তনে অন্যান্য মূর্তিগুলির থেকে কিছুটা বড়। দশটি হাত চিরাচরিত দুর্গামূর্তির কথা মনে পড়ায়। মূর্তির পায়ের কাছে চৌকো আকারের শক্তিপিঠ। মাথায় মুকুট ও কিরীট। গলায় অপরূপ সুন্দর একটি হার। রত্নখচিত গোট, বাজুবন্ধ ও নূপূর। গ্রামদেবী হিসেবে এখনও পুজিত হন মহামায়া। তাঁর নামেই মন্দিরের স্থানীয় নাম মহামায়া মন্দির ও সংলগ্ন পুকুরটির নাম মহামায়া পুষ্করিণী। কালিকা পুরাণে যোগিনী মহামায়ার উল্লেখ আছে।
পুজোর ঠ্যালায় রঙিন কাপড় আর গাঁদা ফুলের স্তূপের আড়ালে এই দেবী মূর্তিকে দেখা বর্তমানে একেবারে অসম্ভব। তাই কৌতূহল রয়েই যায়। মহামায়ার আড়ালে চাপা পড়েছেন দেবী রতিও। কাপড় একটু সরিয়ে সেই মূর্তিটি দেখান পুজারী।
৩২) ঊষা/রতি - প্রবল রাগান্বিত মুখমণ্ডল। দুই হাত। মাথায় জটামণ্ডল। হাঁটু কিছুটা ভাঁজ করে দাঁড়ানো। স্তম্ভমূলে তীর-ধনুক হাতে আর কাঁধে তূণীর নিয়ে কামদেবের মূর্তি।
৩৩) কর্করী - ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় কাঁকড়ার ওপর দাঁড়ানো অনিন্দ্যকান্তি দেবী মূর্তিটির দুই হাত। মাথার বামপাশে কেশবন্ধন। কানে, মাথায় নানা অলংকার, কোমরে গোট ও গলায় হার।
৩৪) সর্পশা/চিত্তলা - দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় দাঁড়ানো সর্পমুখী দেবীর চার হাত। অঙ্গে নানাবিধ অলংকার। স্তম্ভমূলটি ভেঙে গেছে তাই দেবীর বাহন কে তা আর বোঝা যায় না।
৩৫) যোশা - ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় চারপায়াওলা খাটের ওপর দাঁড়ানো দেবী মূর্তির দুই হাত। মাথার ওপর কিরীট আর জটামুকুট।
৩৬) অঘোরা/বৈবস্বতী - দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় সিংওলা ছাগজাতীয় প্রাণীর ওপর দণ্ডায়মান দেবীর দুই হাত। ভয়ালদর্শনা দেবীর দুই চক্ষু কোটর থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছে। চুল মাথার ওপর ছড়ানো।
৩৭) ভদ্রকালী/রুদ্রকালী - সমভঙ্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান দেবীর দুই হাত। ডান হাতে একটি তরোয়াল। বাহন কাক। জটিল নক্সাকরা পোশাক। মাথার ওপরে খোঁপাটি অগ্নিশিখার ন্যায়।
৩৮) মাতঙ্গী/শীতলা/বিনায়কি/গণেশানি/গজাননা - দেবীর পেটমোটা হাতিমুখো চেহারা দেখলে গণেশের কথা মনে পড়বেই। তবে বাহন গাধা। দুই হাত আর মাথায় জটাজুট বা জটামুকুট।
৩৯) বিন্ধ্যবালিনী - প্রত্যালিধ মুদ্রায় ইঁদুরের ওপর দাঁড়িয়ে দুই হাতে ধনুক থেকে তির ছোঁড়ার মুহূর্তটি যেন স্থির হয়ে রয়েছে। বাঁ হাতে ধনুকটি ধরা। ডান হাতে টান দিয়েছেন ছিলায়। মাথার ডানপাশে চমৎকার কেশবন্ধন।
৪০) অভয়া/বীরকুমারী - কাঁকড়াবিছের ওপর নৃত্যরত ভঙ্গীতে দাঁড়ানো দেবীমূর্তির চার হাতের ওপরের দুটি হাত নাচের ভঙ্গীতে উত্তোলিত। অপরূপ দেহভঙ্গিমা। মাথায় জটা মুকুট।
৪১) মাহেশ্বরী - দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় ষাঁড়ের ওপর দাঁড়ানো দেবীর চারটি হাত। অঙ্গে নানা অলংকার। মাথার ডানপাশে কেশবন্ধন।
৪২) কামাক্ষী/অম্বিকা - বেজির ওপরে রাখা দুই চাকার ওপর হাঁটু মুড়ে দাঁড়ানো দেবীর চার হাত। নীচের দুই হাত দুই হাঁটুর ওপরে রাখা। ওপরের ডানহাতে একটি ডমরু। ভেঙে যাওয়া বাম হাতে সম্ভবত একটি পদ্ম। কেশবন্ধন মাথার ডানপাশে।

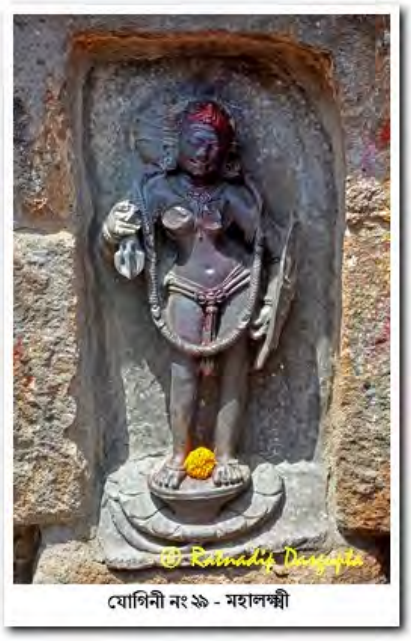

যোগিনী নং ২৯ - মহালক্ষ্মী

যোগিনী নং ৩৯ - বিন্ধ্যবালিনী

৪৩) কামায়ণী - দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় মোরগের ওপর দণ্ডায়মান দেবীর দুই হাত। অঙ্গে বিবিধ অলংকার। মাথার ডানপাশে কেশবন্ধন।
৪৪) ঘটবারি - দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় সিংহের ওপর দণ্ডায়মান দেবীর দুই হাত। মাথার ওপরে কোঁকড়া চুলে নানাবিধ গহনা - করন্দ মুকুট।
৪৫) স্তুতি - সমভঙ্গ মুদ্রায় হলুদ বাটা রাখার পাত্রের ওপর দণ্ডায়মান দেবীর চারটি হাত। স্তম্ভমূলে একটি ফুলদানিও রয়েছে। মাথায় ফুলের মালা, গহনা ও মুকুট। ডানপাশে খোঁপা।
৪৬) কালী - চিরাচরিত কালী মূর্তিকে মনে করায় এক পায়ের তলায় শিব রয়েছে বলেই। যোগিনী মূর্তিটি দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় দাঁড়িয়ে আছে। দুই হাতই

অনেকটা ভাঙা। যোগিনীর কাছে একটি ত্রিশূল রয়েছে। মাথার ওপরে খোঁপা। পায়ের তলার পুরুষ মূর্তিটির ত্রিনয়ন। মাথায় মুকুট ও কিরীট। একটি হাত মাথার তলায় রাখা। ত্রিনয়ন বলেই শিব হিসেবে সনাক্তকরণ।

৪৭) উমা - পদ্ম ফুলের ওপর দণ্ডায়মান অনিন্দকান্তি দেবীর চারটি হাত। ওপরের বাম হাতে একটি নাগপাশা। নীচের বাম হাতে অভয় মুদ্রা। মাথায় কিরীট ও জটামুকুট।

৪৮) নারায়ণী - অনিন্দকান্তি দেবী মূর্তির দুই হাত। বাম হাত স্তম্ভমূলে রাখা একটি মদ্যভাণ্ডের ওপরে রাখা। ডান হাতে তরোয়াল। স্তম্ভমূলে একটি কোনাকৃতি ঢাকা বিশিষ্ট মাটির পাত্র রয়েছে। দেবীর মাথায় টায়রা, অঙ্গে বিবিধ অলংকার। মাথার ডান পাশে কেশবন্ধন।

৪৯) সমুদ্রী - দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় শঙ্খের ওপর দণ্ডায়মান দেবীর দুই হাত। মাথায় টায়রা ও বামপাশে খোঁপা। অঙ্গে বিবিধ অলংকার।

৫০) ব্রাহ্মণী - দেবীর তিনটি মুখ ও চার হাত। আমার মনে হয়েছে ব্রহ্মার আদলে চারটি মুখই হয়ত ভাবা হয়েছিল। পেছনের মুখটি কি দেখা যাচ্ছে না? মূর্তির মাথায় কিরীট আর জটামুকুট। লক্ষ্যণীয়, লিঙ্গে স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ হওয়ার জন্য গলায় পৈতে রয়েছে। অঙ্গে বিবিধ গহনাদি। স্তম্ভমূলের ডানদিকে একটি সিংহ সজ্জিত রয়েছে। দেবীর বাহন বই।

৫১) জ্বালামুখী - দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় আটটি পায়াওলা প্ল্যাটফর্মের ওপর দাঁড়ানো দেবীর দুই হাত। মুখটি কোনও পশু সদৃশ, যদিও ভেঙে যাওয়ায় বোঝা কঠিন। খাড়া দুটি কান দুপাশে উঁচু হয়ে আছে। মাথার দুপাশে জটাওলা চুলে দুটি বিনুনি বাঁধা রয়েছে।

৫২) আগ্নেয়ী - দেবীর দুই হাত। মাথার ওপরে তোলা ডান হাতে তরোয়াল। অঙ্গে বিবিধ অলংকার। পেছনে আগুনের শিখা।

৫৩) অদিতি - সমভঙ্গ মুদ্রায় পায়রার ওপর দাঁড়ানো দেবীর দুই হাত। মাথার ওপরে খোঁপা।

৫৪) চন্দ্রকান্তি - দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় চার পায়া বিশিষ্ট কাঠের খাটের ওপর দাঁড়ানো দেবীর দুই হাত। অঙ্গে নানাবিধ অলংকার। মাথার ডানপাশে কেশবন্ধন।

৫৫) বায়ুবেগা - দ্বিভঙ্গ মুদ্রায় স্ত্রী ইয়াকের ওপর দাঁড়ানো অনিন্দ্যকান্তি দেবীর দুই হাত। অঙ্গে নানাবিধ অলংকার। মাথার ওপরে অপরূপ সুন্দর খোঁপা।

৫৬) চামুণ্ডা - ত্রিভঙ্গ নৃত্যরত মুদ্রায় কস্তুরী মৃগের ওপর দণ্ডায়মান অদ্ভুতদর্শনা দেবীর চার হাত। ওপরের দুহাতে মাথার ওপরে একটি সিংহ তুলেছেন। নীচের বামহাতে কাটারি, ডানহাতে কাটা মুণ্ড। গলায় নরমুণ্ডের মালা। দেবীর দেহ অস্থিচর্মসার, স্তনদুটি ঝুলছে।

৫৭) মারুতি - ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় সিঙেল হরিণের ওপর দণ্ডায়মান দেবীর দুই হাত। অঙ্গে নানাবিধ অলংকার। মাথার ওপরে চুল অগ্নিশিখার মতো।

৫৮) গঙ্গা - ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় মকরের ওপর দণ্ডায়মান দেবীর চার হাত। ওপরের ডান হাতে একটি পদ্মলতা ধরা। নীচের বামহাতে একটি নাগপাশা। অঙ্গে বিবিধ অলংকার। মাথার ওপরে খোঁপা।

৫৯) ধূমাবতী/তারিনী - সমভঙ্গ মুদ্রায় হাঁসের ওপর দণ্ডায়মান দেবীর দুই হাতে কুলো। মাথার ওপরে খোঁপা।

৬০) গান্ধারী - সমভঙ্গ মুদ্রায় অশ্বের ওপর দণ্ডায়মান দেবীর দুই হাত। মাথার বামপাশে কেশবন্ধন। দেবীর পশ্চাৎপটে একটি কদম্ববৃক্ষ।

মন্দিরের নীচের অংশের ৬০ টি কুঠুরিতে ষাটটি যোগিনী মূর্তি রয়েছে। বাকি চারটি যোগিনী মূর্তি ও চারটি ভৈরব মূর্তির অবস্থান মন্দিরের কেন্দ্রে একটু উঁচুতে অবস্থিত গোলাকার চণ্ডীমণ্ডপ বা যোগিনী মণ্ডপে। বলা হয় কোনও একসময় এই মণ্ডপে নৃত্যরত নটরাজ মূর্তি পূজিত হত। কিন্তু এখন তার কোনও অস্তিত্ব নেই। এরমধ্যে ৬১ তম যোগিনী সর্বমঙ্গলার কুঠুরিটি ফাঁকা। এই নিয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে।

৬২) অজিতা - ত্রিভঙ্গ মুদ্রায় নৃত্যরত ভঙ্গীতে হরিণের ওপর দণ্ডায়মান দেবীর চার হাত। মাথার ওপর খোঁপাটি অগ্নিশিখার ন্যায়।

৬৩) সূর্যপুত্রী - চলন্ত ঘোড়ার ওপর দণ্ডায়মান লাবণ্যময়ী দেবী মূর্তির চার হাত। এক হাতে ধনুক। অন্য হাতে তূণীর থেকে তির বার করছেন। মাথায় কিরীট। অঙ্গে নানাবিধ অলংকার।

৬৪) বায়ুবীণা - নৃত্যরত ভঙ্গীতে কালো হরিণের ওপর দণ্ডায়মান দেবীর দুই হাত। মাথার ডানপাশে খোঁপা। অঙ্গে বিবিধ অলংকার যার মধ্যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কানের রিং 'কাপা'। স্তম্ভমূলে দুটি ফুলদানি রয়েছে।

যোগিনী নং ৫৬ - চামুন্ডা

যোগিনী নং ৬৪ - বায়ুবীণা

চণ্ডীমণ্ডপেই রয়েছে চার ভৈরব মূর্তি। মণ্ডপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের কুঠুরিতে রয়েছে একপদ বা অজৈকপদ ভৈরব। পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর একপায়ে দাঁড়ানো ভৈরব মূর্তিটির উর্ধ্বলিঙ্গ। মাথার পেছনে আলোর বলয়। মাথায় কিরীট, গলায় নরকরোটির মালা, হাতে সর্পবলয় আর পায়ে সর্পকেয়ূর। অস্ত্রশস্ত্রাদি খড়্গ, ঢাল আর মাছের কাঁটা। স্তম্ভমূলে দুজন দেহরক্ষী ঢাল-তরোয়াল নিয়ে। দ্বিতীয় ভৈরবের দশটি হাত। বিশ্বপদ্মাসনে বসে রয়েছেন। উর্ধ্বলিঙ্গ। মাথায় কিরীট এবং অক্ষমালা, কাপালা ও ড্রাম হাতে। মাথার আলোক বলয়ের ওপরে দুই উড়ন্ত নারী মূর্তি। স্তম্ভমূলে নারী দেহরক্ষীদের হাতে শাঁখ এবং কাপালা। তৃতীয় ভৈরবও প্রায় দ্বিতীয় ভৈরবের ন্যায়। পার্থক্য হল, এর অঙ্গে নানাবিধ অলংকার। হাতে অক্ষমালা ছাড়াও ঢাল, ডমরু ও ত্রিশূল। স্তম্ভমূলে থাকা নারী দেহরক্ষীদের ভয়াবহ মুখশ্রী, হাতে শুধুমাত্র কাপালা। চতুর্থ ভৈরবও প্রায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভৈরবের মতোই। পার্থক্য হল, এর হাতে শুধুই ডমরু ও অক্ষমালা। স্তম্ভমূলে একটি পুরুষ ও একটি নারী দেহরক্ষী। নারী দেহরক্ষীর হাতে তরোয়াল ও কাপালা। পুরুষ দেহরক্ষীটি শুয়ে রয়েছে যার করতলের ওপর ভৈরবের ডান পা রাখা রয়েছে।

মন্দিরের বাইরে দরজার দুপাশে দুই দ্বারপাল তো আছেই। ঢোকার গলির দুপাশেও দুটি পুরুষ মূর্তি রয়েছে। আর মন্দিরের বাইরের গায়ে রয়েছে নয় কাত্যায়ণী। এই পরিচারিকারাও মন্দির রক্ষা করছে। উচিত ছিল বাইরেটা দেখে নিয়ে ভেতরে ঢোকা। কিন্তু মন্দিরের পাথরগুলো রোদে এমন তেতে ছিল যে প্রায় এক্কাদোক্কা খেলার ভঙ্গীতে লাফিয়ে লাফিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছিলাম। বার দুয়েক মূর্তি চিনতে চিনতে খালি পা অনেকটাই গরম সয়ে ফেলল। অতএব গলি দিয়ে বেরোতে যাই। পূজারীকে সঙ্গে নিয়েই বেরোই। গলির মধ্যে ভয়ঙ্কর দেখতে পুরুষ মূর্তিদুটি কারা জানতে চাই তাঁর কাছে। আমার বাম হাতে অর্থাৎ ঢোকার সময়ে ডান হাতের মূর্তিটি কাল ভৈরবের। আর অন্যটি বৈকাল ভৈরব। দুজনেরই কঙ্কালসার চেহারা, মাথায় জট পাকানো চুল আর লড়াকু ভঙ্গী। কাল ভৈরবের ডান হাতে একটি কাপালা আর বৈকাল ভৈরবের বাম হাতে একটি নরমুণ্ড। কাল ভৈরবের মূর্তির স্তম্ভমূলে একটি ফুলগাছ, একটি শেয়াল আর কাটারি ও কাপালা হাতে দুজন পরিচারক। বৈকাল ভৈরবের পরিচারক দুজনের মধ্যে একজন রক্তপানে ব্যস্ত আর আরেকজনের দুহাতে দুটি কাপালা।

একপদ ভৈরব

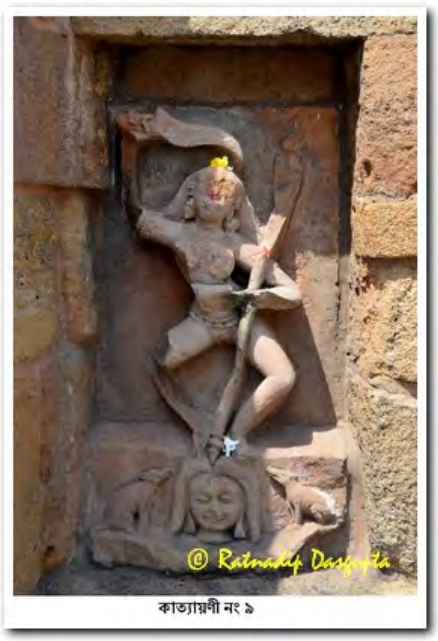

কাত্যায়ণী নং ৯

মন্দিরে ঢোকার দরজার দুপাশে দুই পুরুষ দ্বারপাল। দুজনেরই দুই হাত এবং স্তম্ভমূলে পদ্মলতা। দক্ষিণের দ্বারপালের কানে অলংকার। উত্তরের দ্বারপালের একটু মোটাসোটা রাগী চেহারা। বাঁ হাতে একটি কাপালা।
এবারে নব কাত্যায়ণীদের দেখি ঠাঠা রোদ্দুর সইয়ে সইয়ে। হালকা হলুদ রঙের বালিপাথরে মূর্তিগুলি আড়াই থেকে প্রায় তিন ফুট পর্যন্ত লম্বায়। অধিকাংশেরই দুই হাত আর দাঁড়িয়ে রয়েছে ছিন্ন নরমুণ্ডের ওপরে। প্রথম কাত্যায়ণীর ডান হাতের তলোয়ার উঠেছে মাথার ওপরে। হাতে সোনার চুড়ি, গলায় হার। স্তম্ভমূলে দুই পরিচারক ড্রাম বাজাচ্ছে। দ্বিতীয় কাত্যায়ণীর অঙ্গে বাজুবন্ধ, হার ও নূপুর। মাথার বাঁপাশে খোঁপা। ডানদিকে এক পরিচারক মাথায় ছাতা ধরেছে। স্তম্ভমূলে একটি শেয়াল ও একটি কুকুর। তৃতীয় কাত্যায়ণীর ডান হাতে কাটারি, বাম হাতে কাপালা। ডানদিকে এক পরিচারিকা মাথায় ছাতা ধরেছে। স্তম্ভমূল দ্বিতীয় কাত্যায়ণীর অনুরূপ। চতুর্থ কাত্যায়ণী প্রায় তৃতীয় কাত্যায়ণীর মতোই। পার্থক্য হল, এর মাথার ডানপাশে খোঁপা, হাতে অক্ষমালা। স্তম্ভমূলে এক পরিচারিকা কুকুরটিকে খাওয়াচ্ছে। পঞ্চম কাত্যায়ণী প্রায় দ্বিতীয় কাত্যায়ণীর ন্যায়। এখানে শুধু পরিচারকের বদলে পরিচারিকা মাথায় ছাতা ধরেছে তৃতীয় ও চতুর্থের মতো। ষষ্ঠ কাত্যায়ণী অনেকটাই চতুর্থ কাত্যায়ণীর মতোই। পার্থক্য বলতে এর ডানদিকে একটি গাছ রয়েছে আর পরিচারিকাটি ছাতার বদলে মাথার ওপর চাঁদের কলা ধরেছে। কাত্যায়ণী সাত ও আট উভয়েই হুবহু কাত্যায়ণী তিনের মতো। নবম কাত্যায়ণী বাকি আটজনের থেকে কিছুটা ছোট আকারের। অনেকটা প্রথম কাত্যায়ণীর মতোই। পার্থক্য হল নবম কাত্যায়ণী নগ্ন, রাগত লোচনা, হাতে একটি ধনুকও রয়েছে। পরিচারক বা পরিচারিকা নেই। আর স্তম্ভমূলে দুইটি শিয়াল।

লিখছিলাম-আঁকছিলাম-ভাবছিলাম...

শিল্পী নই। তবু বই দেখে যোগিনীদের কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আঁকার খেয়াল চাপল মাথায়। বৈশিষ্ট্য বলতে হাতে, গলায়, মাথায়, কানে, পায়ে নানারকম অলংকার, মাথার চুলে কেশবন্ধন আর খোঁপার বৈচিত্র, পোশাকের ধরণধারন। গহনার যা বাহার সত্যি পি সি চন্দ্র কী অঞ্জলি জুয়েলার্স কোথায় লাগে! তাও অল্পই আঁকতে পারলাম। একটা লেখায় কতই বা আর দেওয়া যায়, খানিকটা ধারণা ছাড়া।

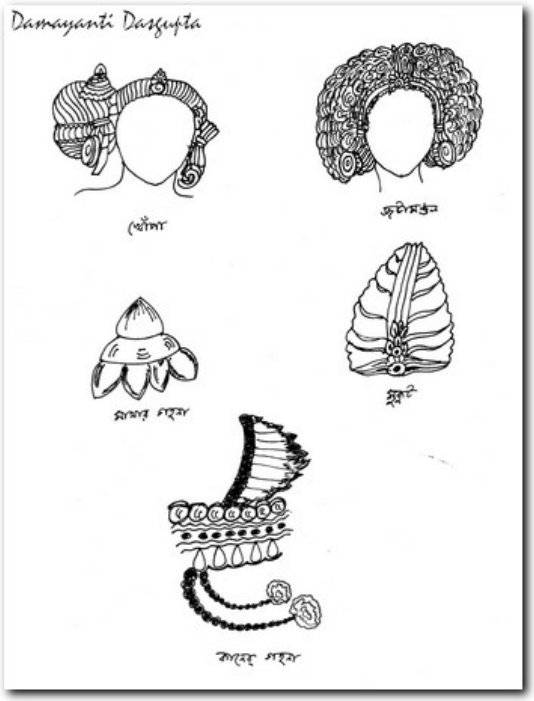


ছবি নং - ১

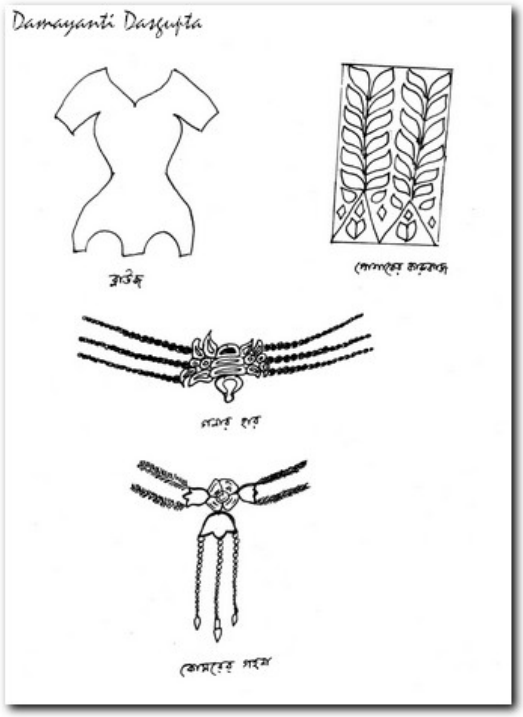


ছবি নং - ২

লিখছিলাম, আঁকছিলাম, ভাবছিলাম। ডুবে ছিলাম বেশ কয়েকদিন। আসলে প্রথম দেখা এই যোগিনী মন্দিরটি আমার মনে বেশ নাড়া দিয়েছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতা যা দ্রাবিড় সভ্যতা নামে পরিচিত তাতে নারীকে সম্মান করার একটা প্রথা ছিল। পরবর্তীকালে বিদেশি অনুপ্রবেশ যত ঘটেছে ততো নারীর অবমূল্যায়ণ ঘটেছে সমাজে। এখনও দুর্গা বা কালী মূর্তির মধ্যে শক্তিময়ীরূপে নারীকে পুজো করার রীতি রয়েছে কিন্তু বাস্তবে তাকে অনেকটাই শক্তিহীনা বলেই বিবেচনা করে নেওয়া হয়। যেন আর্থিক স্বাধীনতা আর পোশাকের হৃষতাই নারী মুক্তির একমাত্র উপায়। অথচ মাত্র পঞ্চাশ-একশো বছর আগেও যে নারীরা লাঠি ছোরা খেলায় ওস্তাদ ছিলেন, অনায়াসে হারিয়ে দিতেন ডাকাতদলকে পেশীশক্তিতে অথবা বুদ্ধিমত্তায় অথবা বিদেশি শাসক কী স্বাধীন দেশের সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতেন তাঁদের অধিকাংশই সেই অর্থে অর্থনৈতিক স্বাধীন ছিলেননা এবং পোশাক নিয়ে বা নিজেকে অন্যের চোখে সুন্দর প্রতিপন্ন করার জন্য সচেতন ছিলেন না। বরং একশো-দেড়শো বছর আগে যখন শাড়ির সঙ্গে ব্লাউজ বা অন্তর্বাস ব্যবহার করার চল ছিল না অথবা নামের পাশে পদবী ব্যবহার করার অনুমোদন ছিল না, সেই নিয়ে তাঁরা লড়েছেন সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধে। শক্তিময়ী, বুদ্ধিমতী এইসব নারীরাই চিরকালের আধুনিকা।

যোগিনী পুজো কেন ভারতবর্ষে বারবার করে আড়ালে চলে গেছে বা একটা রহস্যময় ভয়ের সৃষ্টি করেছে তার মূলেও রয়েছে হয়ত নারীর প্রতি অবমাননার প্রকট অথবা প্রচ্ছন্ন ধারণা। ডাকিনী-যোগিনী নিয়ে প্রচলিত গল্পে বা প্রথায় তাদের সুন্দরী, যৌনতার প্রতিচ্ছবি এবং হিংস্র মানসিকতার দেখানো হয়। অথচ যোগিনী মূর্তিগুলি অপূর্ব লাবণ্যময়ী আকর্ষণীয় দেহ বা কখনও ভয়ানক চেহারা নিয়েও কিন্তু লাস্যময়ী - যৌনতা, ভীতি অথবা বীভৎসতার প্রতীক নয়। এভাবে সমাজ তাকে উপস্থাপিত করেছে। যাতে ভারতবর্ষের নারীর শক্তিময়ী সত্যিকারের রূপটি প্রতিষ্ঠিত না হয়।

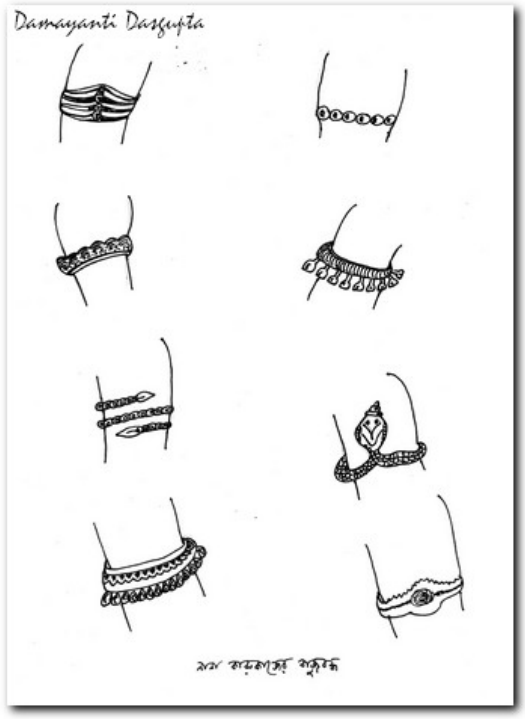


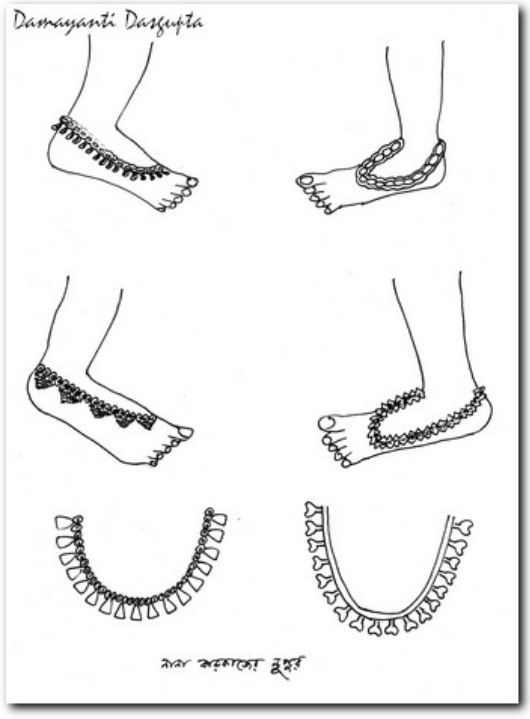

ছবি নং - ৩

ছবি নং - ৪

কিন্তু আসলে মূল ভাবনা কি এই কল্পনা নির্মাণের সময় সত্যিই তাই ছিল নাকি শক্তিময়ী নারীকে, যে নারী জন্ম দেয়, পালন করে, রক্ষা করে তাকে সম্মান করেই করা হয়েছিল? আবার এও মনে হয়েছে, যেন কত যুগ আগের পুরুষ শাসিত সমাজের অভিশাপে শক্তিময়ী নারী ক্ষুদ্রাকার মূর্তিরূপে বাঁধা পড়েছিল কালো পাথর-মাটির আবরণে। একেকটা ভঙ্গী যেন এক একটা মুহূর্ত রচনা করেছে। যে মুহূর্তে তাদেরকে যেন বলা হয়েছিল, স্ট্যাচু। তারপর কেটে গেছে অনন্তকাল। এই অনন্তকাল ধরেই তারা অপেক্ষা করে আছে প্রদ্যুম্নের মতো প্রকৃত মানুষের, যার বাঁশির সুর তাদের বাঁধবে না। মুক্তি দেবে চিরকালের মতো।

ঐতিহাসিক বা গবেষক কোনটাই নই, পড়াশোনাও খুব সামান্যই। অনুভূতি থেকে যা সত্য বলে উপলব্ধ হয় তাই লিখি, লিখে যাই। ব্রাহ্মণী মূর্তিতে গলায় পৈতের উপস্থিতি ধর্মে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের প্রকাশ করছে। এর বহু বছর পর লালন গেয়েছিলেন, 'বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ, বামনি চিনি কী প্রকারে?' অর্থাৎ মধ্যযুগে এসে ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও মেয়েদের পৈতে পরার অনুমোদন শাস্ত্রে বা সমাজে আর ছিল না। শুধু নারীই বা বলি কেন? যোগিনী সরস্বতীর মূর্তিটি দেখলে ট্রান্সজেন্ডার বা হিজড়েদের কথা মনে আসে। এখানে বাইরে থেকে দেখে নারী শরীরে যে পুরুষালি ভাব প্রকাশ পাচ্ছে তার জন্য দেবীর মধ্যে কোনও সংকোচ নয়; শক্তিময়ীর একটা অহংকার ফুটে উঠছে গোঁফ চুমড়ানোর মধ্যে। আবার কোনও কোনও যোগিনীর মুখমণ্ডল পশুর ন্যায় বা বিভিন্ন মূর্তির সঙ্গেই পশুর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এক্ষেত্রেও মনে হয়েছে 'পশু' শব্দটা যে অনুভূতিতে আমরা চট করে ব্যবহার করে ফেলি এখানে তা করা হয়নি। নারীর মতোই পশুর স্থানও সম্মানীয়। প্রাচীন অনেক সভ্যতাতেই কোনও কোনও পশুকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করা হত। আরও একটা প্রশ্ন জাগে মনে। মোট ছটি প্রধান পুরুষ মূর্তি বা ভৈরবের মধ্যে মন্দিরের অভ্যন্তরের চারটি ভৈরবের মূর্তিরই উর্ধ্বলিঙ্গ কেন? এখানে কি নারী নয়, পুরুষকেই যৌনতার চিহ্ন বলে মনে করা হয়েছে?

এই সবই আমার নিজস্ব ভাবনা-কল্পনা। ফিরে আসতে আসতে মনে হল কখনও দিনের শেষে একলা এখানে আসব। সন্ধ্যা নেমে আসবে। পূজারীরাও ফিরে যাবে। বৃষ্টিভেজা পূর্ণিমা রাতে কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলোয় মায়াময় হয়ে উঠবে নির্জন গ্রাম্য প্রান্তর। জোছনার আলো মেঘের কালো ছায়ার সঙ্গে খেলা করবে পুষ্করিণীর জলে। খুব কাছেই কোথাও প্রদ্যুম্নের বাঁশিতে বাজবে মেঘমল্লার রাগ। সেই আলোয় আর সুরে অনিন্দ্যকান্তি যোগিনী মূর্তিরা যেন প্রাণ ফিরে পাবে একে একে। খসে পড়বে এত যুগের মাটি-পাথরের বন্ধন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার - Sixty Four Yogini Temple Hirapur by Suresh Balabantaray এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট।

'আমাদের ছুটি' আন্তর্জাল ভ্রমণ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দময়ন্তী দাশগুপ্ত নেশায় লেখক, ভ্রামণিক, ভ্রমণসাহিত্য গবেষক। প্রকাশিত বই - 'অবলা বসুর ভ্রমণকথা' (সঙ্কলিত এবং সম্পাদিত)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

# আকাশ ভরা জল - স্মৃতির নায়াগ্রা

অনিন্দিতা চক্রবর্তী

~ নায়াগ্রার তথ্য ~ নায়াগ্রার আরও ছবি ~

দূর থেকে শোঁ শোঁ করে কোন আওয়াজ ভেসে আসছিল। একটু একটু করে মানুষের বাঁধ ভেঙে কোনমতে সামনে এগোতেই লোহার শক্ত বেড়াজাল। উল্টোদিকে পৃথিবী বিখ্যাত নায়াগ্রা ফলস,তার অবিশ্রান্ত জলধারা কোথা থেকে কোথায় বয়ে চলেছে কে বলতে পারে,আর নীচে রয়েছে মৃত্যুর মত গভীর খাদ। মিউজিকের সঙ্গে তাল রেখে নানান আলোর বর্ণচ্ছটা এক বিশাল জলরাশিকে শুধু স্পর্শ করতে চাইছে। চোখের সামনে যেন আকাশ ভরা জল। শুধুই এক অপূর্ব মুগ্ধতা ...

নিজের দেশ থেকে দূরে আছি দীর্ঘদিন। প্রথম ঢাকা থেকে কলকাতা,তারপর সীমানা ছাড়িয়ে সুদূর আমেরিকা! পুরনো দিনের সিনেমাতে বিলেত যাওয়ার মত বিশাল কিছু একটা ব্যাপার ছিল সেই প্রথমবার আমেরিকা যাত্রার পালাতে।

আমাদের ছোটবেলায় বেড়ানোর মানে ছিল কলকাতা নয় "ইন্ডিয়া" যাওয়া। ইন্ডিয়া আর ঘুরেফিরে দেখা হলনা। ঢাকায় আমাদের শৈশবে জীবনের খুব কাছ ঘেঁষে ঘুরতে যাওয়া বা বেড়ানোর মত বিষয়গুলো চাপা পড়ে যেত! অভিভাবকদের সার্বক্ষণিক তৎপরতায় নিরুপায় পৈত্রিক প্রাণ সেঁধিয়ে যেত নালক কিংবা কঙ্কাবতীর কাহিনিতে। তারপর ঘুমের মধ্যে সেইসব গল্পের দেশে যাওয়া। ছোটবেলার সেই ঘুমের ভেতর যাত্রা সত্যি হয়েছিল একদিন - দার্জিলিং এর ঘুম স্টেশন-এ। না জানি এরপর কতবার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরেছি আমি,পা ভিজিয়েছি সমুদ্রে। ভেজা বর্ষায় পাহাড়ের বুনোফুলের গন্ধেরা আর মেঘের ধোঁয়ায় ঢেকে থাকা পাহাড় যে স্বর্গীয় সুখ এনে দিয়েছিল সে কথা আর কাকে বোঝাই! লোলেগাঁওর সন্ধে নামা বিকেলে টিলার ওপর নেপালি মেয়ের সেই গরম চা আজ বহুমূল্যের...

মেঘের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে গন্তব্যের কথা ভাবছি। বিমানবালার সদ্য আনা কফি ঘোর ভেঙে দিল আমার। প্লেনের জানলা দিয়ে বাইরে দেখছি নিখাদ এক শুভ্রতাকে। মেঘের বিছানা,না না ওই তো দেখছি সিংহের কিংবা মানুষের মুখ, খেলনা? মেঘ দেখাও খুব ভালো মেডিটেশন হতে পারে। দেখতে দেখতে সেই দেখা-না দেখার বিস্ময় নিয়েই পেরিয়ে যাই নদী, পাহাড়, আটলান্টিক সমুদ্র আরও কত কী! একের পর এক সীমানা ডিঙিয়ে একেবারে পৌছলাম কোন এক আশ্চর্য প্রদীপের দেশে। নায়াগ্রা জলপ্রপাত এর পটভূমিতে।

পৃথিবীর বিখ্যাত এই দর্শনীয় স্থানটি নিউইয়র্ক-এ। উত্তর আমেরিকার সেরা আকর্ষণগুলোর মধ্যে নায়াগ্রা অন্যতম। তখনও বুঝতে পারিনি যে কোনও বিশেষ অভিজ্ঞতার অংশীদার হতে চলেছি। জনসমুদ্রে ভাসমান এই শহরে নায়াগ্রা, আমার দেখা সেই প্রথম কোনও বিস্ময়! কে বলবে প্রায় ১২০০০ বছর আগে বরফ গলে গলে নায়াগ্রা নদী তৈরি করেছে এই জলপ্রপাতের। ইতিহাস বলছে ১৬৭৮ প্রথম ফাদার লুইস হেনিপিন এই বিশাল আকৃতির জলপ্রপাত দেখে মুগ্ধ হন এবং তাঁর শহর ফ্রান্সে ফিরে গিয়ে তাঁর ভ্রমণকাহিনি "দ্য নিউ ডিসকভারি" গ্রন্থের মাধ্যমে পশ্চিমি দেশের মানুষের কাছে এর সৌন্দর্যকে পৌছে দেন। পরবর্তীকালে আমেরিকার অন্যতম প্রাচীন এই স্টেট পার্ক ১৮৮৫ সালে ঐতিহাসিক সংরক্ষিত জায়গা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। গ্রীষ্মে তো বটেই এমনকি শীতের সময়ও ফ্রোজেন নায়াগ্রা দেখতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ভিড় করেন। সেকেন্ডে ৩১৬০ টন জল প্রবাহিত এই প্রপাত যেকোনও সময় রূপকথার জগতকে মনে করিয়ে দিতে পারে। নিউইয়র্ক সহ কানাডা শহরে এই নদীর অবদানে বিদ্যুৎ উৎপাদন সহ ফিশারির বিপুল প্রসার ঘটেছে। ১৯৯৬ সালে নায়াগ্রা করিডোরকে আন্তর্জাতিক 'ইম্পর্ট্যান্ট বার্ড এরিয়া' বা আইবিএ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নায়াগ্রা নদী আমেরিকা আর কানাডা দুটি দেশের মাঝখানে অবস্থিত। দুই পারে দুই দেশ, কিন্তু এপার ওপার করতে ভিসার প্রয়োজন হয়। তাই পর্যটকেরা উভয় প্রান্ত থেকেই দুদেশকে দূর থেকে দেখে। অনেকেই বলে থাকেন,কানাডার প্রান্ত থেকেই নাকি নায়াগ্রার আসল সৌন্দর্য দেখতে পাওয়া যায়। "হর্স সু","আমেরিকান ফলস" এবং "ব্রাইডাল ভেইলস" তিন দিক থেকে তিনটি আলাদা অংশে জলপ্রপাতটি বিস্তৃত। আশ্চর্যের বিষয়,বিপদজনক মনে হলেও নায়াগ্রার বেশির ভাগ এলাকা পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখে নেওয়া যায়। কর্তৃপক্ষ তাদের নিঁখুত কর্মদক্ষতায় ১৬৭ ফুট উচ্চতার এই প্রপাতটিকে সিঁড়ি দিয়ে মুড়ে দিয়েছে পাশ থেকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে ট্রেকিং করার অনুভূতিও হতে পারে। এপ্রিল থেকে আগস্ট খুব ভালো সময় নায়াগ্রা ভ্রমণের জন্য। অক্টোবর-নভেম্বরে এই ফলস-এর বেশিরভাগ স্রোতগুলো ঠাণ্ডায় জমে যায়। পুরোপুরি থেমে না গেলেও বেশিরভাগ অংশই সাদা বরফে জমে গিয়ে ভিন্ন দৃশ্য রচনা করে নিঃসন্দেহে।

দিনটি ছিল ৫ই জুলাই। আমেরিকার ইন্ডিপেনডেন্স ডের জন্য সাপ্তাহিক ছুটির মরশুম। সন্ধে হয়ে এসেছিল। সারাদিন ওয়াশিংটনের রাস্তায় ভিনদেশের স্বাধীনতার রঙিন পদযাত্রাকে দেখা এবং নায়াগ্রার জন্য ব্যাকুলতা ছিল প্রথম থেকেই। সন্ধে বলতে তখনও দিনের আলো আছে কিছুটা

আর ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়া আমাদের ক্লান্তি অনেকটাই কমিয়ে দিয়েছিল। রাস্তার দুপাশ জুড়ে অসংখ্য মানুষ,তাদের রংবেরঙের পোশাক, স্বাধীনতার ফেস্টুন, মার্কিন পতাকা - যেন সার্বজনীন উৎসব! একটা বিশাল বিল্ডিং জুড়ে এশিয়ান নানা খাবারের দোকান। ইতিউতি গলা হাঁকিয়ে নানা জাতীয় দেশীয় ফুড স্টল। কাবাব, বিরিয়ানি, রোল ইত্যাদি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য তৎপর। কলকাতার পর্যটকেরা হঠাৎ করে ভেবে নিতেই পারেন ধর্মতলার কোন অচেনা প্রান্তে এসে পড়েছেন হয়ত!

অবাক হবার পালা সামলাতে সামলাতেই কিছুটা এগিয়ে রাস্তার উল্টোদিকে সুসজ্জিত, মনোরম সবুজের সুউচ্চ পার্ক। এতটাই গোছানো যে হাঁটতে গেলেও অস্বস্তি হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল বেমানান কেউ এসে গেছি বোধহয় ভুল জায়গায়। এখান থেকেই শুরু হল "দি গ্রেট নায়াগ্রা ফলস" এর এলাকা। আমাদের চোখে মনে দারুণ বিস্ময়! প্রথম নায়াগ্রা দর্শন।

গোধূলি যেন বৃষ্টি ভেজা ছন্দে আমাদের সবার চোখে,মনে, হৃদয়ে। অন্ধকার নেমে এল কিছুক্ষণ পড়েই। নায়াগ্রায় তখন সবে সন্ধে, আকাশ ফেটে পড়ছে আতসবাজিতে। ফোন, ক্যামেরা কখন ক্লান্ত হতে হতে বন্ধ হয়ে গেছে। আমাদের কারো হুঁশ নেই। অগুনতি মানুষ রাস্তায় আকাশের আলোর খেলা দেখতে ব্যস্ত।

এখানে থাকার জন্য রয়েছে বিভিন্ন নামী দামী হোটেল, রিসর্ট। বিভিন্ন ট্যুর কোম্পানির বাস প্যাকেজেও, ফ্লাইট-এ বা নিজস্ব গাড়িতে, রেন্টাল গাড়ি নিয়েও এখানে ঘুরতে আসা যায়। চাইনিজ এই ট্যুর কোম্পানিগুলোর নানা ধরনের প্যাকেজ আছে। কয়েকমাস আগে থেকে বুক করলে অনেক ডিসকাউন্ট প্যাকেজে ঘুরে আসা যায়। এক রাতের প্যাকেজে কম হলে ২০০ ডলার, নায়াগ্রাসহ অন্যান্য দর্শনীয় জায়গায় ঘুরতে হলে ৪০০ থেকে ৫০০ ডলার হিসেবে ১/২দিন (মাথা প্রতি) দিব্যি ঘুরে আসা যায়। হাজারো পন্থা এখানে বেড়াতে আসার। কিভাবে কোথা থেকে পর্যটক আসবে, সামগ্রিক পরিষেবা নির্ভর করছে তার ওপরে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী আমরা পরদিন সকালে একত্রিত হলাম নায়াগ্রাকে দিনের আলোয় দেখার জন্য। এই জলপ্রপাত নিয়ে এখানে ছোট স্টেজ শো দেখানো হয়। শিল্পী কুশলীরা প্রত্যেকে তাদের আপন নৈপুণ্যে "মেড অফ দ্য মিস্ট" অভিনয় করে দেখান। সেটা দেখতে পারা সত্যি এক অভিজ্ঞতা। নায়াগ্রা নিয়ে অনেক মিথ রয়েছে,রয়েছে নানা বিস্ময়। আমেরিকান লোককথায় নানাভাবে নায়াগ্রার ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেউ বলে থাকেন পথ ভ্রান্ত কোনও উদাসীন পথিক নায়াগ্রার ধারে বসে বাঁশি বাজাচ্ছিলেন,সে বাঁশির সুরে এমন কিছু ছিল যা প্রকৃতিতেও সংক্রামিত হয়েছিল। বয়ে গেছিল নদী,ভেসে গেছিল দিগ্বিদিক শূন্য হয়ে। সেই প্রবাহ আর থামেনি। শোনা যায়, নায়াগ্রার সঙ্গে 'হেনো' নামক ঝড় বৃষ্টি দেবতার কাহিনি, আরো অনেক অচেনা অজানা টোটেম ও ট্যাবু মিলে মিশে গেছে এই জলপ্রপাতের কাহিনিতে।

নায়াগ্রার সেরা আকর্ষণ 'মেড অফ দ্য মিস্ট'। কাছ থেকে, নায়াগ্রার জলে ভেসে নায়াগ্রার প্রবল প্রতাপকে ছুঁয়ে দেখা। প্রায় ৩০/৩৫ তলা ওপর থেকে নীচে নেমে, ছোট একটা লঞ্চ বা ক্রুজে ওঠার জন্য আমাদের লাইন দিতে হল। নায়াগ্রা ট্যুরিজমের খুব ভালো ব্যবস্থাপনা। এই জলযান একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই যেতে পারে। একটু এদিক ওদিক হলেই প্রবল তোড়ে ভেসে যাওয়া এমনকি খাদে তলিয়ে যাওয়াটা তেমন কঠিন ব্যাপার নয়। আমরা প্রতি মুহূর্তে অবাক থেকে অবাকতর হচ্ছিলাম। সবাইকে ক্যামেরা, সেল ফোন রেখে যেতে বলা হয়েছিল। প্রত্যেকেই ওয়াটারপ্রুফ প্লাস্টিক কভারে মোড়া যেন জ্যান্ত কোনো বস্তু বা সামান! যত সামনের দিকে এগোচ্ছিলাম ততই কাঁপুনি বাড়ছিল। সাদা থেকে সাদা, শুভ্রতা বোধহয় একেই বলে! চশমা রাখা যাচ্ছিলনা চোখে, বৃষ্টির মত জলের ঝাপটা এসে লাগছিল সর্বত্র। হঠাৎ থমকে গেল আমাদের ছোট্ট তরী। কোনমতে চোখ খুলতেই সেকি দৃশ্য! বিশাল এক জলরাশি আকাশ ভেঙে পড়ছে যেন। বিশ্বাস করতে পারছিলামনা। নিজেকে বড় ছোট লাগছিল। মুহূর্তে মনের মধ্যে যত জমাট বাঁধা বিষয়-আশয় সব ভেঙে পড়ছিল তুচ্ছ হয়ে। ছোটবেলায় ভূগোল বইতে পড়েছিলাম নায়াগ্রার কথা। যা পড়েছি, তাকে চোখে দেখার অভিজ্ঞতা যত লিখব ততই কম হবে। সে এক অনির্বচনীয় মুহূর্ত রচনা। ওপর থেকে অদ্ভুত লাগছিল দেখতে। মেড অফ দ্য মিস্ট সফরে হার না মানা জলের স্রোতে ভেসে থাকার সেই মুহূর্ত ছাপিয়ে যাচ্ছিল সব কিছুকে। আকাশে এত জল কোথা থেকে এল, কী অপূর্ব ঐশ্বরিক সৃষ্টি! সে জলের একটা নদী, নাকি ঝরনা, নাকি হাজার হাজার নদী ও ঝরনা

এক সাথে এক ভাবে বয়ে চলেছে নিরন্তর। জলের প্রবল স্রোত দেখে রীতিমত ভয়ও হচ্ছিল অবশ্য।

নায়াগ্রা নদী বয়ে গেছে অনেক দূর। যারা এখানে ঘুরতে আসেন,এই নদীর পাশেই থাকা ওল্ড ফোর্ট কেউ মিস করেননা। প্রায় ৩০০ বছরের ঔপনিবেশিক ফরাসি সভ্যতা, একই সঙ্গে ব্রিটিশ ও আমেরিকান যোদ্ধাদের লড়াই, ওল্ড ফোর্ট-এর ইতিহাসে বিশেষ ভাবে জুড়ে আছে। পর্যটকেরা ফোর্টে প্রবেশ করে হঠাৎ যেন সেই যুগেই পৌঁছে যেতে পারেন অনায়াসে। কলোনিয়াল যুগের মানুষের সাজ পোশাকে তাদের অভ্যর্থনা ও বিনোদন মুগ্ধ করতে সমর্থ। পাথরের তৈরি সুউচ্চ দুর্গ, যুদ্ধাস্ত্র, সৈনিকদের ব্যবহৃত পোশাক কিছুক্ষণের জন্য হলেও মনকে ইতিহাসের অচেনা পাতায় পৌছিয়ে দেয়। ফোর্টের বাইরে বিশাল জায়গা জুড়ে সবুজের সমারোহ,আর পাথরে বাঁধানো পথ যেন দেখার মত। যেদিকেই তাকাই মুগ্ধ হয়ে যাই।

আসলে জীবনে যা কিছু প্রথম, তার অনুভূতি যতই বিনিময় করিনা কেন তা যেন অব্যক্তই থেকে যায়। ইতিহাসের সঙ্গে মিথ আর এই সময়ের আলো ছায়া মিশে প্রতিদিনই নায়াগ্রাকে যেন নতুন করে। এই অভিজ্ঞতা শুধু মূল্যবান স্মৃতিই নয়, সবার সঙ্গে বিনিময় করে নেওয়ার মত আনন্দেরও। মন থেকে মনে তার সংক্রমণ থাকুক অব্যাহত...

~ নায়াগ্রার তথ্য ~ নায়াগ্রার আরও ছবি ~

---

অনিন্দিতা চক্রবর্তীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা বাংলাদেশের ঢাকা শহরে। ২০০৩ সালে স্কলারশিপ নিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ শুরু। স্নাতক থেকে স্নাতকোত্তর ও গবেষণা একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দীর্ঘদিন ধরে দুই বাংলাকে দেখেছেন কাছ থেকে। পরবর্তী কালে আমেরিকায় বসবাস। কলকাতা ও কলকাতার বাইরে গবেষণার কাজে এবং শুধু ঘুরতে যাওয়ার জন্য অনেক জায়গায় বেড়ানোর অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমেরিকাতে এসেও ঘুরে বেড়ানোর নেশা তাঁর পিছু ছাড়েনি। সেইসব অভিজ্ঞতাকে লিখে রাখতে ভালোবাসেন। যাযাবরধর্মীভাবে বেঁচে থাকাটাই তাঁর কাছে সহজতর হয়ে উঠেছে।

---

কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00

Like Be the first of your friends to like this.

tell a Friend

বেড়ানোর ভাল লাগার মুহূর্তগুলো সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছে করে, অথচ দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনি লেখার সময় নেই? বেড়িয়ে এসে আপনার অভিজ্ঞতাগুলো যেমনভাবে গল্প করে বলেন কাছের মানুষদের - ঠিক তেমনি করেই সেই কথাগুলো ছোট্ট করে লিখে পাঠিয়ে দিন ছুটির আড্ডায়। লেখা পাঠানোর জন্য দেখুন এখানে। লেখা পাঠাতে কোনরকম অসুবিধা হলে ই-মেল করুন - admin@amaderchhuti.com অথবা amaderchhuti@gmail.com -এ।

# লাভডেলের শেষ ট্রেন

সুপর্ণা রায় চৌধুরী

~ লাভডেলের আরও ছবি ~

ছোটবেলায় একটা কথা শুনতাম ঠাকুমা, দিদিমার কাছে - জন্মান্তর, পূর্বজন্ম বা পরজন্ম। গাড়িটা যখন উটি ছাড়িয়ে আরও তিন কিলোমিটার উঁচুতে পাহাড়ি রাস্তা ধরে একটা সুন্দর পাহাড়ি গ্রামে ঢুকছে, তখন পরিবেশের সঙ্গে আমার মনেরও অদ্ভুত রকম সব পরিবর্তন ঘটছিল। কি যেন এক টান অনুভব হচ্ছে। এখানে আসার জন্যেই এত বছর অপেক্ষা করেছি এমনটাই একটা ভাবনা মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করছে। পূর্ব বা পরজন্ম আমি বিশ্বাস করি না। বিশ্বাস করি শুধু ঈশ্বরকে। নিশ্চয় কোন টান ছিল তাই বোধহয় টেনে নিয়ে চলে এল এমন এক সুন্দর রাজত্বে। ঈশ্বর এখানে আবির্ভূত। এই ছোট্ট পাহাড়ি গ্রামে ছড়িয়ে রয়েছে শিবের মন্দির আর চার্চ।

একটি কাঠের বাংলো, সামনে দেখা যাচ্ছে নীলগিরির পুরো রেঞ্জগুলোকে। কাঠের বাংলোটি আমাদের হোটেল। গিয়ে ঢুকলাম যখন, দুপুর পেরিয়ে পড়ন্ত বিকেল। দিনের শেষ রোদ্দুরের ছটায় অপরূপ নীলগিরি। আমরা অনেকটা ওপরে, নীচের দিকে তাকালে শুধু সবুজ চা বাগান, ছোট ছোট ঘরবাড়ি আর অনেকগুলি চার্চ। হোটেলে দেখাশুনা করে, অল্পবয়সী তিন জন যুবক, সৌরভ, রণজিৎ এবং ভিনেশ। ওরাও বন্ধুর মতন হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তে। মনে হচ্ছিল যেন কতকালের চেনা! নীচের জায়গাগুলির নাম জানতে চেয়েছিলাম, বলল কেট্টিভ্যালি, কুন্নুর। আরও দূরে দেখাল নীলগিরিকে সাপের মতন পেঁচিয়ে চলেছে এখানের বিখ্যাত টয়ট্রেন। ভীষণ দেখতে ইচ্ছা হল স্টেশনটা কোথায়। বলল পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে হেঁটে প্রায় দুই কিলোমিটার। খুশিতে মনটা ভরে উঠল। তাড়াতাড়ি হোটেলের ঘরে ব্যাগপত্তর রেখে বেরিয়ে পড়লাম। তখন বিকেল প্রায় শেষের দিকে। অবশ্য এখানে সন্ধ্যা হয় অনেক দেরিতে। তাই রোদটা ভালোই আছে তখনও, কিন্তু ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাতদুটো জমে আসছিল। শান্ত নির্জন পথে হাঁটতে হাঁটতে একটু উষ্ণতার জন্য আমার প্রিয় মানুষটার হাতের মধ্যে হাত রাখলাম। মনের গভীরেও যেন তার পরশ লাগল।

স্টেশনে যখন পৌঁছলাম পাহাড়ি রাস্তা ধরে তখন পশ্চিম দিকের পাহাড়ের গায়ে সূর্য ঢলে পড়েছে। পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে তাকে অল্পবিস্তর দেখা যাচ্ছে। শেষ ট্রেন যাবে স্টেশন দিয়ে। লাভডেল স্টেশন। নামটার সঙ্গেই কেমন ভালবাসা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো। গ্রামের কিছু মানুষ অপেক্ষা করছে। জানিনা তারা কোথায় যাবে, হয় কেট্টিভ্যালি, না হয় ওয়েলিংটন, নয়ত কুন্নুর। জিজ্ঞাসা করিনি। এদিক ওদিক দেখতে দেখতেই উঁচু উঁচু পাইন গাছের বুক চিরে একটা আওয়াজ যেন ভেসে এল। ট্রেন তো অনেক দেখেছি, কিন্তু পাহাড়ি রাস্তার এই চার-কামরার টয়ট্রেন কখনও দেখি নি। সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সন্ধে ৬-১৫, এত নিবিড় শান্ত একটা স্টেশনের নিস্তব্ধতা ভেঙে চোখের সামনে এসে দাঁড়াল বিকেলের শেষ ট্রেন। উঠে গেল যারা অপেক্ষা করছিল, চলে যেতেই আবার নেমে এল নিস্তব্ধতা। আর কোনও মানুষ তখন স্টেশনে নেই, অদ্ভুত এক মায়াজালে ঘেরা এই লাভডেল। ব্রিটিশ

আমলে তৈরি হওয়া চার্চ, দ্য লরেন্স স্কুল সব কিছুই এক ঐতিহ্য বহন করে চলেছে ভীষণ শান্ত আর নিস্তব্ধতার মধ্যে দিয়ে। এখানের মানুষগুলিই বড্ড শান্ত, কোথাও কোনও চিৎকার নেই। অন্ধকার নেমে এল পাহাড়ি স্টেশনে। ফিরে চললাম আমাদের গন্তব্যে।

অন্ধকার চিরে দুজনে হাঁটছি পাহাড়ের গা ঘেঁষে। আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদটাও যেন আলোর মায়া ছড়িয়ে হাসছে। পাইনের ফাঁক দিয়ে মাঝে মাঝে সে আলো পাহাড়ের এই রাস্তায় এসে পড়ছে। নীচে জোনাকি পোকার মতন জ্বলজ্বল করছে বসতি। অপূর্ব সুন্দর এক পাহাড়ি উপত্যকা। স্কটিশদের দেওয়া নাম লাভডেল। ডেল মানে উপত্যকা। ভালোবাসার ছোট্ট এক ভ্যালি। পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে নীচে নামলেই কেট্টিভ্যালি। সে ভ্যালিও সাজানো সুন্দর। বেশিরভাগটাই আদিবাসী গ্রাম। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ওরাও এখন অনেক উন্নত। লাভডেলে আমরা ছিলাম আটদিন। হোটেলটা নিজের বাড়ি আর তিন যুবক যারা হোটেল দেখাশোনা করে তাদেরকে সবথেকে কাছের বন্ধু বলে মনে হত।

আটদিনে লাভডেল থেকে নীচে, ওপরে টয়ট্রেনে করে নীলগিরির এপাশ-ওপাশ সব আমরা ঘুরে ফেলেছিলাম। কিন্তু যতই এদিক-ওদিক ছুটি, মনটা পরে থাকত লাভডেল স্টেশনের শেষ ট্রেনটা যায় যে তাকে দেখার অপেক্ষায়। যেখানেই থাকতাম আমরা ঠিক সময়ে স্টেশনে গিয়ে বসতাম, অপেক্ষা করতাম কখন পাইনের ফাঁক দিয়ে সব নিস্তব্ধতা ভেদ করে আমাদের চোখের সামনে সে এসে দাঁড়াবে। স্টেশনের পাশেই পড়ে আছে একটি পরিত্যক্ত বাড়ি। সেটা কোনও এক সময় স্টেশনেরই অঙ্গ ছিল, এখন আর ব্যবহার করা হয়না। লাভডেল স্টেশনে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে আমার কেন জানি না সে এক অদ্ভুত অনুভূতি হত। রোজ একই সময়ে এই পরিত্যক্ত বাড়ির পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে এখানের বিকেলের শেষ ট্রেনটি, তারই মাঝে যুগ যুগ ধরে বয়ে নিয়ে চলে কিছু সভ্যতা বা রাজত্ব। এই লাভডেলও তাই। ব্রিটিশদের বানানো ছোট্ট পাহাড়ি উপত্যকা বয়ে নিয়ে চলেছে এক সভ্যতা। এখানের মানুষগুলোও সভ্য এবং শান্ত। আমার মনের গভীরে শান্ত লাভডেল আর তার শেষ বিকেলের ট্রেন রয়ে গেল নিঃশব্দে, নীরবে অক্ষত আজীবন।

~ লাভডেলের আরও ছবি ~

সুপর্ণা ভালোবাসেন ঘুরতে। অবশ্যসঙ্গী ক্যামেরা। বিশেষ প্রিয় গন্তব্য পাহাড়। ভালো লাগে জঙ্গল আর সমুদ্রও। তবে প্রচলিত ভিড়ের বাইরে। অল্প চেনা বা অজানা জায়গাতে গিয়ে নিজের মতন করে কিছু খুঁজে পাওয়ার নেশাতেই ছুটির অবকাশ খোঁজে তাঁর মন।

☆☆☆☆☆
কেমন লাগল : - select -
মত দিয়েছেন :
গড় : 0.00
Like Be the first of your friends to like this.
tell a Friend

## ছোট্ট ছুটিতে সম্বলপুর

ঔরব দে

শহরের ব্যস্ততা কাটিয়ে নভেম্বর মাসের এক শুক্রবার রাতে ক'দিনের ছোট্ট ছুটিতে বেরিয়ে পড়লাম সম্বলপুরের উদ্দেশ্যে। রাত সাড়ে ন'টায় ছেড়ে কোরাপুট এক্সপ্রেস পরদিন সকাল ন'টায় পৌঁছাল সম্বলপুর স্টেশনে। পুরো ট্রেন প্রায় ফাঁকাই ছিল। স্টেশন থেকে ও টি ডি সির গাড়ি করে কুড়ি মিনিটেই পৌঁছে গেলাম ব্রুক হিলের উপর ও টি ডি সির পান্থনিবাসে। কলকাতা থেকে ঘর বুক করা ছিল। মনোরম পরিবেশে অবস্থিত পান্থনিবাস। দুপুর তিনটের সময় একটা অটো নিয়ে গেলাম পাহাড়ের ওপর ডিয়ার পার্ক দেখতে। পান্থনিবাস থেকে ডিয়ার পার্কের দূরত্ব ৩ কিমি। পার্কটি খুবই সুন্দর। হরিণ ছাড়াও আছে বাইসন, ময়ূর, ভাল্লুক, পায়রা, হাঁস ও নানা পাখি। এছাড়াও রয়েছে নানান রকমের গাছ। প্রায় ঘন্টাদুয়েক সময় কাটিয়ে ফিরে এলাম পান্থনিবাসে। পরের দিনের জন্য একটা গাড়ি ভাড়া করা হল।

পরের দিন সকালে ব্রেকফাস্ট করে রওনা দিলাম চিপলিমার ঘন্টেশ্বরী মন্দিরের দিকে। দেড় ঘন্টা পর পৌঁছলাম পাহাড়ের উপর ঘন্টেশ্বরী মন্দিরের সামনে। ঘন্টেশ্বরী মন্দিরের পাশে আছে চিপলিমা হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্ট। প্ল্যান্ট-এর মধ্যে দিয়ে পায়ে হাঁটা পথ গিয়েছে মন্দিরের কাছে। হাজার হাজার ঘন্টা ঝুলছে মন্দির চত্বরে। ঘন্টেশ্বরীর পুজো দিলাম আমরা। পূজার্থীদের ভিড় বেশ ভালোই। মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে মহানদী। অনেকে নদীতে স্নান করে পুজো দিচ্ছিলেন। মন্দিরের ভিতরে এবং পাওয়ার প্ল্যান্টের মধ্যে ছবি তোলা নিষেধ। পরবর্তী গন্তব্য হিরাকুদ বাঁধ। রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট পাহাড় পড়ল। প্রায় একঘন্টা পরে পৌঁছলাম হিরাকুদ বাঁধের সামনে। এটি ৬০ মিটার উঁচু ও ৪৮০০ মিটার লম্বা - এদেশের দীর্ঘতম বাঁধ। বাঁধ দেওয়ার ফলে সৃষ্টি হয়েছে ৭৪৬ বর্গ কিলোমিটার জায়গা জুড়ে এক বিশাল জলাধার যা এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদ। বাঁধের ওপর গাড়ি চলার রাস্তা আছে কিন্তু সাধারণ মানুষের প্রবেশ নিষেধ। এখানেও ছবি তোলা মানা। বাঁধের দুধারে আছে দুটি ওয়াচ টাওয়ার - গান্ধীমিনার এবং নেহরুমিনার। আমরা নেহরুমিনারের দিকে গিয়েছিলাম। টিকিট কেটে প্রবেশ করলাম। সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে গেছে। বেশ অনেক ক'টা সিঁড়ি ভেঙে ওপরে এসে দাঁড়ালাম। চারদিকে মহানদীর জলকে সমুদ্রের মত লাগছিল ওপর থেকে। বাঁধের কিছুটা অংশ দেখা যাচ্ছিল বাকিটা কুয়াশার মধ্যে ঢাকা। এখানেও জল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছিল। কিছুক্ষণ থেকে নীচে নেমে এলাম। নীচে গোটাকয়েক খাবারের দোকান আছে।

এরপর আমাদের গাড়ি ছুটে চলল শ্যামলেশ্বরী মন্দিরের দিকে। সম্বলপুরের রাস্তাঘাট চারদিক ঝকঝকে পরিষ্কার। মহানদীর পাশ দিয়ে চলার পর বাঁদিকে ঘুরে গাড়ি এসে থামল শ্যামলেশ্বরী মন্দিরের সামনে। স্থানীয়দের বিশ্বাস শ্যামলেশ্বরী খুবই জাগ্রত দেবী। এই দেবীর নাম থেকেই হয়েছে শহরের নাম। মন্দিরে পুজো দিয়ে মহানদীর পারে এসে বসলাম। অনেকে স্নান করছিল। দূরের পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। মহানদীর পাড় তেমন সুসজ্জিত নয়। পান্থনিবাসে লাঞ্চ করে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে এবারে চললাম বিখ্যাত হুমার মন্দির দেখতে। প্রায় একঘন্টা চলার পর গাড়ি এসে থামল হুমার মন্দিরের সামনে। দূরে ধানক্ষেত আর ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছিল মন্দিরের সামনে থেকে। হুমার মন্দির একদিকে হেলানো। ভেতরে দেবতা শিব পূজিত হচ্ছেন। এছাড়াও পাশে আছে জগন্নাথ, হনুমান ও আরও অন্যান্য মন্দির। মন্দিরের পিছন দিক দিয়ে রাস্তা গিয়েছে মহানদীর দিকে। সুন্দর বাঁধানো ঘাট আছে। এখানে নদীর জলে অজস্র মাছ আছে। ধীরে ধীরে সূর্য অস্ত গেল মহানদীর বুকে হুমার মন্দিরকে পিছনে ফেলে। চারিদিকের পরিবেশ শান্ত। আশেপাশে কোন জনবসতি নেই। আস্তে আস্তে অন্ধকার নেমে এল। মন্দির প্রাঙ্গণে আলো জ্বলে উঠল। সাদা আলোয় হুমার মন্দিরকে অপূর্ব লাগছিল।

পরদিন সোমবারই আমাদের সম্বলপুর ভ্রমণের শেষ দিন। সকালে ঘুম থেকে উঠে পান্থনিবাস থেকে যে রাস্তা ওপরদিকে চলে গেছে, সেই রাস্তায় হাঁটতে বেরোলাম। এই রাস্তা সম্বলপুরের সার্কিট হাউসে গিয়ে শেষ হয়েছে। এখান থেকে পুরো শহরটাকে সুন্দর দেখাচ্ছিল। সার্কিট হাউসের সামনে একটা ছোট সুন্দর বাগান আছে যার মধ্যে একটা ওয়াচ টাওয়ার আছে। বাগানের গেট বন্ধ ছিল। ভেতরে ঢোকা গেল না। ব্রেকফাস্ট সেরে নিয়ে চললাম বৃদ্ধরাজা মন্দির দেখতে। শহরের মধ্যে পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত এই মন্দির। জঙ্গলের মধ্যে ঘোরালো পথ গিয়ে পৌঁছেচে মন্দিরের কাছে। মন্দিরের চারদিকে জঙ্গলে ঘেরা। পুরোহিত অসুস্থ থাকায় ভেতরে প্রবেশ করতে পারিনি। মন্দিরের কারুকার্য দেখার মত। পাশ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে। একপাশে একটা বিরাট সুড়ঙ্গ আছে। এখন তার মুখ বন্ধ করা আছে। অটোচালক জানালো, এই সুড়ঙ্গ গিয়ে উঠেছে ডিয়ার পার্কের কাছে। আগেকার দিনে রাজারা এই পথ দিয়ে যাতায়াত করতেন। মন্দিরের পিছনের দিকে ভির সুরেন্দ্র সাই (VSS) এর সমাধি আছে। স্থানীয় লোকের মতে তিনি এখনও এখান থেকে শহরের দেখাশোনা করছেন। বেশ কিছুক্ষণ এখানে থেকে গেলাম লক্ষ্মী টকিজে কেনাকাটার জন্য। সম্বলপুরের তাঁতবস্ত্রের খ্যাতি আছে। দুপুরে পান্থনিবাসে ফিরে এসে লাঞ্চ করলাম। বিকাল পাঁচটায় ও টি ডি সির গাড়ি করে স্টেশনে এসে সন্ধ্যে ছ'টার কোরাপুট এক্সপ্রেসে চড়ে বসলাম। সম্বলপুরকে বিদায় জানিয়ে ফিরে চললাম কলকাতার পথে।

ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ঔরব দে ভালোবাসেন বেড়াতে।

tell a Friend